



চেরাগে জ্ঞান শরীফ
ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুরেশ্বরী

গ্রাম: চুনকুটিয়া, পো: শুভাচ্যা, কেরানীগঞ্জ,
ঢাকা

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুবেদ্বী রচিত গ্রন্থাবলি



১. মারেফতের গোপন কথা

২. মারেফতের বাণী

৩. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ১ম খণ্ড

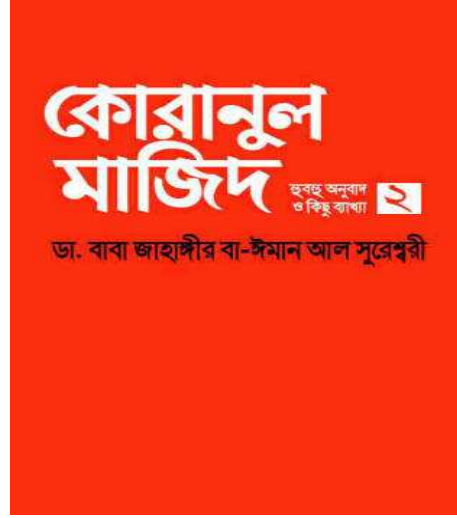
৪. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ২য় খণ্ড

৫. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৩য় খণ্ড

৬. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৪র্থ খণ্ড

৭. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৫ম খণ্ড

৮. কোরআনুল মাজীদের বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ- ১ম খণ্ড



কোরানুল মাজিদ

২

হুবহু অনুবাদ ও কিছু ব্যাখ্যা

সুফিবাদ প্রকাশনালয়
 প্রযত্নে : বে-ইমান হোমিও হল
 ১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (২য় তলা) ঢাকা-১২০৫
 ফোন : ০১৯১১৫৯৭৭৮০, ০১৭১১১২৮১৬৯

উৎসর্গ

বাংলার দেদীপ্যমান সূর্য গাউসুল আজম বাবা ভাণ্ডারীর সুযোগ্য আওলাদ
 নুরে তাবাসসুম হেরমায়ে আবদুল শাহ সুফি পীরে কাম্মেল বাবা মুজিবুল বশর
 আল হাসানীর পাক-পবিত্র হস্ত মোবারকে উৎসর্গ করলাম।

সাহায্য চাই

আমরা কোরান-এর প্রতিটি শব্দের হুবহু অনুবাদ এবং একটি শব্দের কত রকম অর্থ হতে পারে তাও তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। তারপর হুবহু বাক্য গঠন করতে চেষ্টা করেছি। তারপর সামান্য ব্যাখ্যাও দিতে চেষ্টা করেছি। কোরান-এর প্রতিটি সুরার এ-রকম অনুবাদ ও সামান্য ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন আছে বলে যারা মনে করেন এবং আমাদের অনুবাদ ভালো লেগেছে এবং এই অনুবাদের কিছুটা প্রচার হওয়া দরকার বলে মনে করেন তারা আমাদের আর্থিক সাহায্য দিতে পারেন অথবা জাকাতের একটি ক্ষুদ্র অংশ অথবা কোরবানির চামড়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ দান করতে পারেন।

এবং আমরা ধ্যানসাধনা করার একটি স্কুল খুলেছি। সাধকেরা সেখানে মাসের পর মাস ধ্যানসাধনায় মশগুল আছেন। সেই স্কুলের উন্নয়নের জন্য আর্থিক সাহায্য করতে পারেন – কারণ, সমগ্র বাংলাদেশে এই সর্বপ্রথম হেরা গুহাকে কেবলা করে একটি ধ্যানসাধনার স্কুল নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকাঘাটা গ্রামে খোলা হয়েছে। আগ্রহ থাকলে ধ্যানসাধনার স্কুলটি দেখেও আসতে পারেন। মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কাবায় শরিয়ত, কিন্তু হেরা গুহায় মারফত – এই মহান শিক্ষাটি মহানবি বাস্তবে আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। বোঝাটাও তকদির, না-বোঝাটাও তকদির।

সূচি

নফস ও রুহের পার্থক্য / ১৫

১৮নং সূরা : আল কাহাফ / ৫১

৩৬নং সূরা : ইয়াসিন / ১৭৯

চিহ্ন পরিচিতি

প্ট বাক্যে আয়াতের অনুবাদ
+ আয়াতের পরবর্তী অংশের
শব্দার্থভিত্তিক অনুবাদ
য় ব্যাখ্যা

নফস ও রুহের পার্থক্য

নফস শব্দটি দিয়ে প্রাণকেই বোঝানো হয়েছে। যদিও হিন্দুশাস্ত্রে নফসকে আত্মাই বলা হয়েছে তবে জীবের আত্মা বলা হয়েছে। এই নফস তথা প্রাণ কেবলমাত্র জিন এবং মানুষের মধ্যেই দেওয়া হয় নি, বরং স্থলচর, জলচর, সর্বপ্রকার অতি ক্ষুদ্র হতে অতি বড় জীব – সবারই নফস আছে তথা প্রাণ আছে। আরেকটু প্রশ্ন থেকে যায় যে, বৃক্ষ হতে তরু-লতারও প্রাণ আছে। এবং যে কতিন ছোট-ছোট পাখরগুলো আস্তে-আস্তে প্রকাণ্ড পাখরে পরিণত হয় উহাতে কি প্রাণ আছে? নাকি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনা-আপনি বেড়ে চলে? এই প্রশ্নটির উত্তর জীববিজ্ঞানীরাই ভালো দিতে পারবেন। তবে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মাঝে যাদেরকে নফস তথা প্রাণ দেওয়া হয়েছে তারা সবাই তাঁহিঁদে বাস করে – একমাত্র জিন এবং মানুষ ছাড়া। কারণ, জিন এবং মানুষকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দান করা হয়েছে। তথা ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনা করার সীমিত স্বাধীন ক্ষমতাটি আল্লাহ কর্তৃক দান করা হয়েছে। অন্যথায়, আমাদের জানা মতে আর কোনো জীবকেই এই রকম সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয় নাই। স্থলচর এবং জলচর যত প্রকার অসংখ্য ছোট এবং বড় প্রাণী আছে তাদের কারও শাহারগের তথা জীবন-রগের নিকটে আল্লাহর অবস্থান করার কথাটি কোরান-এ পাওয়া যায় না, এমনকি আল্লাহর তাঁর সমগ্র সৃষ্টিজগতের জড় পদার্থের সঙ্গে অবস্থান করার কথাটিও পাওয়া যায় না। অক্লের হিসাবের চেয়েও অনেক বেশি হিসাব করে আল্লাহ কোরান-এর প্রতিটি শব্দ চয়ন করেছেন। কিন্তু আমাদের বুঝবার সূক্ষ্ম দুর্বলতাটিকে প্রকাশ না করে গোঁজামিলের আশ্রয় নেই এবং নিতে হয়। যেমন রুহ শব্দটির পরিভাষা ইংরেজিতে পাওয়া যায় না। তাই না বুঝে ‘স্পিরিট’ শব্দটি ব্যবহার করি। রুহের প্রতিশব্দ যদিও আমরা পাই না তবে হিন্দুশাস্ত্রে এই রুহ শব্দটিকে পরমাত্মা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে পরম অর্থটি হলো আল্লাহ এবং আল্লাহর আত্মা বলে বোঝানো হয়েছে। অবশ্য কোরান-এ রুহকে বলা হয়েছে “কুলুর রুহ মিন্ আমরি রাব্বি” – অর্থাৎ, “রুহ আমার রবেরই আদেশ হইতে অগিত।”

জীবের জীবন আছে তথা প্রাণ আছে তথা নফস আছে – তা হলে এই জীবন, এই প্রাণ এবং এই নফসকে কেমন করে আত্মা বলে ঘোষণা করি? সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাও একটি সাংঘর্ষিক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তবে বুঝতে এবং বোঝাতে কোনো উপায় থাকে না বলেই এই সাংঘর্ষিক বিষয়টি তুলে ধরতে হয়। কেউ জেনে-শুনে তুলে ধরেন, আবার কেউ না-জেনে তুলে ধরেন। বিষয়টি ভুল হলেও দোষ দেওয়া যায় না। কারণ জ্ঞানের অভাবেই এ-রকমটি হয় বলে মনে করি। জীবের প্রাণ আছে, কিন্তু কোনো আত্মা নাই – এই কথাটি কেমন করে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরব? আসলে হাকিকতে কোনো জীবেরই আত্মা নাই – একমাত্র জিন এবং মানুষের শাহারগের তথা জীবন-রগের নিকটে অতীব সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, যাহা তাঁর পাবার কোনো উপায় থাকে না সেই পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত না একজন মানুষ একটানা কয়েক বছর কামেল গুরু অথবা কামেল গুরুর খেলাফতপ্রাপ্ত কোনো খলিফার নির্দেশে নির্জন স্থানে একাকী ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে। কারণ, রুহ বিষয়টি কথার দ্বারা বোঝানো যায় না।

তবে অতি সামান্য একটি ধারণার ছায়া দেওয়া যায়। কোরান-এর এই ছোট্ট আয়াতটির দিকে একটু বিশেষভাবে লক্ষ করে দেখুন যে, 'কুলুর নাক্সি মিন আম্মরি রাব্বি' বলা হয় নি। কেন বলা হয় নি? কারণ, আল্লাহর কোনো নফস নাই। নফস যাদের আছে তাদের অবশ্যই একটিবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যেহেতু রুহ রবেরই আদেশ বলা হয়েছে সেই হেতু রুহ জলম-মৃত্যুর বৃত্তে তথা বলয়ে অবস্থান করে না। যেহেতু রবের আদেশটি হলো রুহ এবং এই রুহ নামক আদেশটি আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে (অবশ্য আমাদের জানা মতে, কারণ অন্য গ্রহে যদি এই জাতীয় কোনো জীব থেকে থাকে!) কেবলমাত্র দুটি জীবের সঙ্গে তথা দুইটি নফসের কাছাকাছি অতীব সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে।

সেই দুইটি জীবের নাম হলো : একটি জিন এবং অপরটি মানুষ। যেহেতু আমাদের কাজ-কারবার মানুষদের নিয়েই সেই হেতু ইচ্ছা করেই জিন জাতিকে এড়িয়ে যাই। তা ছাড়া কোরান এই মানুষকেই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব (ফ্রাউন অব দ্য ফ্রিয়েশন) বলে ঘোষণা করেছেন। এর পরেও আরও কিছু কথা থাকে আর সেই কথাটি হলো, শয়তানকেও আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে জিন এবং মানুষের অন্তরে অবস্থান করার আদেশটি আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে ভালো করে মনে রাখতে হবে যে জিন এবং মানুষের অন্তর বিহনে আর কোথাও শয়তানকে অবস্থান করার অনুমতিটি দেওয়া হয় নাই। সুতরাং, শয়তানের যত বাহাদুরি, যত নর্তন-কুর্দন সব কিছু এই জিন এবং মানুষের অন্তরের মধ্যেই অবস্থান করে। জাগতিক সভ্যতার বিকাশ ঘটানোর পেছনে এবং ধ্বংসের বিভীষিকা ছড়ানোর পেছনে শয়তানের অবদান কতটুকু তা আমাদের জানা নাই। এই শয়তান আবার চারটি রূপ ধারণ করতে পারে এবং এই চার রূপের যে-কোনো রূপ ধারণ করে মানুষকে সঠিক পথ হতে সরিয়ে দিয়ে ভ্রান্ত পথে তেলে দেয়। সেই চারটি রূপ হলো : এক. শয়তান, দুই. ইবলিস, তিন. মরদুদ এবং চার. খান্নাস। যেহেতু 'মিন শাররিন্ ওয়াসওয়াসিল খান্নাস' তথা খান্নাসের অপকারিতা হতে আশ্রয় চাওয়ায় কথাটি কোরান-এ বলা হয়েছে তাই পবিত্র নফস তথা প্রাণ তথা জীবনের সঙ্গে একত্রে বাস করে নফসটিকে খান্নাস-রূপী শয়তান মোহ-মায়ার জালে আটকিয়ে রাখে। এই মোহ-মায়ার জালটিকে ছিন্ন করতে পারলেই নফসের নিকট যে-রুহ অতীব সূক্ষ্ম রূপে অবস্থান করছে উহা তখন পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করতে থাকে। সাধকেরা একটানা ধ্যানসাধনা করার পর আল্লাহর বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত হলেই রুহের অতীব সূক্ষ্ম রূপটিকে পরিপূর্ণরূপে দেখতে পেয়ে অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব খেয়ে যায়। এই পরিপূর্ণতার প্রশ্নে সাধকদের নিকট রুহের দর্শনে ফানা-বাকার এমন রহস্যময় লীলাখেলা চলে যে সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, বরং বড়-বড় বিদ্বান পণ্ডিতেরাও এদের বিষয়ে খেই হারিয়ে ফেলে। রুহের পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থানটি যে-সাধকের মধ্যে অবস্থান করে তিনিই বান্দানেওয়াজ তথা আল্লাহর বিশেষ রহমতপ্রাপ্ত বান্দা। তিনিই রুহুল্লাহ তথা পরিপূর্ণ রুহের অধিকারী। তিনিই ওয়াজহুল্লাহ তথা তিনিই আল্লাহর চেহারা। তিনিই নরের রূপে নারায়ণ তথা নরনারায়ণ। আল্লাহর এই দানটি একমাত্র শক্তিশালী রাত্রিতে দান করা হয়। ইহা কোনো নৈসর্গিক রাত্রি নহে, বরং আধ্যাত্মিক রাত্রি। নফস এবং খান্নাস জোড়া হলে এই শক্তিশালী রাত্রির সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই খান্নাসকে তাড়িয়ে দিয়ে সাধক যখন বেজোড় রাত্রিতে অবস্থান করে তখনই সেই রাত্রিটি হয় শক্তিশালী রাত্রি এবং এই শক্তিশালী রাত্রিই আল্লাহ 'রহিম'-রূপটি ধারণ করে (রহমান-রূপে নয় কারণ রহমান-রূপে সাধারণ দান) দান করেন। তাই আল্লাহ এখানে

গফুরুর রহিম, কিন্তু গফুরুর রহমান নন, কারণ কোরান-এর একটি স্থানেও গফুরুর রহমান ব্যবহৃত হয় নি।

কোরান-এর সাতানব্বই নম্বর সূরা কদর-এর চার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: তানাজ্জালুল্ মালাইকাতু ওয়ারু রুহ ফিতা বিইজ্জনি রাব্বিহিম মিন্ কুল্লিলি আম্মরিন।

স্ট তাহার মধ্যে (সেই রাত্রিতে) অবতরণ করিয়াছে ফেরেশতাগণ এবং রুহ উহার মধ্যে তাহাদের রবের অনুমতিতে প্রত্যেক আদেশ হইতে।

সাধকেরা যখন বিরাট ধৈর্যধারণ করে একটানা নির্জন ধ্যানসাধনা করতে থাকেন (মহানবির হেরা গুহায় পনের বছর ধ্যানসাধনাটি মনে রেখে) তখন সাধকদের মধ্যে অবস্থান করা রব তথা প্রতিপালকের প্রত্যেক আদেশ হতে ফেরেশতাগণ এবং রুহ অবতরণ করে। এই ফেরেশতাগণ এবং রুহ শক্তিশালী বেজোড় রাত্রিতে অবতরণ করে, কারণ জোড় রাত্রিতে সাধকের সঙ্গে তখনও খান্নাসরুপী শয়তানটির সামান্য অবস্থানেও দুইজন হয়ে যায় এবং এই দুইজন হওয়াকেই জোড় বলা হয়। এবং দিনে না বলে রাত্রিতে কেন বলা হলো? দিনের আলোতে সব কিছু যেমন পরিষ্কার দেখা যায় তেমনি রাত্রির অন্ধকার সব কিছু ঢেকে দেয়। এই রাত্রির অন্ধকারের সব কিছু ঢেকে দেবার কথাটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, দর্শনীয় সব রকম মোহমায়াগুলো আল্লাহর অনুমতিতে ঢেকে দেওয়া হয়। রাতের আধার যে-রকম সব কিছু ঢেকে দেয় তেমনি সাধকের ভেতরে অবস্থান করা লোভ-মোহ-মায়াগুলো আল্লাহর অনুমতিতে ঢেকে দেওয়া হয় এবং যখনই ঢেকে দেওয়া হয় তখনই ফেরেশতাগণ এবং রুহ অবতরণ করে। এই ফেরেশতাগণ এবং রুহ যে-রাতে আল্লাহর অনুমতিতে অবতরণ করে সেই রাতটিকে বেজোড় এবং শক্তিশালী রাত্রি বলে আখ্যায়িত করা হয়। হাকিকতের সঙ্গে মেজাজি কথাগুলোর কী অপূর্ব মিলন ঘটানো হয়েছে কোরানুল হাকিম-এ। এখানে একটু লক্ষ করে দেখুন তো যে ফেরেশতাগণ এবং নফস নাজেদ করার কথাটি বলা হয় নি। প্রথমে ফেরেশতাগণ এবং পরে রুহের কথাটি বলা হয়েছে, কারণ ফেরেশতাদের নফসও নাই রুহও নাই এবং থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না, কারণ ফেরেশতার যত শক্তির অধিকারীই হোক না কেন তাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মোটেও বলা হয় নি, বরং ফেরেশতাদেরকে আমরা সেবকের ভূমিকায় দেখতে পাই, মওলার ভূমিকায় নয়। ফেরেশতারা সেফাতি নুরের তৈরি তাই ফেরেশতারা সৃষ্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত তথা সিদ্দ্রাতুল মুনতাহী পর্যন্ত যাবার অনুমতি পেয়েছে। অনেক অনুবাদক না-বুঝে, না-গুনে রুহকে জিবরাইল ফেরেশতা বলে অনুবাদ করেছেন। সহজ-সরল পাঠকের এ-রকম খান্না অনুবাদ পড়ে-পড়ে আশ্চর্য থাকার কথা নয় এবং তখনই এক ইসলামের মধ্যে ফেরকাবাজি শুরু হয়ে যায়। আত্মকেন্দ্রিকতার অন্ধকার গম্বরে নিরপেক্ষ দর্শনটি হারিয়ে যায়। অনেকে তো কোরানুল হাকিম-কে ডাল-ভাতের মতো সহজ মনে করে থাকে এবং বিকৃত অনুবাদ ও বিকৃত ব্যাখ্যায় ভরপুর করে রাখে এবং এই বিকৃত অনুবাদ ও বিকৃত ব্যাখ্যা পড়ে-পড়ে সরল-সহজ মানুষটির মনের অবস্থানটি কেমন হয় তাহা কমবেশি সবাই বুঝতে পারে। নিউটন, আইনস্টাইন, নিলস্ বোর এবং স্টিফেন হকিং-এর মতো অসংখ্য জ্ঞানী-গুণীর জন্য যদি কোরানুল হাকিম শিক্ষণীয় বিরাট একটি বিষয় না হতে পারে তা হলে আমাদের মতো অল্প বিদ্যায় বিদ্বানেরা এই প্রশ্নের কী উত্তর দেয়?

সূরা মোমিন-এর পনের নম্বর আয়াতে রুহ সঙ্ক্কে বলা হয়েছে : ইউল্কির (নিষ্কোপ করেন, ক্লেপণ করেন, সম্মুখে স্থাপন করেন, অর্পণ করেন) রুহা

(রুহকে, পরমাত্মাকে) মিন (হইতে) আম্মরিহি (তাঁহার আদেশ) আলা (উপর) মাই (যাহাকে) ইয়াশাউ (ইচ্ছা করেন)।

প্ট নিক্ষেপ করেন রুহ তাঁহার আদেশ হইতে যাহার উপর ইচ্ছা করেন।

এই আয়াতে রুহকে নিক্ষেপ করার কথাটি বলা হয়েছে তথা রুহকে ক্লেপণ করা হয় বলা হয়েছে। এই রুহকে ক্লেপণ করার কাজটি করা হয় তাঁর (আল্লাহর) আদেশ হতে যার উপর তিনি (আল্লাহ) ইচ্ছা করেন। আল্লাহর ইচ্ছার উপযুক্ত বান্দা হতে পারলেই সেই বান্দার উপর তাঁর আদেশ হতে রুহ নিক্ষেপ করা হয়। অবশ্য আল্লাহর তৈরি প্রতিটি মানুষের সঙ্গে রুহকে অতীব সূক্ষ্ম বীজরূপে স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে তথা প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই আল্লাহ প্রতিপালকরূপে তথা রবরূপে বিরাজ করছেন। সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারে না যে আল্লাহ তারই ভেতর রবরূপটি তথা প্রতিপালকের রূপটি ধারণ করে অতীব সূক্ষ্ম রুহরূপে বিরাজ করছেন। তাই মানুষ নিজের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা সত্যটিকে বুঝতে না পেরে ঊর্ধ্ব গগনে আল্লাহর অবস্থানটি আছে বলে বিশ্বাস স্থাপন করে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনার ভাষাটি বলতে থাকে। সাধক যখন নির্জনে একাকী মাসের পর মাস বিরাট ধৈর্যধারণ করে ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে তখন এই মগ্ন অবস্থার মাঝেই একদিন না একদিন আল্লাহরই আদেশ হতে তথা আল্লাহর বিশেষ রহমতে এই রুহকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়ে যায় এবং ম্লেচ্ছাজি সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

আসলে সাধকের অন্তরে যে পর্যন্ত দুইয়ের অবস্থান বিরাজ করে তথা পবিত্র নফস যোগ খান্নাসরূপী শয়তান উভয়ে একত্রে বসবাস করে ততক্ষণ পর্যন্ত রুহের আসল পরিচয়টি লাভ করা যায় না। আপন পবিত্র নফস হতে অপবিত্র খান্নাসকে তাড়িয়ে দেবার গভীরতাটি সমভাবে সবার বেলায় প্রযোজ্য হয় না। কারও অন্তর সময়েই হয়ে থাকে, আবার কারও-বা বেশ কিছু সময় লাগে, আবার কারও-বা দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারে। যেইমাত্র পবিত্র নফসটি অপবিত্র খান্নাস হতে মুক্তি লাভ করে তখনই রুহের আসল পরিচয়টি জানতে পারে এবং এই জানাটি আল্লাহর আদেশ হতেই আগত। তাই সাধকের কাছে মনে হবে যে, এই রুহকে নিক্ষেপ করা হয়েছে।

এই রুহের পরিপূর্ণ দর্শনটিকেই আমরা তথা মুসলমানেরা নুরে মুহাম্মদির দর্শন বলে থাকি। আবার অন্য যে-কোনো ধর্মের যে-কোনো সাধক যদি পরিপূর্ণ রুহের দর্শনটি লাভ করে থাকেন আর যদি সেই ধর্মের প্রবর্তকের নামে নুরটির নামকরণ করে থাকেন তা হলে আমাদের বলার কিছু থাকে না। কারণ আল্লাহ এক, তাঁর নুরও এক এবং বীজরূপী রুহের অবস্থানটিও এক। এখানে দুইয়ের কোনো স্থান নাই। দুইয়ের স্থানটিকে স্বীকার করে নিলেই শেরেক করা হয়ে যায়। ইহাই আসল শেরেক। মুখের কথায় শেরেকের কোনো দাম নাই।

এই আয়াতে বর্ণিত রুহ শব্দটির মর্মার্থ বুঝতে না পেরে অনেক অনুবাদক এই রুহকেই 'ওহি' অনুবাদ করেছেন। কোথায় রুহ আর কোথায় ওহি! আল্লাহ কি রুহের স্থলে ওহি শব্দটি বলতে পারতেন না? অবশ্য না বোঝার কারণেই এ রকম গোঁজামিল দাঁড় করানো হয়। তবু একটিবারের তরেও এই অনুবাদকারীরা ভুলেও বলতে চাইবেন না যে ইহার অর্থটি জানা নাই। ইনারা সব কিছু জানেন, তাই রুহকেও প্রয়োজনে ওহি লিখে ফেলেন। সুতরাং, এ-রকম অনুবাদ পড়ে আপনি আর আশ্মি যে কত রকম ভুল শিখছি তারও হিসাব নাই। যেমন কোরান-এর সুরা বনি ইসরাইল-এর আটটি নম্বর আয়াতের কোরান-কে বেশিরভাগ অনুবাদকারী 'নামাজ' অনুবাদ করে ফেলেছেন এবং কোরান-কে নামাজ অনুবাদ করার কারণটির একবোঝা ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ

আপনাকে আর আমাকে শুনিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেন। আবার, এই ‘রুহ’ শব্দটিকেই অনেক অনুবাদকারী বুঝতে না পেরে রুহের অনুবাদে জিবরাইল নামক ফেরেশতাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অথচ আমরা সবাই জানি যে জিবরাইল ফেরেশতা যতই মর্যাদার অধিকারী হন না কেন, জিবরাইল ফেরেশতার মাঝে রুহও নাই এবং নফসও নাই। এ যেন অন্ধকে সুন্দর দুটি চোখের অধিকারী বলার মতো। এ যেন টুঙা ছেলেকে ‘হাঁটিবার নূতন স্টাইল দেখানো হচ্ছে’ বলে বোঝানো।

কোরান-এর আটাত্তর নম্বর সূরা নাবা-র আটত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : ইয়াওম্মা (সেই দিনটিতে) ইয়াকুম্বুর (দাঁড়াইবে) রুহ (রুহ) ওয়াল্ (এবং) মাল্লাইকাতু (ফেরেশতারা) সাফ্ফাল্লা (সারিবদ্ধভাবে)।

প্ট সেই দিনটিতে রুহ এবং ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবে।

এই আয়াতে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর তা হলো, রুহকেও দাঁড়াবার কথাটি বলা হয়েছে এবং রুহের সঙ্গে ফেরেশতাদেরও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নফসের দাঁড়াবার কথাটি বলা হয় নাই। অথচ নফসেরই দাঁড়াবার কথা। যে-সাধকের নফসটি খান্নাসমুজ্জ হয়ে পবিত্র হয়েছে সেই নফসটি তখন রুহের মহাশক্তির মাঝে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়। তখন মনে হয় নফস দাঁড়িয়ে আছে : আসলে রুহের মহাশক্তির মাঝে অবস্থান করছে। কোরান-এর অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আপনি হুঁড়ে মারেন নি, বরং আল্মি (আল্লাহ) স্বয়ং হুঁড়ে মেরেছি। সাধারণ মানুষ হতে বিজ্রলোকেরা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে যে, মহানবি হাত দিয়ে হুঁড়ে মারছেন, অথচ আল্লাহ অস্বীকার করে বলছেন যে, ওটা আপনার হাত নয়, বরং ওটা আমার হাত। সেই রকম, খান্নাসমুজ্জ রুহ-এর জাগ্রত পরিপূর্ণতায় নফসটি ডুবে থাকলে রুহের দাঁড়ানোর কথাটি বলা একান্ত স্বাভাবিক। এবং ফেরেশতাদের দাঁড়াবার বিষয়টি এখানে স্বাভাবিক একটি বিষয়। কারণ ফেরেশতারা নফস-ও রুহ-বর্জিত আল্লাহর সেফাতি নুরের তৈরি কুদরতি রোবট। কুদরতি রোবট এ-জন্যই বলা হলো যে ফেরেশতাদের ভালো এবং মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নাই, বরং আল্লাহ যে-হুকুমটি করবে উহাই পালন করতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং, সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতারাও দাঁড়াতে ইহাতে অবাক হবার কিছু নাই।

জাগ্রত রুহের অধিকারী সাধকেরা আকৃতিতে মানব হলেও মানবের স্বাভাবিক ভাবভঙ্গি হতে সম্পূর্ণ বর্জিত অবস্থায় অবস্থান করে। এই জাতীয় সাধকদেরকে বান্দানেওয়াজ্জ বলা হয়; আবার কখনো ওয়াজ্জহল্লাহ বলা হয়; আবার কখনো সারাপা বলা হয়; আবার কখনো নরের রূপে নারায়ণ বলা হয়ে থাকে। কারণ এই সাধকেরাই আল্লাহর রূপটি ধারণ করে আছেন। এই জাতীয় অনেক সাধকেরা এক ও অভিন্ন। কারণ সব সাধকই একই নুরের অধিকারী। এজন্য বিশেষভাবে আরেকটু লক্ষ্য করার মতো বিষয়টি হলো, রুহ শব্দটি কোরানুল হাকিম-এ একটিবারের তরেও বহুবচনে ব্যবহার করা হয় নাই। ইহারা সবাই মিলে ‘আমরা’-রূপটি ধারণ করে। আসলে এই ‘আমরা’ই এক ও অভিন্ন। এইখানে এসেই শেরেকের হয় অবসান। যদিও সাধারণ মানুষের পক্ষে এই বিষয়টি বোঝা একটু কষ্টকর বৈকি।

কোরান-এ ‘আমরা’ নামক বহুবচনের ব্যবহারটিতে একটি বিস্ময়কর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। এই বিস্ময়কর কোরান-এর সৌন্দর্যটি বুঝতে না পারলে তৌহিদের আসল এবং রহস্যময় রূপটি উপলব্ধি করা প্রায় এক রকম অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আবার কোরান-এর অনেক অনুবাদক ফেরেশতাদের দাঁড়াবার কথাটি মেনে নেয়, কিন্তু তারপরেই রুহকে জিবরাইল অনুবাদ করে। জিবরাইলও যে একজন ফেরেশতা ইহা তারা জেনেও না জানার ভান করে। আল্লাহ কি রুহের স্থলে জিবরাইল নামক বিশেষ ফেরেশতাটির নাম উল্লেখ করতে পারতেন না? কিন্তু কোরান-এ রুহ শব্দটি ব্যবহার করলে কী হবে, অনুবাদে অনুবাদক রুহকে জিবরাইল ফেরেশতা অনুবাদ করে ফেলেন। কেন এই রকম করেন বলে প্রশ্ন করলে একবোঝা গোঁজামিল-দেওয়া কথা শুনিয়ে দেবেন, তবু নিজেদের ভুলটি মোটেই স্বীকার করে নেবেন না, অথবা 'বুঝতে পারলাম না' বলে সংসীহস নিয়ে ঘোষণাও করেন না। এভাবে কোরান-এর কত শব্দের যে কত রকম বিকৃত অর্থের দ্বারা ভরে রাখে তারই বা প্রতিবাদ কে করে? এই রকম অনুবাদকদেরকে জ্ঞানপাপী বলতে চাই না, কিন্তু এ-রকম করাটি কি বিদ্রাষ্টি ছড়ায় না? এই রকম বিদ্রাষ্টির জাতাকলে পড়ে কত সহজ-সরল মানুষেরা যে বিদ্রাষ্ট হচ্ছেন তারই বা খবর কে রাখেন? একটিবারের তরে চিন্তা করে দেখুন তো যে, প্রথমেই বলা হয়েছে ফেরেশতাগণ এবং তার পরে বলা হয়েছে রুহ, আর সেই রুহের অনুবাদটি করা হলো জিবরাইল নামক ফেরেশতা। অনুবাদক কি বেমানুম ভুলে গিয়েছেন যে জিবরাইল ফেরেশতার রুহও নাই এবং নফসও নাই? যেখানে জিবরাইল ফেরেশতার রুহটি থাকার প্রশ্নই ওঠে না সেখানে রুহকে কেমন করে জিবরাইল ফেরেশতা বলে অনুবাদ করা হয়?

কোরান-এর একুশ নম্বর সূরা আশ্বিয়ার একনিব্বই নম্বর আয়াতে আছে : ওয়া (এবং) লুাতি (যে) আহসানাত (রক্ষা করিয়াছিল, সংরক্ষণ করিয়াছিল, বজায় রাখিয়াছিল, টিকাইয়া রাখিয়াছিল) ফারজাহা (তাহার কামপ্রবৃত্তিকে, তাহার সতীত্বকে, যান সন্তোগকে) ফানাফাখনা (সুতরাং আমরা [আল্লাহ] ফুৎকার দিয়াছিলাম) ফিহা (তাহার [মরিয়ম] মধ্যে) মিন্ (হইতে) রুহিনা (আমাদের রুহ) ওয়া (এবং) জাআলনাহা (তাহাকে বানাইয়াছিলাম) ওয়া (এবং) আবনাহা (তাহার পুত্রকে) আয়াতাল্ (একটি আয়াত [নিদর্শন]) লিল্ (জন্য) আলামিন্ (সমস্ত আলমের, বিশ্ববাসীদের)।

স্ট এবং যিনি (মরিয়ম) তাহার সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিলেন সুতরাং আমরা ফুৎকার দিলাম তাহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তাহাকে বানাইয়াছিলাম এবং তাহার পুত্রকে একটি আয়াত সমস্ত আলমের জন্য।

এই আয়াতটির সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, আল্লাহ কেবলমাত্র পুরুষদের মধ্যেই রুহ ফুৎকার করেন না, বরং মানুষের তৈরি সমাজে অবহেলিত নারীর মধ্যেও আল্লাহ রুহ ফুৎকার করেন। নারী জাতিকে দুর্বল পেয়ে পুরুষরা নারীদেরকে সমাজের বুকে তেমন মর্যাদা দেয় না, কিন্তু এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে নারীর মধ্যেও আল্লাহ রুহ ফুৎকার করেন। যদি সেই নারী আল্লাহর দৃষ্টিতে রুহ ফুৎকার করার উপযুক্ত হন তো অবশ্যই রুহ ফুৎকার করা হয়। আমরা কোরান হতে জানতে পারি যে, আল্লাহ প্রথম রুহ ফুৎকারটি আদমের মধ্যে করেছিলেন। আরও একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন যে, এখানে তথা এই আয়াতে নফস ফুৎকার করার কথাটি বলা হয় নি এবং নফস ফুৎকার করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ আল্লাহর কোনো নফস নাই। যেহেতু আল্লাহর কোনো নফসই নাই, সুতরাং ফুৎকার দেবার প্রশ্নই ওঠে না। নফস জীবন-মৃত্যুর অধীন। নফস সুখ-দুঃখ ভোগ করে। নফসের কান্দি-অবসাদ-ঘুম-আলস্য আছে। সুতরাং আল্লাহ এইসব বিষয় হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে তথা মৃত্যু-ঘটনাটির মুখোমুখি নফসটিকেই হতে হয় - যাকে আমরা বাংলায় জীবাত্মা বলে থাকি। প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ

গ্রহণ করবে - বলা হয়েছে কোরান-এ, কিন্তু কোরান মৃত্যুতে নফসটি ধ্বংস হয়ে যাবে এই কথাটি বলে নি। 'জায়েক' অর্থ স্বাদ গ্রহণ করা, চেখে দেখা। মা-বোনেরা তরকারিতে লবণ হয়েছে কি না তরকারির গুরুয়া চেখে দেখলে বুঝতে পারেন। সেই রকম প্রতিটি নফসকে মৃত্যু-ঘটনাটি কেমন উহা চেখে দেখতে হবে। যেহেতু রুহ সৃষ্টির অন্তর্গত নয়, রুহ সৃষ্টির মধ্যে পড়ে না, সেই হেতু রুহের মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি কোরান-এ একবারও বলা হয় নি। যেমন 'কুল্লু রুহিন জায়েকাতুল মউত' - অর্থাৎ, প্রত্যেক রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, এই কথাটি কোরান-এ একবারও বলা হয় নি। গায়ের জোরে গুণ্ডা হওয়া যায়, কিন্তু গুরু হওয়া যায় না। যারা রুহকেও সৃষ্টির আওতায় এনে 'নুরানি মাখলুক' তথা নুরের সৃষ্টি বলতে চায় এবং ব্যাখ্যা করতে চায়, তাদেরকেও বলার কিছু থাকে না। কারণ, তকদির তাকে অথবা তাদেরকে এই বিষয়টি বুঝতে দেয় না। আরও লক্ষ্য করুন যে, আল্লাহ এক হয়েও 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু রুহ শব্দটি কোরান-এ কোথাও বহুবচনে ব্যবহার করা হয় নি। আল্লাহর রুহ কেবলমাত্র ইসা (আ.)-এর মাকেই ফুৎকার করেন নি, বরং তাঁহার পুত্র ইসা (আ.)-কেও (অনেকে যিশুখ্রিস্টও বলে থাকেন) রুহ ফুৎকার করে দিয়েছেন। কোরান-এ 'ওয়া আবনাহা' - 'এবং তাঁহার পুত্রকেও' রুহ ফুৎকার করেছেন বলা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, কোরান মরিয়ম-এর পুত্রকেও সমস্ত আলমের জন্য একটি আয়াত করে রেখেছেন তথা 'আইয়াতাল্লিল আলামিন'। আল্লাহর প্রতিটি আয়াতই একেকটি বিস্ময়, কিন্তু ইসা (আ.) হলেন আল্লাহর একটি বিস্ময়ের বিস্ময় নামক আয়াত। কারণ, ইসা (আ.) জন্মগ্রহণ করেই কথা বলেছিলেন এবং দোলনায় গুয়ে-গুয়ে অনেক কথা বলেছেন - এরও নিদর্শন আমরা দেখতে পাই এবং আরও অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন দেখতে পাই - যেমন হজরত ইসা (আ.) জন্মান্তকে চক্কু দান করেছেন, কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করেছেন এবং যে-বিষয়টি সবচেয়ে বিস্ময়কর : মৃত মানুষকে জীবন দান করেছেন এবং মাটির তৈরি একটি পাখি, যার মধ্যে নফস নাই তথা জীবনই নাই, সেই পাখিটিকে ফুৎকার দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জীবন্ত পাখি হয়ে উড়ে গেল এবং ইসা (আ.)-এর সাহাবারা কে কী দিয়ে খাদ্য খেয়েছেন সেটাও বলে দিতে পারতেন এবং সাহাবাদের ঘরের ভিতর কী কী আছে তাও পরিষ্কার বলে দিতে পারতেন। এখন প্রশ্ন হলো, যেখানে হজরত ইসা (আ.)-এর এলম্বে গায়েব জ্ঞানবার পরিষ্কার দলিলটি পেলাম, সেখানে মহানবি এলম্বে গায়েব জ্ঞানতেন না বলাটা যে একটি কুফরি আকিদা, এটা অনেকেই বুঝেও বোঝেন না। যারা বুঝেও বোঝেন না তাদেরকেই বা কী করে দোষারোপ করব? কারণ, উহা তাদের তকদির। মহানবি আবু জাহেলের হাতের মুঠোর পাথর-কণাগুলোকে কলমে পাঠ করালেন, যে পাথর-কণাগুলোর নফস থাকার প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে কোরান-এর কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মূল বিষয় হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহানবি সম্পর্কে যা-তা বলাটাকে সমীচীন মনে করি না।

কোরান-এর চার নম্বর সূরা আন নিসা-র একশত একাত্তর নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ইননামাল্ (নিশ্চয়ই) মাসিহ (মসিহ) ইসাবনু (ইসা [যিনি] পুত্র) মারিয়ামা (মরিয়মের) রাসুলুল্লাহি (আল্লাহর রসুল) ওয়া (এবং) কালিমাতুহ (তাঁহার কালাম) আলকাহী (তিনি [আল্লাহ] যাহা নিক্রপ করিয়াছিলেন) ইলা (দিকে) মারিয়ামা (মরিয়মের) ওয়া (এবং) রুহহন্ (রুহ) মিন্হ (তাঁহার [আল্লাহর] হইতে)।

পঁট নিশ্চয়ই মরিয়মপুত্র ইসা মসিহ আল্লাহর রসুল এবং তাঁহার কালাম। তিনি (আল্লাহ) যাহা নিষ্কপ করিয়াছিলেন মরিয়মের দিকে এবং তাঁহার (আল্লাহ) হইতে রুহ।

এই আয়াতে ইসা মসিহ (আ.)-কে মরিয়মের পুত্র এবং আল্লাহর একজন রসুল এবং আল্লাহরই কালাম যাহা আল্লাহ মরিয়মের দিকে নিষ্কপ করেছিলেন এবং আল্লাহ হতে একটি রুহ বলা হয়েছে। এই আয়াতটুকুর সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই যে-প্রশ্নটি সবার মাঝে জেগে উঠবে উঠা হলো, মরিয়মের পুত্র কেন বলা হলো? সবার পরিচয় বহন করে পিতার মাধ্যমে, কিন্তু ইসা মসিহের বেলায় মরিয়ম তথা মায়ের পরিচয়ে তথা নারীর পরিচয়ে কেন পরিচিত করা হলো? ইহার প্রধান কারণটি হলো, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মটিকে লঙ্ঘন করে পিতা ছাড়া ইসা মসিহ-র জন্মগ্রহণ করাটা সম্পূর্ণ একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় তথা ঘটনা। যদিও ইহা একটি বিষয় তথা ঘটনা, কিন্তু এই বিষয়টি তথা এই ঘটনাটি একটি অভাবনীয় বিস্ময়কর দৃষ্টান্তস্বরূপ মানবজাতির সামনে আল্লাহ দাঁড় করিয়ে দিলেন। অন্যত্র আল্লাহ ইসা মসিহকে একটি বিশেষ নিদর্শন বলেও অভিহিত করেছেন। এই ইসা মসিহ পিতা ছাড়া দুনিয়াতে আগমন করেছেন বলে কোরান-এর ভাষাটি হলো : মরিয়মের দিকে নিষ্কপ করা হয়েছে। পিতা-মাতার মিলনে যে সন্তান প্রকৃতির নিয়মে জন্মগ্রহণ করে উহা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বাভাবিক এবং নিষ্কপ করার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ইহা সবার চোখে ধরা পড়ে না। তাই পিতা ছাড়া ইসা মসিহকে মরিয়মের দিকে নিষ্কপ করা হয়েছে বলা হলো। তারপর বলা হলো, জন্মলগ্ন হতেই ইসা মসিহ আল্লাহর একজন রসুল। কোরান-এর অন্যত্র ইসা মসিহকে নবি বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর রসুল। তিনি রেসালত এবং নবুয়ত - উভয় গুণে গুণায়িত। তারপর আল্লাহ ইসাকে আরেক ধাপ উপরে উঠিয়ে বলছেন 'কালিমা'তুহ' তথা আল্লাহর কালাম। এবং তারপরে আবার আল্লাহ বললেন যে, ইসা মসিহ 'ওয়া রুহন মিনহ' তথা 'এবং তাহার (আল্লাহ) হইতে রুহ।' প্রথমে রসুল, তারপরে আল্লাহর কালাম, তারপর আল্লাহ হতে একটি রুহ বলা হয়েছে। এখানে কিছু নফস বলা হয় নি, কারণ নফস হলো প্রাণ। এই নফস তথা প্রাণের কথাটি না বলে আল্লাহর আদেশ তথা রুহ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এই রহস্যময় রুহ-শব্দটির রহস্য বুঝতে না পেরে অনেকেই আবোল-তাবোল, উল্টা-পাল্টা লিখেছেন। অবশ্য না বুঝেই এ-রকমটি করা হয়। অনেকে তো পণ্ডিতি করে রুহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে ফেলেন, যেমন : ১. রুহে ইনসানি, ২. রুহে হায়ানি, ৩. রুহে নাবাতি, ৪. রুহে জামাদি, ৫. রুহে বাতেনি। কী চমৎকার পাঁচ ভাগে ভাগ করার বাহারি লীলাখেলা! তবে একটি কথা না বলেই পারলাম না, আর সেটা হলো রুহে হায়ানি তথা জীবজন্তুর রুহ। সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও জীবজন্তুকে রুহ দান করার কথাটি পেলাম না, অথচ চোখ বুজে ইনারা জানোয়ারের মধ্যেও আল্লাহর রুহের আবিষ্কারটি করে ফেলেছেন। এরাই আবার মারফতের রহস্যগুলো গলা উচু করে পণ্ডিতি ভাষায় লিখে চলছেন। এইসব অখাদ্য-মার্কা মারফতের গোপন বিষয়গুলো পড়ে-পড়ে সরল-সহজ অর্ধশিক্ষিত এবং শিক্ষিতরা ভুল পথে পরিচালিত হয়। ইহাও কি তকদিরের লীলাখেলা বলে চালিয়ে দেব?

কোরান-এর উনিশ নম্বর সূরা মরিয়ম-এর সতের নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে

:

ফাত্তাখাজাত (সুতরাং তিনি [মরিয়ম] গ্রহণ করিলেন) মিন্ দুনিহিম (তাহাদের হইতে) হিজাবান (পর্দা) ফা আরসালনা (সুতরাং আমরা [আল্লাহ] পাঠাইলাম) ইলাইহা (তাহার দিকে) রুহানা (আমাদের [আল্লাহর] রুহ) ফাতামাসসালা (সুতরাং উহা প্রকাশিত হইল) লাহা (তাহার জন্য) বাশারান (বাশার [মানুষ]) সাউইইয়ান (পরিপূর্ণ)।

সুতরাং তিনি (মরিয়ম) পর্দা গ্রহণ করিলেন তাহাদের হইতে, সুতরাং আমরা (আল্লাহ) পাঠাইলাম তাহার দিকে আমাদের (আল্লাহ) রুহ সুতরাং উহা প্রকাশিত হইল তাহার জন্য পরিপূর্ণ বাশার (মানুষ)।

এই আয়াতে প্রথমেই বলা হলো, তিনি তথা মরিয়ম পর্দা গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ, তিনি একাকী ধ্যানসাধনায় মগ্ন রইলেন – যে-ধ্যানসাধনাটিকে অনেকে মোরাকাবা-মোশাহেদা বলে থাকেন, আবার অনেকে এতেকাফ-ও বলে থাকেন। যার যে-রকম দৃষ্টিভঙ্গি সে তো সেই রকমই বলবে। তারপরেই বলা হলো, আল্লাহ ‘আমরা’-রূপটি ধারণ করে তথা বহুবচনের রূপ ধারণ করে মরিয়মের দিকে ‘আমাদের’ তথা বহুবচন ব্যবহার করে একবচনে রুহকে পাঠানো হলো এবং সেই রুহ বাশার-এর রূপ ধারণ করে তথা পরিপূর্ণ মানবের আকার ধারণ করে তার কাছে দেখা দিলেন। এই বিষয়টি এতই রহস্যপূর্ণ যে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি লিখতে গেলে সাধারণ মানুষ খতমত খেয়ে যাবে। তাই এই রহস্যটি জানা থাকা সত্ত্বেও লিখলাম না। অনেকে তো এখানেও এই ‘রুহানা’ শব্দটির অর্থ করে থাকেন জিবরাইল নামক ফেরেশতা। অথচ জিবরাইল ফেরেশতাকে আল্লাহ রুহও দেন নাই এবং নফসও দেন নাই। এই রুহ-এবং নফস-বর্জিত জিবরাইল ফেরেশতাটিকে রুহানার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করে বাক্য গঠন করে তৃপ্তি লাভ করেন, তবু এরা নিজেদের ভুলটি স্বীকার করে নেবেন না অথবা “এই ‘রুহানা’ কথাটি বলতে কী বোঝায় তাহা আমাদের জানা নাই” বলতে বড়ই লজ্জা পায়। আল্লাহর রুহ যে বাশার-রূপটি তথা পরিপূর্ণ মানব-আকৃতি তথা পুরুষের আকৃতি ধারণ করেন ইহা আমরা জানতে পারি, কিন্তু রুহ যে পরিপূর্ণ নারী-রূপও ধারণ করতে পারে ইহা আমাদের জানা নাই। তবে নারীকেও যে রুহ ফুৎকার করে দেওয়া হয় ইহার জ্বলন্ত প্রমাণটি এখানেই পাওয়া যায়।

রুহ যে পরিপূর্ণ মানব-আকৃতিও ধারণ করতে পারে ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হলো যে আল্লাহ রুহ-রূপ ধারণ করে সাধককে দর্শন দান করেন। তাই আল্লাহর ওলি, গাউস, কুতুব, আবদাল এবং আরিফেরা বলে থাকেন যে যিনি অথবা যারা আল্লাহর দর্শন লাভ করেছেন তারা আদম-সুরতেই দর্শন করেছেন। এই আদম-সুরতটিকে কোথাও ইনসানরূপ ধারণ করার পরিবর্তে বাশাররূপ ধারণের কথাটি পাই। তা ছাড়া যে-জিবরাইল ফেরেশতা আল্লাহর সেফাতি নুরের তৈরি এবং জিবরাইলের রুহও নাই এবং নফসও নাই, সে জিবরাইল ফেরেশতা মানবের আকার ধারণ করে মহানবি এবং মহানবির সাহাবাদের সঙ্গে দর্শন দান করেছেন। জিবরাইল মানবের আকার ধারণ করলেই যে মাটির তৈরি বলতে হবে ইহাও যেমন মোটেও সত্য নহে তেমনি মহানবি যদিও আমাদেরই মতো, কিন্তু মোটেও মাটির তৈরি তো ননই, এমনকি আল্লাহর সেফাতি নুরেরও নহেন, বরং আল্লাহর জ্ঞান নুরে নুরময় হলেন মহানবি। যদি তাহাই না হয় তাহলে মহানবির পক্ষে লা-মোকামে প্রবেশ করা একটি অসম্ভব বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জিবরাইল ফেরেশতা সিদরাতুল মুনতাহায় এসে যেমন গেলেন এবং বললেন যে, এরপরে যদি একটি ধাপ অগ্রসর হতে চাই তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাব। কারণ জিবরাইল

সেফাতি নুরের তৈরি আর মহানবি আল্লাহর জাত নুরে নুরময়। তাই আল্লাহর ওলিরা বলে থাকেন যে, দোজোহিকা শেকেল এক হ'য়, কিসকো খোদা কাহ তথা আল্লাহ ও মহানবির একই চেহারা, তাহলে কাকে খোদা বলব? আল্লাহর এই লা-মোকামে যাবার অনুমতি ও রহমতটি মহানবির উম্মতদেরকে দান করা হয়েছে। তাই মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রধান খলিফা হজরত আমির খসরু-লিখিত ফারসি ভাষার কালামে বলা হয়েছে :

খোদা খোদ মিরে মুজলিশ বুদ্ধ আন্দার লা মোকা খসরু - তথা, 'খসরুও লা মোকামে গিয়েছিলেন।' - এখন প্রশ্ন হলো, যদি আমির খসরু লা-মোকামে যাবার ক্রমটি অর্জন করতে পারেন তাহলে তাঁরই পীর মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া এবং নিজামউদ্দিন আউলিয়ার পীর বাবা শেখ ফরিদ এবং শেখ ফরিদের পীর বাবা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি এবং বাবা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির পীর খাজা গরিব নেওয়াজ এবং খাজা গরিব নেওয়াজের পীর খাজা উসমান হারুনি এবং খাজা উসমান হারুনির পীর হাজি শরিফ জিনদানা - এ-রকমভাবে চিশতিয়া সিলসিলার সব ওলিরাই যে লা-মোকামে অবস্থান করেছেন উহা হজরত আমির খসরুর লিখিত কালাম হতে পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশ্য আমার এই কথাগুলোয় শুদ্ধেয় ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দেবার মতো ছিলবিলিয়ে উঠবে এবং যা-তা মন্তব্য করতে সামান্য ইতস্ততও করবে না।

কোরান-এর দুই নম্বর সূরা বাকারার সাতাশি নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ওয়া (এবং) আতাইনা (আমরা দিয়াছি) ইসা (ইসাকে) ইবনা (পুত্র) মারিয়ামা (মরিয়মের) বাইয়ানাতি (উজ্জ্বল প্রমাণসমূহ, সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলি) ওয়া (এবং) আইয়াদনাহ (আমরা তাহাকে সাহায্য করিয়াছি) বিরুহিলকুদুস (রুহল কুদুস)।

প্ট এবং ইসা ইবনে মরিয়মকে আমরা দিয়াছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং রুহল কুদুস দিয়া তাহাকে আমরা সাহায্য করিয়াছি।

এই আয়াতে মরিয়মের পুত্র ইসাকে রুহল কুদুস দিয়া সাহায্য করার কথাটি বলা হয়েছে, সুতরাং ইহার কিছুটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করছি। কারণ, অনেকেই কোনো কিছু চিন্তা-ভাবনা না করেই রুহল কুদুস বলতে জিবরাইল ফেরেশতার নামটি উল্লেখ করে তৃপ্তির হাসি হাসে এবং চোখে-মুখে জ্ঞান গিজগিজ করার দৃশ্যটি ফুটে ওঠে। একবার সামান্য চিন্তাও করে না যে জিবরাইল ফেরেশতাদের কোনো নফস এবং কোনো রুহ - দুইটির একটিও দেওয়া হয় নি। ফেরেশতারা আল্লাহর সেফাতি নুরের তৈরি তথা আল্লাহর গুণবাচক নুরের তৈরি। ফেরেশতারা যদি জাত নুরেরই তৈরি হতো তা হলে সিদ্দরাতুল মুনতাহা এসে জিবরাইল ফেরেশতা থেমে যেতেন না, কারণ সেফাতি নুরের লা-মোকামে প্রবেশ করার বিধানটি রাখা হয় নি। পা বাড়াতেই সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যেতেন। অথচ মহানবি সেই লা-মোকামে আল্লাহর রহমতে প্রবেশ করলেন দুই ধনুকের ব্যবধানে অথবা আরও নিকটে - অর্থাৎ একটি ধনুক একটি অর্ধবৃত্ত, দুইটি ধনুক দুইটি অর্ধবৃত্ত। দুইটি অর্ধবৃত্ত সমান-সমান একটি পূর্ণ বৃত্ত। সুতরাং, দুইটি অর্ধবৃত্ত দ্বারা যদি একটি বৃত্ত হবার সামান্য ফাঁক-ফোকর থেকে যায় তাই কোরান ফাঁক-ফোকরের অবসান ঘটিয়ে বলছে, 'আওআদনা' - অর্থাৎ, আরও নিকটে। সুতরাং, বৃত্তের প্রকাশিত স্থানটিকে বলা হয় নুরে মুহাম্মদ এবং অপ্রকাশিত স্থানটির নাম হলো আল্লাহ। তাই জগতের বড় বড় ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা বলে থাকেন যে দুজনের চেহারা তো একই, কাকে খোদা বলব? আমার এই ব্যাখ্যাটিতে ওহাবি

ফেরকার অনুসারীরা শরীরে পেট্রোলে আগুন ধরার মতো চিংকারে প্রতিবাদ শুরু করে দেবে; গোজামিলের একবস্তা এইটা-ওইটা-সেইটা বলে মহানবিকে কেবল সাধারণ মানুষই বলবে না, বরং বলবে মহানবি মাটির তৈরি। ওহাবিদের শত দলিল দিয়ে বোঝালেও বুঝতে চাইবে না। কেন? ইহাই ওহাবিদের তকদির। টোড়া সাপের সামনে অনেক বীণ বাজালেও টোড়া সাপ ফণা তুলতে জানে না। টোড়া সাপের মোটেই কোনো দোষ নাই। কেন নাই? কারণ টোড়া সাপকে আল্লাহ জন্মের আগেই কপালে ফণা তুলার বিধানটি লিখে দেন নি। ফণা নাই, সুতরাং ফণা তুলবে কী করে? ওহাবিদের বুঝবার ক্ষমতাটি দেওয়া হয় নি, সুতরাং বুঝবে কী করে? সুতরাং চরম পর্যায়ে ওহাবিদের গালি দিতে নাই। আল্লাহর হাতে ওহাবিদেরকে সোপর্দ করাই শ্রেয় বলে জগতের ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা বলে গেছেন। তা ছাড়া ওহাবিরা আছে বলেই তো এত ফেরকার বৈচিত্র্য আমরা এক ইসলামের ভেতর দেখতে পাই। যে-ফেরেশতাদেরকে নফসও দেওয়া হয় নি এবং রুহও দেওয়া হয় নি সেই ফেরেশতা কী করে রুহল কুদ্দুস হয় ইহা ভাবতেও কষ্ট হয় এবং অবাক হই। জিন এবং মানুষ ছাড়া, আমাদের জানা মতে, আল্লাহর সমগ্র সৃষ্ট জীবদেরকে কেবলমাত্র নফসটি দেওয়া হয়েছে তথা প্রাণটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জিন এবং ইনসানকেই নফসের সঙ্গে তথা প্রাণের সঙ্গে রুহকে তথা আল্লাহর হুকুমকে দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, বড়-বড় প্রাণীরা পাক করে যেতে জানে না। মানুষের নফসের সঙ্গে যেহেতু রুহের অবস্থানটি আছে তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। ফেরেশতার কখনোই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব নয়। ফেরেশতার যতই শক্তিশালী হোক না কেন এবং যত বড়ই ক্ষমতা থাক না কেন, ভালো-মন্দ করার কোনো এখতিয়ার নাই। স্বাধীনতা থাকলেই ভালো-মন্দ করার প্রশ্নটি আসে। যেহেতু নফস এবং রুহ একটিও নাই সেই হেতু স্বাধীনতাও নাই। এক কথায় ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ জাল্লাশানাহর আদেশ-নিষেধ পালন করার রোবট বলা যায়। এই রোবটদের নিয়ে যখন আদম সন্তানেরা মাথায় তুলে নিয়ে ধেইধেই করে নাচতে থাকে এবং হিয়াহুয়া বলে জাহির করতে থাকে তখন এতিমের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি আর ভাবি, এদের মাথায় কত জ্ঞান গিজগিজ করে। সুতরাং, হজরত ইসা (আ.)-কে রুহল কুদ্দুস দিয়ে সাহায্য করার কথাটি বুঝতে না পেরে জিবরাইল ফেরেশতাকে টেনে এনে সাহায্য করার দৃশ্যটি দেখতে পাই।

কাম্মেল সাধকদের খান্নাসমুজ পবিত্র নফসের উপর রুহ যখন জাগ্রত রূপটি ধারণ করে তখন তাদের কথাবার্তা, তাদের আদেশ-উপদেশ এবং তাদের বাণীগুলো সাধারণ মানুষের নিকট কেবল অপছন্দই হয় না, বরং বোঝা এবং ঝামেলা বলে মনে হয়। কারণ, সাধারণ মানুষ নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসের পুজারি এবং মোহ-মায়ার ফাদে বাস করে। এ-জন্যই সাধারণ মানুষ নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা খান্নাসটির তাকাকুরি তথা দেমাকি ভাবটি সব সময় রক্ষা করে চলে। এবং তারই ফলে এই জাতীয় রুহ-জাগ্রত-হওয়া-সাধকদের আদেশ-নিষেধটি বর্জন করতে ভালোবাসে। তাই আমরা দেখতে পাই, এই সাধারণ মানুষেরাই রুহ-জাগ্রত-হওয়া-সাধকদের অনেককেই মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়, আবার কাহাকেও হত্যা করতেও কুঠা বোধ করে না। ইহার প্রধান কারণটি হলো, খান্নাসের পুজারিদের নিকট রুহ-জাগ্রত-হওয়া-সাধকদের আদেশ-নিষেধ এবং বাণীগুলো অচল বলে মনে হয় এবং সেই বাণীগুলো সাধারণ মানুষের নিকট নিতান্ত অপ্রীতিকর বলে মনে হয়।

কোরান-এর আটান্ন নম্বর সূরা আল মুজাদালার বাইশ নম্বর আয়াতের অংশ বিশেষে বলা হয়েছে :

উলাইকা (উহারাই তাহারা) কাতাবা (লিখিয়া দিয়াছেন) ফি (মধ্যে) কলবিহিমুল্ (তাহাদের কলবে) ইমানা (ইমান) ওয়া (এবং) আইয়াদা (শক্তিশালী করা) হম্ (তাহাদের) বিরুহিম (রুহের দ্বারা) মিনহ (তাহার পক্ষ হইতে)।

পর্ট উহারাই তাহারা, লিখিয়া দিয়াছেন তাহাদের কলবের মধ্যে ইমান এবং শক্তিশালী করিয়াছেন তাহাদের রুহের দ্বারা তাহার পক্ষ হইতে।

‘উহারাই তাহারা’ বলতে তাহাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী। এমন কোনো কণ্ডম পাওয়া যাবে না যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। তারপর আরও বলা হয়েছে যে তারা তাদের পিতা-পুত্র-ভাই অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজনও যদি হয়। কারণ, এই জাতীয় কণ্ডমের মানুষগুলোর কলবে আল্লাহ ইমান লিখে দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে তাদেরকে রুহ-এর দ্বারা আল্লাহ শক্তিশালী করেছেন। অনেকে এই রুহ-এর প্রতিশব্দটি ‘অদৃশ্য শক্তি’ বুঝাতে চেয়েছেন। আবার অনেকে রুহ-এর প্রতিশব্দটি ‘দৃশ্যশক্তি’ বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে রুহ-কে রুহ-এর সঠিক অবস্থান হতে সরে গিয়ে রুহ-এর প্রতিশব্দটি যে কত রকম করা হয় তা সরল পাঠকদের ধরবার আর কোনো উপায় থাকে না। অনেকে তো রুহ-এর প্রতিশব্দ হিসাবে চোখ বুজে লিখে ফেলে জিবরাইল নামক ফেরেশতাটির নাম। আবার অনেকে রুহ-এর প্রতিশব্দটি ‘ওহি’ বলেও চালিয়ে দেন। আপনি যদি প্রশ্ন করেন তাহলে আপনাকে একবোঝা লুলা-টুঙা-মার্কী তথা খাপছাড়া কতগুলো কথা শুনিতে দেবে। প্রকৃত সত্যটি হয়তো এভাবেই ঢেকে যেতে থাকে, অথচ মনে করে যে কত বড় সওয়াবের কাজটি করলাম। একজন মানুষ তখনই জ্ঞান্নাতে প্রবেশ করতে পারে যখন সেই মানুষটির অন্তরে এক ফোঁটাও খান্নাসের গন্ধ থাকে না। তাই একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, যার অন্তরে তথা কলবে এক সরিষা পরিমাণ অহঙ্কারটি থাকবে সে কখনই জ্ঞান্নাতে প্রবেশ করবে না। খান্নাসমুক্ত একজন মানুষকেই আল্লাহর দৃষ্টিতে অতি উচ্চ মর্যাদাশালী একজন মোমিন বলে গণ্য করা হয়। কারণ একটি খান্নাসমুক্ত পবিত্র নফসের উপরেই রুহ তার আপন পরিচয় নিয়ে পূর্ণ আকৃতিতে প্রকাশ পায়। ইহাই আল্লাহর রহস্যময় প্রকাশের উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর। আসলে আল্লাহ যাকে যতটুকু জ্ঞানের উচ্চতা দান করেছেন সে তো ততটুকুই জানবে এবং লিখতে পারবে। এর বেশি আশা করাটাও ঠিক নয়।

কোরান-এর ষোল নম্বর সূরা আননাহল-এর একশত দুই নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

কুল (বলুন) নাজ্জালাহ (তিনিই নাজেল করেন) রুহলকুদ্দুস (রুহল কুদ্দুস) মির (হইতে) রাব্বিকা (তোমার রব) বিল্ হাককি (সত্যসহ) লিইউসাব্বিতাল্ (প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য) আললাজিনা (যাহারা) আমানু (ইমান আনিয়াছে) ওয়া (এবং) হদাও (হেদায়েত) ওয়া (এবং) বুশরা (সুসংবাদ) লিল্ (জন্য) মুসলিমিনা (মুসলমান [আত্মসমর্পণকারী]দের)।

পর্ট তিনিই নাজেল করেন রুহল কুদ্দুস তোমার রব হইতে সত্যসহ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং হেদায়েত এবং সুসংবাদ মুসলমানদের [আত্মসমর্পণকারীদের] জন্য।

এই আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে :

রুহুল কুদ্দুস তিনিই নাজেল করেন তোমার রব হইতে। খেয়াল করুন, এখানে ‘মিররীবিকুম’ তথা তোমাদের রব হইতে বলা হয় নি, বরং নিছক তোমার রব হইতে রুহুল কুদ্দুস নাজেল করা হয়। তারপরেই বলা হয়েছে : সত্যসহ এবং তারপরে বলা হয়েছে : প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইহা কাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য নাজেল করা হয়? উত্তরটি হলো, যারা ইমান এনেছে এবং হেদায়েত পেয়েছে এবং যারা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) তাদের জন্য এই বিষয়টি একটি বিরাট সুসংবাদ। এই রুহুল কুদ্দুস যারা মুসলমান এবং ইমান ও হেদায়েত লাভ করেছেন তাদের জন্য বিরাট একটি সুসংবাদ। তা হলে রুহুল কুদ্দুস নাজেল করাটি অতীতকালের মধ্যে ধরে রাখা যায় না, বরং সর্বকালে সর্বযুগে যারা বিশ্বাসী এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত আত্মসমর্পণকারী, তাদের জন্য রুহুল কুদ্দুস পরিপূর্ণরূপ ধারণ করে পরিচালিত করেন। আফসোস! এই রুহুল কুদ্দুস তথা পবিত্র রুহ অথবা শক্তিশালী রুহ বলতে নফস ও রুহবিহীন জিবরাইল নামক ফেরেশতাকে দাঁড় করিয়ে সার্বজনীনতার এবং সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য বিষয়টিকে একটি নির্দিষ্ট কালের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না যে রুহুল কুদ্দুস বলতে কেমন করে জিবরাইল ফেরেশতা অনুবাদ করে বিভ্রান্ত করে। মহানবি হেরা গুহায় ধ্যানসাধনার মাধ্যমে যে নিজের নফসের উপর রুহটি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয় উহাই বুঝিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু যারা হেরা গুহার ধ্যানসাধনার বিষয়টি সযতনে এড়িয়ে যায় তাদের পক্ষে রুহুল কুদ্দুসের পরিচয় জানাটি অসম্ভব এবং বিষয়টি নিছক শাস্তিক ও মোখিক বিষয়ে পরিণত হয়। সাধারণত আমরা দেখতে পাই যে তৌহিদের মূল বিষয়টি শিক্ষা দিতে হলে নিজে আগে কেমন করে লাভ করা যায় সেই প্রয়োগ-পদ্ধতিটি দেখিয়ে দিয়ে যান। হেরা গুহার নির্জনে একাকী সময়-অসময়ে পনেরটি বছর ধ্যানসাধনার মাধ্যমে নিজের জীবনের উপর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়ে গেলেন যে, এই হেরা গুহায় নির্জন সাধনার মতো ধ্যানসাধনা ছাড়া রুহুল কুদ্দুসের পরিচয়টি পাওয়া অসম্ভব। কারণ, মহানবি তখনও নবি যখন প্রথম মহানমানব হজরত আদম (আ.) মাটি ও পানিতে ভাসমান। সুতরাং, এই হেরা গুহার ধ্যানসাধনাটি নিছক মহানবির অনুসারীদের জন্য একটি জুলন্ত শিক্ষণীয় বিষয় এবং দেদীপ্যমান সার্বজনীনতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সে জন্যই পরিশেষে বিরাট একটি দুঃখ নিয়ে এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাদের বলতে হচ্ছে যে, কোথায় রুহুল কুদ্দুস আর কোথায় যার নফসও নাই রুহও নাই এমন একজন ফেরেশতা যার নাম জিবরাইল! মিথ্যার চাদরে ঢাকতে-ঢাকতে সত্য সম্পূর্ণরূপে ঢেকে যায়। তেমনি আজ মানব-সমাজের বুকে সত্য উদ্ধারের প্রচেষ্টায় পদে-পদে হোঁচট খেতে হয় যখন দেখতে পাই উলঙ্গ একটি সত্যকে তথা রুহুল কুদ্দুসকে কেমন করে মিথ্যার কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

পরিশেষে বলতে চাই যে, রুহ-এর পরিপূর্ণরূপটি যখন সাধক তথা মোমিন-এর (আমানু নহে) আপন নফসের উপর আলোকিত হয় উহাকেই নূরে মুহাম্মদি বলা হয় এবং এই নূরে মুহাম্মদি-কে আপন নফসের উপর উদ্ভাসিত করবার সাধনাটি ইসলামের মূল কথা। এ-জন্য ইসলামকে আলো তথা নূর বলা হয়। যেমন ‘আল ইসলামুন নূরুন’ – অর্থাৎ, ইসলামই একমাত্র নূর তথা আলো। এই নূর সার্বজনীন। যে-কোনো সাধক ধ্যানসাধনার একাগ্রতায় এবং আল্লাহর বিশেষ রহমত লাভ করার পরেই তা অর্জন করতে পারবে। আবার ইসলামকে শাস্তিও বলা হয়, বলা হয় ইসলাম আত্মসমর্পণ করার ধর্ম, কিন্তু ইসলাম যে একমাত্র নূর ইহা মোখিকভাবে জানা থাকলেও সাধকেরাই বুঝতে পারেন।

কোরান-এর বিয়াল্লিশ নম্বর সূরা আশ্ শুরা-র বায়ান্ন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ওয়া (এবং) কাজালিকা (ওইভাবে) আওহাইনা (ওহি পাঠাইয়াছি আমরা) ইলাইকা (আপনার দিকে) রুহাম্ (রুহ) মিন্ (হইতে) আম্মরিনা (আমাদের হকুম্/আদেশে/আজ্ঞায়/অনুমতিতে/নির্দেশে)।

পট এবং ওইভাবে আমরা ওহি পাঠাইয়াছি আপনার দিকে রুহ আম্মাদের হকুম্ হইতে।

এই আয়াতের ‘রুহ’ শব্দটি ব্যবহার করতে গিয়ে প্রায় তফসিরকারকেরাই ইহার একান্ত গোপন রহস্য বুঝতে না পেরে একেক জনে একেক রকম রুহ-এর প্রতিশব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনেকে তো বিশেষ করে এই আয়াতে ‘রুহাম্’-কে ‘ওহি’ অনুবাদ করে ফেলেছেন। অথচ অনুবাদক একবার ভুলেও চিন্তা করে দেখলেন না যে ‘আওহাইনা’ তথা ‘আমরা ওহি পাঠিয়েছি’ আগেই বলে দেওয়া হয়েছে এবং এই বলে দেবার পরেও রুহাম্ তথা রুহ-এর গোপন রহস্য বুঝতে না পেরে ‘ওহি’ অনুবাদ করেছেন। প্রথমেই তো ‘আমরা ওহি পাঠাইয়াছি’ বলা হলো তারপরে আবার ‘রুহাম্’ শব্দটিকেও কেমন করে এবং কীভাবে ‘ওহি’ অনুবাদ করেন ইহা ভাবতে গেলেও অবাক হই। অনুবাদের চেহারা যদি এত গৌজামিল আর মনগড়া কথা দিয়ে ভরে রাখা হয় তাহলে সহজ-সরল পাঠকেরা কেমন করে সত্যের পরিচয়টি জ্ঞানতে পারবে? আবার অনেক অনুবাদক ‘রুহাম্’-কে ‘ওহি’ লিখতে খুবই শরম পেয়ে ‘রুহাম্’-এর অনুবাদ করেছেন ‘কোরআন’। মাশাআল্লাহ! ইনাদের কোরান-এর এহেন অনুবাদের চেহারাটি যদি এমন হয় তা হলে পাঠক কোনটা গ্রহণ করবে ইহাও যে একটি বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়।

মনে শান্তি পাওয়া এক জিনিস আর সত্য উদ্ধারের গবেষণাটি অন্য জিনিস। এক ইসলামের তিন কুড়ি তেরটি সাইনবোর্ড কাঁধের উপর ঝুলছে। প্রশ্ন আসতে পারে, এই তিন কুড়ি তেরটি সাইনবোর্ডের মধ্যে কোন সাইনবোর্ডটি সাদ্কা? সাদ্কা সাইনবোর্ডটি উদ্ধার করতে গিয়ে সরল-সহজ পাঠকদের অবস্থাটি কি লেজে-গোবরে পরিণত হচ্ছে না? বীজরূপে রুহ প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অবস্থান করছে বলেই আল্লাহ বলেছেন যে, ‘আমরা [আল্লাহ – বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে] জীবন-রণের নিকটেই অবস্থান করছি।’ এখানে ‘ইলা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তথা ‘দিকে’ বলা হয়েছে, ‘ইনদা’ তথা ‘ভেতরে’ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। শয়তান খান্নাসরূপে নফসের সঙ্গে মিশে থাকে। কিন্তু রুহ জীবন-রণের নিকটে বীজরূপে অবস্থান করে। লক্ষ করুন, এই আয়াতেও ‘ইলাইকা’ তথা আপনার দিকে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অতীব দুঃখ নিয়ে বলতে হচ্ছে যে দশচক্রে ভগবানকেও যে ভূতরূপে আম্মজনতা গ্রহণ করে ফেলে তারই জ্বলন্ত নমুনাগুলো একটি একটি করে পেশ করছি। অনেকের আঁতে ঘা লাগতে পারে, আবার অনেকের ইশ আসতে পারে। আঁতে ঘা লাগাটাও তকদির এবং ইশ আসাটাও তকদির।

মানুষ যখন নির্জনে মহানবির হেরা গুহার মতো স্থানে একাকী ধ্যানসাধনায় মগ্ন হয়ে নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার জেহাদে রত থাকে তখনই সেই নফসটিকে বলা হয় নফসে লাউয়াম্মা তথা সংগ্রামরত নফস তথা যুদ্ধরত নফস তথা জেহাদে রত থাকা নফস। এই জেহাদ বাহিরের অস্ত্র হাতে নিয়ে জেহাদ করা নয়, বরং ধ্যানসাধনায় ডুবে থেকে আপন নফস হতে খান্নাসকে তাড়িয়ে দেবার অথবা খান্নাসকে মুসলমানি বানিয়ে ফেলার জেহাদ।

একটি নফস যখন খান্নাস হতে মুক্ত হতে থাকে, মুক্তির কাছাকাছি এসেই কেতাব এবং ইমানের পরিচয়টি পেতে থাকে। নতুন নফসের সঙ্গে খান্নাস পরিপূর্ণরূপে মিশে থাকলে ইমান ও কেতাবের পরিচয়টি চিনতে পারে না। যেহেতু অধম লেখক মুসলমান তাই আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বলতে হচ্ছে যে 'নুরে মুহাম্মদি' আল্লাহরই জাত-নুর। অন্যান্য ধর্মের সাধকেরা 'নুরে মুহাম্মদি'-র স্থলে অন্য যে-কোনো নামটি দিতে পারেন। এই রূহ যখন সাধকের নফসের উপর প্রকাশিত হয় তখন নুররূপেই মূর্তিমান হয়। কালি ও কলমের তৈরি শব্দের বলয়ে রূহ-এর অবস্থানটি থাকে না, কালি ও কলমে কাগজের উপর তৈরি করা বাঘ আর সিংহের ছবিগুলো যেমন বাঘ আর সিংহ নয়, আসল বাঘ আর সিংহ দেখতে হলে চিড়িয়াখানাতে গিয়ে দেখতে হয়, তেমনি নিজের সঙ্গে রূহ-এর পরিচয়টি জানতে চাইলে ওই হেরা গুহার মতো নির্জন সাধনা ছাড়া পাওয়া সম্ভব কি না পাঠকদের হাতেই বিচারের ভারটি তুলে দিলাম।

পরিশেষে একদম খোলামেলা করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, রূহ-এর পরিপূর্ণ রূপটি আল্লাহর রব-রূপী পরিপূর্ণরূপ। আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা-রূপে সবাই (নাস্তিক ছাড়া) মেনে নেয়, কিন্তু আল্লাহকে রব-রূপে মেনে নিতে গেলেই ধ্যানসাধনাটির প্রয়োজনটি অত্যাৱশ্যকীয়। তাই আমরা দেখতে পাই, কোরান-এর প্রথম হতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র রাব্বুল আলামিনের 'জিকির' শব্দটি দেখতে পাই। মানুষের মাঝে রব-রূপে প্রকাশিত হওয়ার পরিপূর্ণ রূপটি হলো রূহ। সুতরাং, রূহ-এর এই ভেদরহস্য সম্পর্কে ধ্যানসাধনা বিহিনে কিছু একটা বলতে গেলে অনুমানের ঢিলটি ছুঁতে হয় এবং যারা এই অনুমানের ঢিল ছোঁড়ে তাদেরই বা কী দোষ দিতে যাব? এ যে মহান রাব্বুল আলামিনের লীলাখেলা। তাই দর্শনেই মুক্তি, অজ্ঞতার অন্ধকারে বন্ধন। এই মুক্তি ও বন্ধনের লীলাখেলাটি যদি খেমে যায় তা হলে দুনিয়া অচল, নিষ্ক্রিয় এবং অথর্ব।

কোরান-এর মোল নব্বুর সুরা আন নহলের দুই নব্বুর আয়াতে বলা হয়েছে :

ইউনাজ্জিলুল (নাঙ্গেল করেন) মালাইকাটা (ফেরেশতাদেরকে) বিররুহি (রূহের সহিত) মিন (হইতে) আমরিহি (তাঁহার হুকুমে) আলা (উপর) মাই (যাহাকে) ইয়াশাউ (ইচ্ছা করেন) মিন (হইতে) ইবাদিহি (তাঁহার বান্দাদের) আন (যে, এই যে, হইতে) আনজিরু (তোমরা সাবধান করিয়া দাও) আনুনাহ (অবশ্যই ইহা) লা (নাই) ইলাহা (ইলাহ, অধিকারী) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) আনা (আমি) ফাততাকুনি (সুতরাং আমার তাকওয়া করো)।

ঈ নাঙ্গেল করেন ফেরেশতাদেরকে রূহের সহিত তাঁহার হুকুম হইতে যাহার উপর ইচ্ছা করেন তাঁহার বান্দাদের হইতে যে তোমরা সাবধান করিয়া দাও অবশ্যই ইহা নাই ইলাহ একমাত্র আমি, সুতরাং আমার তাকওয়া করো।

এই আয়াতে ফেরেশতাদেরকে নাঙ্গেল করার কথাটি বলা হয়েছে এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে রূহকেও নাঙ্গেল করার কথাটি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, রূহের সহিত - অর্থাৎ, ফেরেশতারা এবং রূহ বিষয়টি যে মোটেই এক ও অভিন্ন নয়, বরং দুটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা এবং ভিন্ন এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে তা বলে দেওয়া হয়েছে। তা হলে জিবরাইল নামক ফেরেশতাকে কেমন করে রূহ বলে চালিয়ে দেওয়া যায়? কারণ, আমরা প্রত্যেকেই জানি যে জিবরাইল যত শক্তিরই অধিকারী হন না কেন তিনি নিছক একজন ফেরেশতা বৈ আর কিছু নন। আমরা আজরাইল, মিকাইল এবং ইসরাফিলকেও ফেরেশতা বলেই জানি এবং এই চারজনই ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। এই চারজন ফেরেশতাদের বাহিরের কেহ নন। তা হলে রূহ বলতে কেমন করে জিবরাইল নামক ফেরেশতাটিকে অনুবাদ করা হয়? কোথায় জিবরাইল ফেরেশতা আর

কোথায় রুহ! অনুবাদক এবং তফসিরকারক এই জটিল এবং সূক্ষ্ম বিষয়টি বুঝতে না পেরে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে এবং অনুবাদ ও ব্যাখ্যাটি লেজে-গোবরের অবস্থায় পরিণত হবার গোজামিলের রূপগুলো চোখের সামনে পরিষ্কার ধরা পড়তে থাকে। তখনই মহানবির নামে সনদের দোহাই দিয়ে উম্মাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে সংগ্রহ করা কথাকে হাদিস নামে চালিয়ে দিতে থাকে। (আল্লাহ সা'দ উল্লাহ সাহেবের রচিত হাদিস সংগ্রহের ইতিহাস-টি পড়লেই অনেক কিছু ভালো-মন্দ বিষয়গুলো পরিষ্কার বুঝতে পারবেন)। প্রশ্ন আসে, আসলেই কি এগুলো মহানবির কথা তথা হাদিস, নাকি মহানবির নামে চালিয়ে দেবার অপকৌশল মাত্র? ফেরেশতাদের সঙ্গে রুহ নাজেল করার কথাটি না বলে জিবরাইলের কথাটি তো আল্লাহ বলতে পারতেন। তা হলে রুহ অর্থে কেমন করে জিবরাইল নামক ফেরেশতাটিকে দাঁড় করানো হয়? তা হলে কি এই কথাটুকু বলা যায় না যে, সবজাতির ভূমিকা পালন না করে সোজা বলে দিলেই হলো যে, আমি ইহার অর্থটি বুঝলাম না তথা আল্লাহর কালামের এই আয়াতের মর্ম আমাদের বোধগম্য নহে? কেহ যদি মুখ ফসকে বলে ফেলেন যে, আপনারা জেনে শুনে অথবা না-জেনে ভুলও করছেন এবং ভণ্ডামিও করছেন? – যদিও আপনাদের এই ভুল, এই ভণ্ডামি এতই সূক্ষ্ম বিষয় যে সবার চোখে ধরা পড়ার কথা নয়।

নাই কোনো ইলাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, সুতরাং তাকওয়া করো অথবা ভয় করো – বিষয়টি এখানে এবং এই ক্ষুদ্র 'নফস ও রুহের পার্থক্য' নামক প্রবন্ধে তুলে ধরা হতে ইচ্ছা করেই বিরত রইলাম।

হজরত ইসা নবিকে যে-রুহ দেওয়া হয়েছে উহা বীজরূপী রুহ নহে, বরং পরিপূর্ণ রুহ। তাই তিনি দোলনায় দুলেও কথা বলেছেন এবং পিতা ছাড়া যে জন্মগ্রহণ করেছেন ইহা নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যটি একেক নবির মধ্যে একেক রকমভাবে আল্লাহ তুলে ধরেছেন। যেমন, হজরত সোলায়মান (আ.)-কে রহমতের বাতাস নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাটি দান করেছেন। হজরত মুসা (আ.)-এর লাঠিটি সর্পে পরিণত হবার বৈশিষ্ট্যটি দান করা হয়েছে। এভাবে প্রত্যেক নবির বেলাতেই ভিন্ন-ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের রূপগুলো আমরা দেখতে পাই। সুতরাং বৈশিষ্ট্য আর মর্যাদা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয় বলেই মনে করতে চাই।

কোরান-এর ছাব্বিশ নম্বর সূরা শুয়ারা-র একশত বিরানব্বই হতে একশত চুরানব্বই নম্বর পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে :

+ ওয়া (এবং) ইননাহ (নিশ্চয়ই ইহা) লাতানজিলু (অবশ্যই নাজেল করা) রাব্বিল (রব) আলামিন (জগৎসমূহের)।

প্ট এবং নিশ্চয়ই ইহা অবশ্যই নাজেল করিয়াছেন জগৎসমূহের রব।

+ নাজালা (নাজেল করিয়াছেন) বিহি (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা) রুহল (রুহ) আমিন (বিশ্বস্ত)।

প্ট নাজেল করিয়াছেন ইহার সঙ্গে বিশ্বস্ত রুহ।

+ আলা (উপর) কাল্বিকা (আপনার কলবের) লিতাকুনা (যেন আপনি হন) মিনাল (হইতে) মুন্জিরিন (সাবধানকারীদের)।

প্ট আপনার কলবের উপর যেন আপনি হন সাবধানকারীদের হইতে।

এই আয়াত তিনটির দর্শন তথা ভাবধারাটি খুবই গভীর এবং রহস্যময়। ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আপনার সাথে সূক্ষ্ম বীজরূপে তথা রুহরূপে যে আল্লাহ অবস্থান করেন তাঁকে রবরূপে তথা প্রতিপালকরূপে দর্শন লাভ করতে পারলেই পবিত্র নফসের মধ্যে যে খান্নাসরূপী আবরণটি থাকে, সেই আবরণের পর্দা ছিন্ন

করে আল্লাহ্ রাসুল আলামিনরূপে তথা জগৎসমূহের রবরূপে প্রকাশিত হন এবং তখনই ইহাকে বলা হয় নিরাপত্তা দানকারী রুহ নাজেল করা। এ জাতীয় সাধকেরাই মহাপুরুষ তথা জগৎপুরু এবং এরাই সত্যের প্রত্যক্ষদর্শী হন এবং সেই কারণেই আম্বজুনতার নিকট সাবধানকারী বলে পরিচিতি লাভ করেন। ইহা কোনো বৈষয়িক বিষয়ের উল্টাপাল্টা সাংঘর্ষিক দর্শন নয়, কারণ বৈষয়িক দর্শন যতই মজবুত হোক না কেন, একটি ব্যক্তি-জীবনের সামনে খুব বেশি হলে আশি-নব্বই বছর মোহ বিস্তারের নকল সত্য বলে মনে হয়, তারপর সব শেষ। যে-সকল সাধকেরা আল্লাহকে রবরূপে পাবার ধ্যানসাধনায় বিরাট ধৈর্যধারণ করেন, সেই সাধকদের উপর রাসুল আলামিন তথা আপন রব যখন প্রকাশিত হন তখনই তিনি দর্শন দান করেন বিশ্বরবরূপে। সাধকের পবিত্র নফস হতে যখন খান্নাসরূপী শয়তানের পর্দাগুলি তথা আবরণগুলি একে-একে ছিন্ন করে ফেলা হয় তখনই রবরূপে জগৎময় তিনিই মূর্তিমান তথা প্রতিভাত হয়ে ওঠেন সাধকের অন্তরে তথা নফসে। আসলে উলঙ্গ সত্য কথাটি বলতে গেলে বলতে হয় যে রুহল আমিন হলেন মহানবির আপন আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি। ইহা জগৎময় ব্যক্তগু হতে পারে আবার যে-কোনোরূপ মূর্তি ধারণ করতেও পারে। ইহা স্থান- কালের (টাইম অ্যান্ড স্পেস) সব রকম মানুষের আদি এবং আসল রূপ। এই রূপের মাঝে প্রত্যাভর্তন করাই মানবজীবনের পরম এবং চরম সার্থকতা। আল্লাহর নিকট মানুষের প্রত্যাভর্তন করার তথা ফিরে আসার অর্থটিও ইহাই।

রুহ নাজেল করা অর্থে যদি জীবনীশক্তি দান করা অথবা প্রাণের সঞ্চার করা অর্থে তফসির করা হয় তা হলে জীবনীশক্তি দান অথবা প্রাণসঞ্চার কেবলমাত্র মানুষ কেন তিনি তো সকল জীবকেই দান করে থাকেন। ইহা ছাড়া “মোলাকাৎ দিবস সম্বন্ধে জনগণকে সাবধান করবার জন্যেই রুহ দান করেন।” এখানে প্রাণ অর্থে রুহ শব্দটিকে গ্রহণ করলে কথা ও ভাবের দর্শনের মিলটি তো খুঁজে পাওয়া যায়ই না, বরং সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়।

পরিশেষে, ওই একই কথা বারবার বলতে হচ্ছে যে, জিবরাইল যদি ফেরেশতা হয়ে থাকে এবং জিবরাইল তো সত্যিই একজন ফেরেশতা – আমরা দেখতে পাই যে-কোনো ফেরেশতাকেই নফস এবং রুহ দেওয়া হয় নাই। তা হলে জিবরাইল নামক ফেরেশতাটিকে রুহের স্থলে কেমন করে দাঁড় করানো যায় উহা আমাদের জ্ঞানা নেই।

কোরান-এর বত্রিশ নম্বর সূরা সাজদা-র নয় নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

সুম্মা (তারপর) সাওয়াহ (তাহাকে সুন্দর চেহারাযুক্ত করিয়াছেন, তাহাকে অঙ্গসৌষ্ঠব-বিশিষ্ট করিয়াছেন, তাহাকে সুগঠিত করিয়াছেন, তাহাকে সুঠাম করিয়াছেন, তাহাকে সুমমভাবে তৈরি করিয়াছেন, তাহাকে সুসংবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন) ওয়া (এবং) নাফাখা (ফুৎকার করিয়াছেন, ফুকিয়া দিয়াছেন) ফিহি (উহার মধ্যে, তাহার মধ্যে) মির (হইতে) রুহিহি (তাহার [আল্লাহর] রুহ) ওয়া (এবং) জাআলা (দিয়াছেন) লাকুমুস (তোমাদের জন্য) সাম্মা (শ্রবণ শক্তি, শ্রুতিবার শক্তি) ওয়া (এবং) আব্সারা (দর্শন শক্তি, দেখিবার শক্তি) ওয়া (এবং) আফ্যিদাতা (অন্তঃকরণ, হৃদয়, মন, অনুভূতি, অন্তর) কালিলাম (কম, অল্প, সামান্য) মা (যাহা) তাশকুরুন (তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তোমরা উপকারীর উপকার স্বীকার করো)।

পাঁচ তারপর তাহাকে সুঠাম করিয়াছেন এবং ফুৎকার করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাহার [আল্লাহর] রুহ হইতে এবং দিয়াছেন তোমাদের জন্য শ্রবণ শক্তি এবং দর্শন শক্তি এবং অন্তঃকরণ। যাহা কমই তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে গিয়ে মনে হবে রুহকে নফসরূপে তথা প্রাণরূপে গ্রহণ করতে গিয়ে বিরাট ভুল করা হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে 'আল্লাহর নফস হইতে' বলা হয় নাই, বরং বলা হয়েছে 'ফিহি মিন রুহিহি' তথা তাহার মধ্যে তাহার তথা আল্লাহর রুহ হইতে। এই একটি মাত্র আয়াতে রুহকে প্রাণরূপে গ্রহণ করবার সম্ভব বিপদ থেকে যায়, কিন্তু প্রাণ বলতে নফসকে বোঝানো হয়, কিন্তু এখানে নফস না বলে 'আল্লাহর রুহ হতে' বলা হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহর নফস তথা প্রাণ থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না, কারণ নফস তথা প্রাণকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয় তথা একটিবার মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয় তথা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। অথচ রুহকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি কোরান-এ একটিবারও বলা হয় নি, তবে এই আয়াত দ্বারা এই কথাটুকু পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাঁর রুহকে বীজরূপে দান করেছেন। তা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ রুহরূপে গ্রহণ করে নিতে গেলে সব মানুষই পরিপূর্ণ রুহপ্রাপ্ত হয়েছে বলতে হয়, কিন্তু ইহা একেবারেই অসম্ভব। রুহকে নুরে মুহাম্মদির মূর্তিমান রূপও বলা যেতে পারে, কারণ রুহ-এর পরিপূর্ণ বিকাশটি নুরে মুহাম্মদির মধ্যেই পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। রুহ ফুৎকার অর্থে প্রাণ ফুৎকারের কথাটি আসতেই পারে না। শ্রবণ, দর্শন ও অন্তঃকরণ শব্দগুলোর দ্বারা বাহ্যইন্দ্রিয়ের অনুভূতিটি বোঝায়। আল্লাহকে রবরূপে গ্রহণ করে ধ্যানসাধনা করে নফসের সঙ্গে খান্নাসের আবরণরূপী আমিত্বের পর্দাটি সরিয়ে দিতে পারলেই রবকে জাগ্রত করে তোলা যায় এবং তখনই নফসের উপর রুহের আলোকিত রূপটি প্রকাশিত হয় এবং ইহাকেই নুরে মুহাম্মদি বলা হয় এবং অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে যে, নুরে মুহাম্মদির মোড়কে (সিল) নফসকে আবৃত ও সুরক্ষিত করে নেন। তা ছাড়া রুহ নিক্ষেপ করবার কথাটি কেমন করে কোরান-এ বলা হয়েছে? বাহির হতে কোনো কিছু আসলে উহাকে নিক্ষেপ বলা যেতে পারে। আল্লাহ তো প্রতিটি মানুষের মাঝে রবরূপে বিরাজ করেন, কিন্তু মানুষ তার নিজের রবের পরিচয় পায় না ততক্ষণ, যতক্ষণ তিনি বিকশিত হয়ে আপন পরিচয় দান না করেন। রুহের বীজ প্রতিটি মানুষের মধ্যে সুপ্ত আছে, কিন্তু উহা মানুষের জানা নাই। উহা কেবল সন্ধান করলেই পাওয়া যায় না, সন্ধানকারীর প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত হলেই সন্ধান মেলে। যদিও রুহ মানুষের ভেতরেই বীজরূপে অবস্থান করার পর নিক্ষেপ করা অথবা নাজেল করা কথাটি কোরান-এ প্রকাশ করা হয়েছে, এই নিক্ষেপ করা অথবা নাজেল করার কথাটির দ্বারা পরিপূর্ণ রুহের বিকশিত রূপটিরই পরিচয় পাওয়া যায়। রুহকে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত করে যখন রুহের দ্বারা নফসকে চালনা করা হয় সেই অবস্থাতিকেই রুহ নিক্ষেপ করা বলা হয়েছে। নফসের খান্নাস-রূপী কর্তৃত্বের আমিত্বটি যখন ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ রহমতে সরে পড়ে তখনই নফসের উপর রুহের নিক্ষেপ করা অথবা নাজেল হওয়া কথাটি বলা হয়ে থাকে। তা ছাড়া রুহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে শুধু এটুকুই বলেছিলেন 'কুলুর রুহ মিন আমরি রাবি' - তথা রুহ আমার রবেরই আদেশ হতে আগত। এ জন্য রুহকে সৃষ্টি চিনতে পারে না। সৃষ্ট বুদ্ধি রুহকে ধারণা করতে পারে না বলেই জটিলতার পাকে পড়ে যায়। সুতরাং রুহ রহস্যময় এবং এই রহস্যময় বিষয়টিকে কথায় অথবা ভাষায় বোঝানো যায় না।

কোরান-এর সতের নম্বর সূরা বনি ইসরাইল-এর পঁচাশি নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ওয়া (এবং, আর, ও) ইয়াসআলু (তাহারা প্রশ্ন করে, তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তাহারা জানিতে চায়, তাহারা শুধায়) নাকা (আপনাকে, তোমাকে, তোকে)

আনি (সম্পর্কে, সম্বন্ধে, বিষয়ে) রুহি (রুহ [ইহার ইংরেজি অথবা বাংলা অথবা অন্য কোনো ভাষায় প্রতিশব্দটি নাই]।

প্ট এবং আপনাকে রুহ সম্পর্কে তাহারা প্রশ্ন করে।

+ কুল (বলুন) রুহ (রুহ, ইহার কোনো প্রতিশব্দ নাই) মিন্ (হইতে, থেকে, চেয়ে) আম্মরি (নির্দেশ, আদেশ, হকুম) রাব্বি (আম্মার রবের, আম্মার প্রতিপালকের, আম্মার সদাপ্রভুর - যে প্রভু আম্মার সঙ্গে সব সময় অবস্থান করেন উহাকেই একবচনে সদাপ্রভু বলা হয় [একটু খেয়াল করুন, এখানে 'রাব্বি' তথা 'আম্মার রব' বলা হয়েছে, কিন্তু 'রাব্বানা' তথা 'আম্মাদের রব' বলা হয় নাই অথবা 'রাব্বুকুম' বা 'তোম্মাদের রব' তথা তোম্মাদের প্রতিপালকও বলা হয় নাই অথবা 'রাব্বুকা' অর্থাৎ 'তোম্মার রব' তথা তোম্মার প্রতিপালকও বলা হয় নাই। কারণ, রাব্বি, রাব্বানা, রাব্বুকা, রাব্বুকুম - এই কথাগুলোর মাঝে গোপন রহস্যটি লুকিয়ে আছে, যাহা সহজে ধরা যায় না] ওয়া (এবং, আর, ও) মা (না) উত্তিউম্ (তোম্মাদেরকে দেওয়া হইয়াছে, তোম্মাদেরকে দান করা হইয়াছে, তোম্মাদেরকে আতা করা হইয়াছে) মিনাল্ (হইতে, থেকে, চেয়ে) ইল্মি (জ্ঞান, শিক্ষা, বিদ্যা, পরিচিতি, তথ্য) ইল্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত) কালিলান্ (সামান্য, অল্প, অতিঅল্প, কম, একটু, কিছুটা, ঈষৎ, কিঞ্চিৎ)।

প্ট বলুন, রুহ আম্মার রবের আদেশ হইতে এবং তোম্মাদের দান করা হইয়াছে জ্ঞান হইতে সামান্য ব্যতীত নয়।

মহানবিকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে মহানবি বললেন যে, রুহ হলো আম্মার রবের হকুম তথা আদেশ। জ্ঞান ব্যতীত মানুষ সত্যের অতি সামান্যই বুঝতে পারে। আবার, এই কথাটিও বলে দেওয়া হলো যে, বিশেষ করে রুহের বিষয়টির জ্ঞান দান করা হয়েছে অতি সামান্য। অতি সামান্য তথা অতি অল্প জ্ঞান দেবার কথাটি রুহ-বিষয়ে কেন বলা হলো? কারণ, রুহ অতীব সূক্ষ্মরূপে - যাকে আমরা বীজরূপে অবস্থানের কথাটি বলে থাকি, সেই বিষয়টির পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকারাই স্বাভাবিক, সুতরাং আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একে তো রুহ-বিষয়ে অতি অল্প জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তার উপর খান্নাসের অনেক ধরনের প্রতারণার জাল পাতা থাকে। সুতরাং, খান্নাসের প্রতারণার জালগুলো যখন সাধকেরা হেরা গুহার মতো নির্জনে একাকী বছরের পর বছর ধ্যানসাধনা করে সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়ে দিতে পারেন তখনই নফসের উপর রুহ পরিপূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হয় এবং তখনই একজন সাধকের নফসটিকে রূপক ভাষায় চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণের মতো গিলে ফেলে এবং তখনই সাধক কেবলই রুহের অবস্থানটি দেখতে পান এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং তখনই সাধক বিভিন্ন ভাষায় বলে ফেলেন : আনাল্ হক - তথা, আমিই সত্য; আনা সুবহানি মা আজ্জামুশশানি - তথা, আমিই সুবহানি, সব শান আম্মারই; লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহ্ তায়ালা - তথা, এই জোকার ভেতর আল্লাহ্ ছাড়া কিছুই নাই, না দিদাম মোস্তফারা বাল্কে খোদারা - তথা, মোস্তফা-রূপ ধারণ করেই আল্লাহকে দেখলাম; সোহহম্ সোহম্মি - তথা, তিনিই আমি - এভাবে অনেক-অনেক উদাহরণ সুফিদের মধ্যে পেয়ে থাকি। সুতরাং, খান্নাসমুক্ত জ্ঞান ব্যতীত মানুষ সত্যটির সামান্যই বুঝতে পারে এবং এ-জন্যই বলা হয়েছে যে, মানুষকে যে-জ্ঞান দান করা হয়েছে ওটা অতি সামান্য। সুতরাং, রুহ বিষয়ে অনেক রকম কথা দিয়ে অধিক কিছু জ্ঞানতে চাওয়া বৃথা। তাই অনেক ওলি-আল্লাহ বলে

থাকেন যে, রুহের আসল পরিচয়টি জানবার আগ্রহটি যাদের নাই তারা শিক্ষিত বটে, জ্ঞানীও বটে, কিন্তু মানুষ হতে পারে নি।

আল্লাহর প্রত্যেক ওলি, যাদেরকে আমরা মহামানব বলে থাকি তাঁরা রুহুল্লাহ তথা আল্লাহর রুহ। কিন্তু এখানে একটি বিরাট কথা থেকে যায়, আর সেই কথাটি হলো, সাধক যখন নফস হতে খাল্লাসকে মুক্ত করতে পারেন তখনই রুহুল্লাহ হন, তবে যারা মাসুম, মহানবির আওলাদেরা এবং সকল নবিই আজন্ম রুহপ্রাপ্ত, যদিও হজরত ইসা (আ.) তথা যিশুখ্রিস্টকে সাধারণভাবে রুহুল্লাহ বলা হয়ে থাকে এবং যেহেতু কোরান-এ বলা হয়েছে, ‘আমরা ইসা-কে রুহুল কুদ্দুস দ্বারা শক্তিশালী করেছিলাম।’ এই কথাটির দ্বারা অনেকেই ভুল করে বসেন, কারণ ইহাতে হজরত ইসা নবির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয় না, বরং বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ হয়। এই রুহের পরিপূর্ণ বিকাশটিকেই আবার নুরে মুহাম্মদির ভাণ্ডার বলা হয়।

একটি বিখ্যাত হাদিসে কুদসিতে বলা হয়েছে যে, মানবদেহের মাঝে কলব আছে। কলবের মাঝে আছে ‘ফুয়াদ’ অর্থাৎ অনুভূতি ও চিন্তার বিচিত্র গতিপ্রবাহ। এই ফুয়াদের মধ্যে রুহ উদ্ভাসিত হয় তখনই যখন ফুয়াদ খাল্লাসমুক্ত হয়। রুহের মাঝে আছে ‘সেরুর’ তথা রহস্য। সেরুর তথা রহস্যের মাঝে আছে ‘নুর’ তথা নুরে মুহাম্মদি। নুরে মুহাম্মদির মধ্যে আছে ‘আনা’ তথা ‘আম্মিই আম্মি’। আল্লাহ বলেছেন, নুরের মাঝে শুধু আম্মিই আছে।

এখানে যারা মহানবিকে প্রশ্ন করছে তাঁরা কমবেশি বিদ্যাবুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু রুহ বিষয়ে প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ মহানবিকে বলে দিলেন এই বলে যে, রুহ হলো আমার প্রতিপালকের আদেশ। তারপর বলা হলো, এই রুহ বিষয়ে তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। কেন আল্লাহ রুহ বিষয়ে অতি সামান্য জ্ঞান দান করলেন এই বিষয়টি নিয়ে খুব কমই গবেষণা করা হয়ে থাকে। আর গবেষণা করলেই বা লাভ কী, কারণ যত গবেষণাই করা হোক না কেন উহার ফলটি যে অতি সামান্য হতে বাধ্য ইহা তো আল্লাহ আগেই বলে দিয়েছেন। তবে যারা ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার দায়েমি সালাতে নির্জনে একাকী বিরাট ধৈর্যধারণ করে সাধনাটি করতে পারেন এবং যদি আল্লাহর বিশেষ রহমতটি দান করা হয় তবেই রুহের প্রকৃত পরিচয়টি জানা যায়, বোঝা যায় এবং ইহাই আইনুল ইমান অথবা হাক্কুল ইমান তথা যে-ইমানটির এদিক-সেদিক হবার অথবা যাওয়া-আসার সম্ভাবনাটি আর থাকে না। এই ইমানের অধিকারীদেরকেই মোমিন বলা হয়ে থাকে। এই ইমানের বাহিরে যারা ইমান রাখে তাদেরকেই আম্মানু বলা হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, কোরান-এর ২৬৫টি আয়াতে ‘আম্মানু’ শব্দটি মোট ২৭৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ পররূপে মোমিন শব্দটি কোরান-এ ১৪১ আয়াতে মাত্র ১৫১ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যে-মানুষটি নফসে মোৎমায়েন্নার অধিকারী হতে পেরেছেন তিনিই মোমিন এবং জান্নাতের সুসংবাদটি তাকেই দেওয়া হয়েছে। রুহ যে স্বয়ং আল্লাহ রব-রূপে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে শাহারগের নিকটেই তথা জীবন-রণের কাছেই অবস্থান করছেন সেই জ্ঞানটি অতি অল্পসংখ্যক মানুষই বুঝতে পারেন। কারণ, অতি অল্পসংখ্যক মানুষই ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার দায়েমি সালাতে ডুবে থাকেন। আর আমরা সবাই ছরছর করি। সুতরাং, রুহের পরিচয়টি জানবার ইচ্ছাটি যার প্রবল তিনি অবশ্যই ধ্যানসাধনার দিকে এগিয়ে যাবেন। মানুষ বৈষয়িক বিষয়ের চাকচিক্যময় লোভ-মায়ার আকর্ষণে খাল্লাসের কুমন্ত্রণায় বিভোর হয়ে থাকে। তাই রুহ বিষয়টি কেমন করে জানতে পারবে?

কোরান-এর দুই নম্বর সূরা বাকারার দুইশত তিগ্লান্ন নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

তিলকা (ওই) রসুল (রসুলেরা, রসুলগণ) ফাদ্দালনা (আমরা ফজিলত দিয়াছি, আমরা মর্যাদা দিয়াছি, আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি) বাদাহম (তাহাদের কেহ কেহ) আলা (উপর) বাদিন (অংশ, টুকরা, সম্পূর্ণ বস্তুর কিছু অংশ, কিছু, কাহারও)।

পট ওই রসুলগণ আমরা ফজিলত দিয়াছি তাহাদের কাহাকেও কাহারও উপর।

+ মিনহম (তাহাদের মধ্য হইতে) মান (কাহারও, কেহ) কাললামা (কথা বলিয়াছেন) আল্লাহ (আল্লাহ) ওয়া (এবং) রাফাআ (উর্ধ্বে স্থাপন করিলেন, উপরে উঠাইলেন, উঠাইলেন) বাদাহম (তাহাদের কেহ-কেহ) দারাজাতিন (মর্যাদা, ধাপ, সিঁড়ি)।

পট তাহাদের মধ্য হইতে আল্লাহ কথা বলিয়াছে কাহারও (সাথে) এবং মর্যাদায় উর্ধ্বে স্থাপন করিলেন তাহাদের কেহ-কেহকে।

+ ওয়া (এবং) আতাইনা (আমরা দান করিয়াছি) ইসা (ইসাকে) ইবনা (পুত্র) মারিয়ামা (মারিয়মের) বাইইনাতি (খোলা চিহ্নসমূহ, উজ্জ্বল প্রমাণ) ওয়া (এবং) আইয়াদনাহ (আমরা তাহাকে সাহায্য করিয়াছি, শক্তি দিয়াছি) বিরুহি (রুহের দ্বারা) কুদুসি (খুব পবিত্র, পবিত্র সত্তা)।

পট এবং আমরা দিয়াছি মারিয়মের ছেলে ইসাকে উজ্জ্বল প্রমাণ এবং আমরা তাহাকে (ইসাকে) সাহায্য করিয়াছি খুব পবিত্র রুহের দ্বারা।

+ ওয়া (এবং) লাও (যদি) শাআ (চাইতেন, ইচ্ছা করিতেন) আল্লাহ (আল্লাহ) মা (না) ইকতাতালা (সে যুদ্ধ করিল, পরস্পর যুদ্ধ করা) আল্লাজিনা (যাহারা) মিন (হইতে) বাদি (পরে) হিম (তাহাদের) মিম্বাদি (হইতে পরে) মা (যাহা) জাআতহম (তাহাদের কাছে আসিয়াছিল) বাইইনাতু (উজ্জ্বল প্রমাণ) ওয়ালাকিনি (এবং কিছু) ইখতালফু (তাহারা মতভেদ করিল, তাহারা মতবিরোধ করিল) ফামিনহম (সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে) মান (যে, কেহ, কাহারও) আম্মানা (ইমান আনিয়াছে, ইমান আনিল) ওয়া (এবং) মিনহম (তাহাদের মধ্য হইতে) মান (কেহ) কাফারা (কুফরি করিল, অস্বীকার করিল)।

পট এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিত না তাহাদের পর হইতে যাহারা, যাহা তাহাদের কাছে উজ্জ্বল প্রমাণগুলি আসিয়াছিল ইহার পরেও এবং কিছু তাহারা মতবিরোধ করিল সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ ইমান আনিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কুফরি করিল।

+ ওয়া (এবং) লাও (যদি) শাআ (ইচ্ছা করিতেন) আল্লাহ (আল্লাহ) মা (না) ইকতাতালু (তাহারা একে-অপরকে হত্যা করিত)।

পট এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তাহারা একে-অপরকে হত্যা করিত না।

+ ওয়া (এবং) লাকিননা (কিন্তু) আল্লাহা (আল্লাহ) ইয়াফআলু (করেন) মা (যাহা) ইউরিদু (তিনি চাহেন)।

পট এবং কিন্তু আল্লাহ করেন যাহা চাহেন।

এই আয়াতে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করছেন এই বলে যে, রসুলগণের মধ্যে তিনি ফজিলতের প্রশ্নে কিছুটা কম-বেশি করেছেন। অথচ এই সূরা বাকারাতের আল্লাহ আদমদেরকে তথা মানুষদেরকে রসুলগণের মধ্যে ছোট-বড় করার ভাগ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আমরা এই কথাটুকুর মাঝে এই সিদ্ধান্তে

উপনীত হলাম যে আল্লাহ মর্যাদার প্রশ্নে তথা ফজিলতের বিষয়ে রসূলগণের মধ্যে একজন হতে আরেকজনকে মর্যাদাবান বেশি করেছেন। যেহেতু এই মর্যাদার বিভাজনটি রসূলগণের মধ্যে তিনিই করেছেন সেই হেতু কোনো কিছু বলার এবং অভিযোগ করার প্রশ্নটি অবান্তর। অথচ আমাদেরকে রসূলগণের মধ্যে ছোট-বড় করতে মানা করে দিয়েছেন। কারণ, যদিও রসূলগণ আমাদেরই মতো অথচ রসূলগণ মোটেও আমাদের মতো নহেন। যেহেতু রসূলেরা আমাদের মতো নহেন সেই হেতু আল্লাহ আমাদেরকে ছোট-বড় করতে তথা পার্থক্য করতে মানা করে দিয়েছেন।

আবার আল্লাহ বলেছেন, রসূলগণের মধ্যে তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেছেন। এই কথাটির গভীর রহস্য অধম লেখকের পরিষ্কার জানা থাকলেও অপরিষ্কারের ভান করে বলতে হচ্ছে যে তিনি (আল্লাহ) রসূলদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছেন। আবার তিনি বলেছেন যে উচ্চমর্যাদার প্রশ্নে রসূলগণের মধ্যে কাহাকেও উচ্চমর্যাদাটি দান করেছেন। তারপর আল্লাহ বলেছেন, মরিয়মপুত্র হজরত ইসা রুহল্লাহ (আ.)-কে উজ্জ্বল প্রমাণ দান করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই উজ্জ্বল প্রমাণ (বাইইনাত) বলতে আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন? অধম লেখকের মনে হয় যে এই উজ্জ্বল প্রমাণটি হলো হজরত ইসা রুহল্লাহ (আ.) দোলনাতে গুয়ে-গুয়েই কথা বলতেন। তিন দিনের শিশু অবস্থায় আর কোনো রসূল কথা বলেছেন কি না উহা অধম লেখকের জানা নাই। কিন্তু হজরত ইসা রুহল্লাহ (আ.) যে জন্মগ্রহণ করেই কথা বলতে শুরু করেছেন ইহার জুলন্ত দলিলটি আমরা কোরান-এই পাই। কথিত আছে যে, দোলনায় গুয়ে-গুয়ে শিশু ইসা রুহল্লাহ (আ.) যখন মানুষদের সঙ্গে কথা বলতেন তখন সেই মানুষেরা অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে যেত এবং ভক্ত তথা মুরিদ হয়ে যেত। তারপরে আবার মরিয়মপুত্র ইসাকে রুহল কুদ্দুস তথা অতি পবিত্র রুহ দ্বারা শক্তিশালী করার কথাটিও বলা হয়েছে। অধিকাংশ তফসিরকারকেরা রুহল কুদ্দুসের অর্থটি বুঝতে না পেরে অনুমানের গুলমারা বিদ্যাটি জাহির করে ফেলেছেন। আর সেই গুলমারা বিদ্যাটি হলো, রুহল কুদ্দুস বলতে তারা ফেরেশতা জিবরাইলের কথাটি উল্লেখ করেছেন। হায় রে খোদা! এরা কি এটুকু বেমানান ভুলে গেছেন যে, জিবরাইল ফেরেশতার নফসও নাই এবং রুহও নাই। তথা নির্বাচন করার অধিকার হতে ফেরেশতার সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত। আসলে ফেরেশতা জিবরাইলের নাম যদি রুহল কুদ্দুস দেওয়া হয় তা হলে ইহা অনেকটা কানা ছেলের নাম পদ্যলোচনের মতো শোনায়, তথা চোখই নাই অথচ কী সুন্দর অপূর্ব চোখ দুইটি। বুকে হাত রেখে বিবেককে ফাঁকি না দিয়ে একবার ভাবুন তো যে, আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে কোনো নফস এবং কোনো রুহ দান করেন নি। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টজীবকে আল্লাহ নফস দান করেছেন, কিন্তু রুহ দান করেন নাই – একমাত্র মানুষ এবং জিন ছাড়া। তাই আমরা দেখতে পাই, মানুষের মধ্যে যে-রকম আল্লাহর ওলি হয়, তেমনি জিনের মধ্যেও আল্লাহর ওলি হয়। যেহেতু জিনজাতির সঙ্গে আমাদের তথা মানুষদের সঙ্গে পরিচয় নাই বললেই চলে তাই ইচ্ছা করেই জিনজাতির কথাটি বাদ দিয়ে যাই। আমরা জানি, ফেরেশতার অতি পবিত্র, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নহে। সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মানুষ। তাই মানুষকে আল্লাহ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে আখ্যায়িত করেছেন। ফেরেশতার অতি পবিত্র হয়েও এই সর্বশ্রেষ্ঠ গুণটির ধারে-কাছেও নাই। কারণ, নির্বাচন করার ক্ষমতাটি ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয় নি। নির্বাচন করার কথাটি তখনই আসে যখন ভালো এবং মন্দের মিশ্রণ করা হয়। ভালো-মন্দের অধিকারটি দান

করলেই সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটিও দান করা হয়ে যায়। কারণ, কান টানলে মাথা আপনিই আসবে। আল্লাহর এত বড়-বড় জুলন্ত প্রমাণসমূহ দেখার পরেও মানুষ উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ না করে বরং পরস্পর হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, হত্যাযজ্ঞ এমনকি ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে বারবার। ইহা মানবজাতির ইতিহাসে একটি কলঙ্কের তিলক হয়ে আছে এবং থাকবে। তাই এই সীমিত ইচ্ছাশক্তিটি দান করার দরুন কেহ ইম্মান আনবে, কেহ সরাসরি কুফরি করবে। ভালো এবং মন্দে এই লীলাখেলাটি যুগ-যুগ ধরে চলে আসছে অনেক রূপ ও রঙে এবং অনেক রকম লেবাসে। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দান করেছেন তথা নির্বাচন করার অধিকারটি দিয়েছেন সেই হেতু আল্লাহ ইহার উপর হস্তক্ষেপ করেন না। যদি হস্তক্ষেপ আল্লাহ করতেন তা হলে এই হত্যাযজ্ঞের লীলাখেলাটির চিরতরে অবসান হতো। এখানে অনেকেই আল্লাহকে গোপনে দোষ দিতে চায়। কিন্তু অধম লেখক নিরপেক্ষ মনে বলছি যে, স্বাধীনতা দেবার পর যদি উহা হরণ করা হয় তা হলে এই স্বাধীনতার মর্যাদাটি থাকে কোথায়? সুতরাং, সর্বপ্রকার দোষ হতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাল্লাহশানাহ সম্পূর্ণ মুক্ত।

কোরান-এর সত্তর নম্বর সূরা মারেজ-এর চার নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

তারুজুল (উরুজ করে, আরোহণ করে, উপরে উঠে, উর্ধ্ব গমন করে, অধিরোহণ করে) মালায়িকাতু (ফেরেশতারা) ওয়া (এবং) রুহ (রুহ [রুহের প্রতিশব্দ বাংলাতেও নাই এবং ইংরেজি ভাষাতেও নাই। তবে বাংলা ভাষায় পরমাত্মা এবং ইংরেজিতে 'স্পিরিট' কেউ-কেউ অনুবাদ করে থাকেন]) ইলাইহি (তাহার দিকে) ফি (মধ্যে) ইয়াওমিন (একদিন) কানা (হয়) মিকদারুহ (যাহার পরিমাণ, যাহার মাপ, যাহার মাত্রা, যাহার ওজন, যাহার সংখ্যা, যাহার বিস্তার, যাহার গুরুত্ব) খামসিনা (পঞ্চাশ) আলফা (হাজার) ছানাতিন (বছর)।

ঈ উরুজ করে ফেরেশতারা এবং রুহ তাহার (আল্লাহর) দিকে একদিনের মধ্যে যাহার পরিমাণ হয় পঞ্চাশ হাজার বছর।

এই আয়াতে 'উরুজ' শব্দটির অর্থ হলো উপরে ওঠা তথা উর্ধ্বগমন। আবার 'উরুজ' শব্দটির অর্থটি মিলনও হয়। আরবি ভাষায় একটি শব্দের যে কত রকম অর্থ হয় তার কিছুটা নমুনা কোথাও-কোথাও তুলে ধরেছি। আল্লাহর সঙ্গে মিলনের জন্য আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগতিকেও 'উরুজ' বলে। এই 'উরুজ' শব্দের সঙ্গে 'মেরাজ' নামক পরিচিত শব্দটি আমাদের জানা আছে। এই 'উরুজ' শব্দ হতেই মেরাজ শব্দটির আগমন। ফেরেশতারা এবং রুহ আল্লাহর দিকে যে-গতিতে এগিয়ে যায় তা পৃথিবীতে বাস করা মানুষের নিকট পঞ্চাশ হাজার গুণ তিনশত ষাট দিন (হিজরি সনের গণনায়) - এই কথাটির মাধ্যমে স্থান ও কালের (টাইম অ্যান্ড স্পেস) সীমাবদ্ধ দৈহিক গতিটিকে বোঝানো হয় নাই। কারণ, আল্লাহ স্থান এবং কালের বৃত্তের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। আল্লাহ কখনোই মানুষ হতে কোনো এক সুদূর স্থানে অবস্থান করেন না যার জন্য এত বড় লম্বা রাস্তাটি অতিক্রম করে আল্লাহর নিকট যেতে হবে। এই গতি দৈহিক অথবা বৈষয়িক গতি (ফেনোমেনাল স্পিড) নহে। ইহা নিছক একটি আধ্যাত্মিক গতি (স্পিরিচুয়াল স্পিড)। আপন নফস হতে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার ধ্যানসাধনায় দায়েমি সালাতে ডুবে থেকে সাধক যখন খান্নাসমুক্ত হতে পারে তখনই সে আল্লাহর রহস্যময় পরিচয়ে পরিচিতি লাভ করে।

আপন নফসের মধ্যে রুহটি যখন পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে, সেই পরিপূর্ণ রূপটিই হলো আল্লাহর রূপ এবং যেখানেই আল্লাহর রূপের পরিচয়টি ধরা দেবে সেখানে ফেরেশতাদের আগমনটি অবধারিত।

মহানবি যে মেরাজে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন সেই সময়টিকেও সর্বনিম্ন সাতাশ বছর হতে সাতাশ হাজার বছর পর্যন্ত অবস্থান করার কথাটি দেখতে পাই, অথচ মহানবির ওজুর পানি তখনও গড়িয়ে যাচ্ছিল এবং আরও কিছু ঘটনা। এই স্থান ও কালের (টাইম অ্যান্ড স্পেস) বিষয়টির কিছুটা পরিচয় আমরা এই আধুনিককালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং হতে জ্ঞানতে পারি। তা ছাড়া আল্লাহর বহু ওলিরা বলেই ফেলেছেন যে ‘বুদ আনন্দার লা মোক্কা খসরু’ – তথা, খসরু লা-মোক্কায় অবস্থান করেছিল।

মহানবি বলেছেন, আসসালাতু মেরাজুল মোমেনিন – অর্থাৎ, সালাতই মোমিনদের মেরাজ। পক্ষান্তরে, আল্লাহ সুরা মারেজ-এর তেইশ নম্বর আয়াতে বলছেন, আল্লাজিনা হুম আলা সালাতিহিম দায়েমুনা – অর্থাৎ, যারা দায়েমি সালাতের উপর তথা চব্বিশ ঘণ্টা সালাতের উপর অবস্থান করে তারাই মুসল্লি। এখানে একটু লক্ষ্য করবার বিষয়টি হলো, কোরান দায়েমি সালাতের কথাটি একদম সোজাসুজি বলে দিলেন। পক্ষান্তরে ওয়াক্ফিয়া সালাতের কথাটি কোরান-এ সোজাসুজি বলা হয় নি অথবা বলেন নি। ধ্যানসাধনায় রত থাকা একজন সাধক যখন আপন পবিত্র নফস হতে খাল্লাসটিকে তাড়িয়ে দিতে পারে তখনই সেই সাধক মোমিনে পরিণত হয় এবং রুহ পরিপূর্ণরূপ ধারণ করে যে-দর্শনটি দান করা হয় উহাই হলো সাধকের মেরাজ।

নফস সরল, কিছু খাল্লাস বন্ধ তথা আকাম-কুকামের গুরু ঠাকুর। খাল্লাসমুক্ত নফসটি একদম সরল-সহজ এবং নিশ্চাপ। তাই বলা হয়ে থাকে, ‘ফেরেশতার মতো’। সুতরাং, রুহ রহস্যের ভাঙার, রুহ গোপনেরও গোপন, রুহ বিজ্ঞান বহির্ভূত বিজ্ঞান, রুহ ধারণার বহির্ভূত ধারণা। অথচ, এই রুহ প্রতিটি মানুষের জীবন-রঙের নিকটেই অবস্থান করে – যদিও বুঝতে পারি না এবং দুনিয়ার অনেক রকম চাকচিক্যময় মোহনীয় বিষয়গুলোর মায়াজালে আপন নফসের সঙ্গেই মিশে থাকা খাল্লাসটি সত্যদর্শন হতে তথা রুহের পরিচয় হতে ফিরিয়ে রাখে অনেক রকম মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে।

কোরান-এর আটত্রিশ নম্বর সুরা সাদ-এর বাহাত্তর নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ফা (সুতরাং, কাজেই, অগত্যা, অতএব) ইজা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) সাওয়াইতুই (আমি [এখানে আল্লাহ নিজেকে একবচনে বলেছেন এবং ‘নাহনু’ তথা আমরা শব্দটি ব্যবহার করা হয় নাই। রাজা অথবা রানি সব সময় ‘আমরা’ ব্যবহার করে থাকেন, কিন্তু আল্লাহ দুনিয়ার রাজা বা রানি নহেন। তাই তিনি কখনো ‘আমি’ এবং কখনো ‘আমরা’ বলেন। তাহাকে স্মরণ করি, আমি তাহাকে সম্মান করি, সুসজ্জিতপূর্ণ করি, সুন্দর করি, শোভন করি, যথাযোগ্য উপাদানবিশিষ্ট করি, সোজা করি, ঠিক করি, মীমাংসা করি, বিন্যস্ত করি, সাজাইয়া রাখি, মেলক হারমোনিয়াস, ওয়েল-প্রপারশন্ড, ইডেন, ফ্লেইট শেপড, প্রপার, কারেক্ট, রেগুলার, ইনট্যাক্ট, রাইট, শেপলি) ওয়া (এবং, আর, ও) নাফাখতু (আমি ফুৎকার দেই, আমি ফুঁ দেই) ফিহি (ইহার মধ্যে) মিন্ (হইতে, থেকে, চেয়ে) রুহি (আমার রুহ [পাঠক, খেয়াল করুন, এখানে ‘নাফসি’ বলা হয় নাই। কারণ, নফস জীবন-মৃত্যুর অধীন। অথচ, এই রুহটি আমাদের মধ্যে ফুৎকার করার কথাটি বলা হয়েছে, নফস ফুৎকার করার কথাটি বলা হয় নি। কারণ, নফস হলো প্রাণ, আর রুহ অর্থটি হলো আল্লাহর

আদেশ তথা স্বয়ং আল্লাহ। কারণ, আদমের আগে আল্লাহ যে কাকে তৈরি করেছিলেন উহার দলিলটি হাবিল-কাবিলের ঘটনাতেই দেখতে পাই। কারণ, কাকের প্রাণ আছে। কিন্তু রুহ নাই। সুতরাং, প্রাণ এবং রুহ এই দুটোর মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই বিষয়টি অনেকেরই জানা নাই।) ফাকাউ (সুতরাং তোমরা পড়িয়া যাও, সুতরাং তোমরা ভূপতিত হও, সুতরাং তোমরা নত হও) লাহ (তাহার, তাহার জন্য) সাজ্জিদিনা (সেজ্জদায়, সেজ্জদাকারী হওয়া)।

প্ট সুতরাং যখন আমি তাহা সুম্ম করি এবং আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার রুহ হইতে, সুতরাং তোমরা তাহাকে সেজ্জদা করো।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো, আদমের মধ্যে আল্লাহ যে ফুৎকার করে দিচ্ছেন, সেই ফুৎকারটি কিছু নফস নহে। কারণ, নফস জীবন-মরণের অধীন। তা ছাড়া আল্লাহর মধ্যে নফস নাই, নফস আল্লাহর গুণবাচক তথা সেকাতি সৃষ্টি। ওয়া নাফাখতু ফিহি মিন্ন রুহি - অর্থাৎ, “আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার রুহ”। এখানে বলা হয় নি, আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার নফস। সুতরাং, নফস এবং রুহের মধ্যে বিশাল পার্থক্যটি পরিষ্কাররূপে ধরা পড়ে যায়। আরও অনেক কিছু বলা যেত, লেখা যেত, কিন্তু বিস্তারিত না লিখে সামান্য একটি কথাই বলতে চাই যে, আদমের পূর্বেই জিনজাতিকে আল্লাহ তৈরি করেছেন এবং কেবল জিনজাতিকই নয় - বরং কাক হতে সব রকম পাখি, পশু, গাছ-পালা, ফুল ইত্যাদিও যে আদমের আগেই তৈরি করে রাখা হয়েছে ইহাও পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায়। সুতরাং, রুহ সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নহে, রুহ সৃজনীশক্তির অধিকারী তথা এক কথায়, রুহ প্রতিটি মানুষের সঙ্গে রব-রূপে তথা প্রতিপালক-রূপে শাহারগের নিকটেই অবস্থান করে।

কোরান-এর পনের নম্বর সূরা হিজর-এর উনত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ফা (সুতরাং, অতএব, অগত্যা, কাজে-কাজেই) ইজ্জা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) সাওয়াইতুহ (আমি [এখানে আল্লাহ নিজেকে একবচনে বলেছেন এবং 'নাহনু' তথা আমরা শব্দটি ব্যবহার করা হয় নাই। রাজা অথবা রানি সব সময় 'আমরা' ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ দুনিয়ার রাজা বা রানি নহেন। তাই তিনি কখনো 'আমি' কখনো 'আমরা' বলেন] তাহাকে সুম্ম করি, আমি তাহাকে সম্মান করি, সুসজ্জিতপূর্ণ করি, সুন্দর করি, সোজা করি, শোভন করি, যথাযোগ্য উপাদানবিশিষ্ট করি, সাজাইয়া রাখি, মেলক হারমোনিয়াস, ওয়েল প্রপারশন্ড, ইডেন, স্ট্রাইট শেপড, প্রপার, কারেক্ট, রেগুলার, ইনট্যাক্ট, রাইট, শেপলি) ওয়া (এবং, আর, ও) নাফাখতু (আমি ফুৎকার দেই, আমি ফুৎ দেই) ফিহি (ইহার মধ্যে) মিন্ন (হইতে, থেকে, চেয়ে) রুহি (আমার রুহ [এখানে নফস বলা হয় নি, কারণ নফস জন্ম-মৃত্যুর অধীন। রুহ-এর প্রতিশব্দ অন্য কোনো ভাষায় নাই]) ফাকাউ (সুতরাং তোমরা পড়িয়া যাও, সুতরাং তোমরা ভূপতিত হও, সুতরাং তোমরা নত হও) লাহ (তাহার, তাহার জন্য) সাজ্জিদিনা (সেজ্জদায়, সেজ্জদাকারী হওয়া)।

প্ট সুতরাং যখন আমি তাহা সুম্ম করি এবং আমি ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমার রুহ হইতে সুতরাং তোমরা তাহাকে সেজ্জদা করো।

যেহেতু এই আয়াতটির অনুরূপ আয়াতের ব্যাখ্যা আগেই (সাদ :৭২) লেখা হয়েছে তাই ইহার ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

কোরান-এর ছেষটি নম্বর সূরা তাহরিম-এর বারো নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে :

ওয়া (এবং, আর, ও) মারিয়াম্মা (মরিয়ম) ইব্নাতা (কন্যা, মেয়ে) ইমরানা (ইমরানের) আল্লাতি (যে, যাহা, যাহাকে, যিনি, যা, যাহার, যার, যাকে)

আহসানাত (হেফাজত করিয়াছিলেন, সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, রক্ষা করিয়াছিলেন, পাহারা দিয়াছিলেন, তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন) ফারজাহা (ছিঁড়িয়া ফেলা, ফাঁড়িয়া ফেলা, ফাটা, পুরুষ ও মহিলাদের লজ্জার স্থান) ফা (সুতরাং, অতএব, অগত্যা, কাজে-কাজেই) নাফাখনা (আমরা ফুৎকার দেই, আমরা ফুকিয়া দেই [এখানে রুহ-ফুৎকার করার প্রশ্নে আল্লাহ 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তথা বহুবচনে বলা হয়েছে। কিন্তু অন্য আয়াতে বহুবচনে না বলে একবচনে তথা 'আনা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। একবার 'আমি' এবং আবার 'আমরা' তথা একবচন এবং বহুবচন উভয়টি রুহ ফুৎকারের বেলায় কেন ব্যবহার করা হলো উহা অধম লেখকের জ্ঞানা নাই। তবে এই একবচন ও বহুবচন ব্যবহার করার মাঝে অবশ্যই গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে এবং এই রহস্যটি জ্ঞানা না থাকার দরুন পাঠকদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরলাম।) ফিহি (ইহার মধ্যে) মির (হইতে, থেকে, চেয়ে) রুহিনা (আমাদের রুহ [এখানে আল্লাহ বহুবচনে রুহ-ফুৎকার করছেন]) ওয়া (এবং, আর, ও) সাদ্দাকাতি (সে সত্য হিসাবে মানিয়া লইয়াছে, সে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে, সে সত্যায়িত করিয়াছে, সে সত্যতা স্বীকার করিয়াছে, সে সাক্ষ্য দিয়াছে) বিকালিম্মাতি (বাণীসমূহের সহিত, কথাগুলির সহিত, শব্দসমূহের সহিত, উক্তিগণের সহিত, ভাষণসমূহের সহিত) রাব্বিহা (তাহার রবের, তাহার প্রতিপালকের, তাহার সদাপ্রভুর) ওয়া (এবং, আর, ও) কুতুবিহি (তাঁহার কিতাবসমূহ, তাহার প্রত্যাদেশসমূহ) ওয়া (এবং, আর, ও) কানাত্ (তিনি ছিলেন, তিনি ইন) মিনাল্ (হইতে, থেকে, চেয়ে) কানিতিন্ (অনুগতদের অধীনদের, অনুসরণকারীদের, আশ্রিতদের

পর্ট এবং ইমরানের কন্যা মরিয়ম যিনি হেফাজত করিয়াছিলেন তাহার লজ্জাস্থান সুতরাং আমরা ফুৎকার দেই ইহার মধ্যে আমাদের রুহ হইতে এবং তিনি সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন তাহার রবের বাণীসমূহ এবং তাহার কিতাবসমূহ এবং তিনি ছিলেন অনুগতদের হইতে (একজন)।

প্রথমেই পাঠকদেরকে বলে রাখিতে চাই যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লেখা উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল উদ্দেশ্যটি হলো রুহ-ফুৎকারের বিষয়ে কোরান-এর কোথাও একটিবারের তরেও নফস ফুৎকারের কথাটি বলা হয় নাই। সুতরাং, আমার মূল উদ্দেশ্যটি হলো নফস ও রুহের পার্থক্যটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। আমার জ্ঞানা মতে, কোরান-এ বিশটি আয়াতে একুশবার 'রুহ' শব্দটি বলা হয়েছে এবং যে-যে সুরার যে-যে আয়াতে 'রুহ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে উহাই তুলে ধরাটি ইলো মুখ্য উদ্দেশ্য। রুহ যে মোটেও প্রাণ নহে তথা নফস নহে এই কথাটুকু পাঠকদেরকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই এই প্রচেষ্টা। বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি তখনই লেখা হবে যখন কোরান-এর কোনো সুরার সব আয়াতের ব্যাখ্যা লেখা হবে। তবে, এই কথাটি পরিষ্কার বোঝা গেল যে, রুহ-ফুৎকার বিষয়টি কেবলমাত্র নবি-রসুলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, বরং আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দাদের মধ্যেও রুহ-ফুৎকার করা হয় এবং রুহ-ফুৎকারটিও যে একটি সার্বজনীন বিষয় ইহাও পরিষ্কার বোঝা গেল।

কোরান-এর পাঁচ নম্বর সূরা মায়েদার একশত দশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে

:
ইজ্ (যখন, যে-সময়, যেহেতু, কারণ, হঠাৎ, অকস্মাৎ, অতঃপর) কালাল্লাহ (আল্লাহ বলিলেন) ইয়া (হে) ইসা (ইসা) ইবনা (পুত্র) মারিয়ামা (মারিয়মের) আজকুর (তুমি জিকির করো, তুমি মনে করো, তুমি স্মরণ করো) নিয়ামাতি (আমার নিয়ামতের, আমার অনুগ্রহের, আমার দয়ার, আমার প্রসাদের,

আমার প্রসন্নতার, আমার আনুকূল্যের, আমার উপকারের) আলাইকা (তোমার উপর) ওয়া (এবং, আর, ও) আলা (উপর) ওয়ালিদাতিকা (তোমার মায়ের, তোমার মাতার)।

পট যখন আল্লাহ বলিলেন, হে মরিয়মের পুত্র ইসা, তুমি জিকির করো তোমার উপর এবং তোমার মায়ের উপর আমার নিয়ামতের।

+ ইজা (যখন) আইইয়াততুকা (তোমাকে সাহায্য করিলাম) বিরুহিলকুদুসি (পবিত্র রুহের সহিত, পবিত্র রুহের দ্বারা, রুহুল কুদ্দুস দ্বারা)।

পট যখন রুহুল কুদ্দুস দ্বারা তোমাকে সাহায্য করিলাম।

+ তুকালালিলুম (তুমি কথা বলিতে) নাসা (মানুষের [সাথে]) ফিল (মধ্যে) মাহদি (কোল, মায়ের কোল, বিছানা, দোলনা) ওয়া (এবং) কাহলান (মধ্য বয়সে, পরিণত বয়সে)।

পট মানুষের (সাথে) তুমি কথা বলিতে দোলনার মধ্যে এবং পরিণত বয়সে।

+ ওয়া (এবং) ইজ্জ (যখন) আললামতুকাল (তোমাকে শিক্ষা দিলাম) কিতাবা (কিতাব) ওয়া (এবং) হিকমাতা (হিকমত, বিজ্ঞান) ওয়া (এবং) তাওরাতা (তাওরাত) ওয়া (এবং) ইনজিলা (ইঞ্জিল)।

পট এবং যখন তোমাকে শিক্ষা দিলাম কিতাব এবং হিকমত এবং তাওরাত এবং ইঞ্জিল।

+ ওয়া (এবং) ইজ্জ (যখন) তাখলুকু (তুমি তৈরি করিয়াছে, তুমি বানাইয়াছ) মিনাত্ (হইতে) তিনি (মাটি) কাইইয়াতি (মতো, আকৃতিসদৃশ্য, সুরতে) তাইরি (পাখি) বিইজ্জনি (আমার নির্দেশে, আমার হুকুমে, আমার আদেশে) ফাতানফুখ (সুতরাং ফুক দিতে, সুতরাং ফু দিলে) ফিহা (উহার মধ্যে) ফাতাকুনু (সুতরাং ইইয়া যাইত) তাইরাম্ (পাখি) বিইজ্জনি (আমার নির্দেশে, আমার হুকুমে, আমার আদেশে) ওয়া (এবং) তুবরিউল (তুমি ভালো করিয়া দিতে, তুমি নিরাময় করিয়া দিতে) আক্মাহা (জন্মাক্ষ) ওয়াল্ (এবং) আব্বাসা (কুষ্ঠরোগী) বিইজ্জনি (আমার নির্দেশে, আমার হুকুমে, আমার আদেশে)।

পট এবং যখন তুমি আমার হুকুমে মাটি হইতে পাখির মতো আকৃতি তৈরি করিতে, সুতরাং উহার মধ্যে ফু দিতে, সুতরাং (উহা) আমার হুকুমে পাখি হইয়া যাইত এবং তুমি আমার হুকুমে জন্মাক্ষ এবং কুষ্ঠরোগীকে ভালো করিতে।

+ ওয়া (এবং) ইজ্জ (যখন) তুবরিজুল (তুমি বাহির করিতে, তুমি জীবিত করিতে) মাওতা (মৃতদেরকে) বিইজ্জনি (আমার হুকুমে, আমার নির্দেশে)।

পট এবং যখন আমার হুকুমে তুমি মৃতদেরকে জীবিত করিতে।

+ ওয়া (এবং) ইজ্জ (যখন) কাফাকতু (বিরত রাখিয়াছিলাম) বানি ইসরাইলা (বনি ইসরাইলকে) আনকা (তোমা হইতে),

পট এবং যখন বনি ইসরাইলকে তোমা হইতে বিরত রাখিলাম,

+ ইজ্জ (যখন) জিতাহম্ (তুমি তাহাদের নিকট আসিলে) বিল্বাইয়িনাতি (সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহসহ) ফাকীলাল্ (সুতরাং বলিয়াছিল) লাজিনা (যাহারা) কাফারু (কাফেরেরা, অস্বীকারকারীরা) মিনহম্ (তাহাদের মধ্যে) ইন্ (নহে, নয়) হাজ্জা (এইটা) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) সিহরম্ (জাদু) মুবিনুন (প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট)।

পট যখন তুমি তাহাদের নিকট আসিলে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহসহ, সুতরাং যাহারা কাফের তাহাদের মধ্য হইতে বলিয়াছিল, এইটা পরিষ্কার জাদু ছাড়া (আর কিছু) নয়।

এই আয়াতে পবিত্র রুহের দ্বারা সাহায্য করার কথাটি বলা হয়েছে। পাঠক, খেয়াল করুন, এখানে পবিত্র নফস দ্বারা সাহায্য করার কথা বলা হয় নাই।

অবশ্য কেহ-কেহ না বুঝে না-শুনে ‘রুহুল কুদ্দুস’ তথা ‘পবিত্র রুহ’ অনুবাদ করার সময় জিবরাইল নামক এক ফেরেশতার নামটি বসিয়ে দেয়। একটিবারের তরেও ভেবে দেখে না যে, জিবরাইল ফেরেশতা আল্লাহর সৈফাতি নুরের তথা গুণবাচক নুরের তৈরি এবং কোরান-এর কোথাও একটিবারের তরেও এই কথাটি বলা হয় নি যে, ফেরেশতাদের নফসও আছে, রুহও আছে। নফস এবং রুহ – দুইটির একটিও ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয় নি। তা হলে রুহুল কুদ্দুস তথা পবিত্র রুহ কথাটির দ্বারা কেমন করে জিবরাইল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে উহা অধম লেখকের জ্ঞান নাহি। এখানে আমরা সূরা মায়েরদার ধারাবাহিক শব্দার্থ, বাক্য গঠন এবং ব্যাখ্যা লিখছি না, লিখছি কেবলমাত্র রুহ-এর পরিচয়টি তুলে ধরতে এবং রুহ ও নফসের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য উহাই তুলে ধরতে। একটু খেয়াল করুন তো, মায়ের কোলে অথবা দোলনার শিশুটি কেমন করে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে? কেমন করে এই শিশুটিকে কিতাব এবং হিকমত দেওয়া যেতে পারে? ইহা কি একটি অতীব আশ্চর্যজনক ঘটনা নহে? শুধু কি কিতাব ও হিকমতই দান করছেন? না। অবাক হই, দুই-দুইটি সহিফা – একটির নাম তাওরাত এবং অপরটির নাম ইঞ্জিল – শিক্ষা দিয়েছেন দোলনায় থাকা অবস্থায়। আল্লাহর এত বড় অপরিসীম দান সত্যিই মানবজাতিকে ভাবিয়ে তোলে। এখানেই শেষ করে দেওয়া হয় নি, বরং আরও এগিয়ে গিয়ে বলা হয়েছে যে মাটি দিয়ে বানানো পাখির মতো একটি মাটির পাখি তৈরি করে আল্লাহর হুকুমে ফুৎকার দিলে উহা সঙ্গে-সঙ্গে জীবন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যেত। মাটি দিয়ে তৈরি পাখির মধ্যে রুহ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না, বরং প্রাণটিও নাহি। অথচ প্রাণহীন মাটির তৈরি খেলনার মতো পাখিতে আল্লাহর হুকুমে ফুৎকার দেবার সঙ্গে-সঙ্গে উহা জীবন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যাওয়াটা কি একটি অভাবনীয়, অচিহ্ননীয়, বিস্ময়কর ঘটনা বলে মনে হয় না?

আল্লাহ আরও বলছেন যে, জন্মান্ন এবং কুঠ রোগীদেরকেও আল্লাহর হুকুমে ভালো করে দিয়েছেন। তারপরের কথাটি সবাইকে অবাক করে তোলে আর সেটি হলো, মৃত ব্যক্তিদেরকে “আল্লাহর হুকুমে জীবিত হও” বলার সঙ্গে-সঙ্গে জীবিত হয়ে যেত। এত কিছু দেখার পরেও যারা কাকের তারা নবি-রসুল-রূপে মেনে নেওয়া তো দূরে থাক, বরং জঘন্য ভাষায় বলতো যে, এগুলো হচ্ছে প্রকাশ্য জাদু। সুতরাং, যাদের তকদিরে ইম্মান শব্দটি লেখা হয় নাহি তাদেরকে বড়-বড় জুলন্ত দৃষ্টান্তগুলো একের পর এক দেখিয়ে দিলেও কেমন করে ইম্মান আনবে আর কেমন করেই বা বিশ্বাস স্থাপন করবে? সুতরাং, সব সিদ্ধান্তের শেষ সিদ্ধান্তটি হলো, মেনে নেওয়াটাও তকদির এবং অস্বীকার করাটাও তকদির। এই তকদিরের বলয় হতে আল্লাহর বিশেষ রহমত ছাড়া বেরিয়ে আসা যায় না। এটাই সত্য। এটাই নির্মম সত্য। এটাই উলঙ্গ সত্য। এটাই স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

১৮ নং সূরা : আল কাহাফ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল্লাহর নামের সাথে (বিসমিল্লাহি) যিনি একমাত্র দাতা
(আর রাহমান) একমাত্র দয়ালু (আর রাহিম)

১. আলহামদু (একমাত্র প্রশংসা, মহিমাকীর্তন, গুণকীর্তন, সুখ্যাতি, তারিফ, সানা) লিল্লাহিল (আল্লাহর জন্য) লাজি (যিনি) আনজালা (নাজিল করিয়াছেন,

অবতীর্ণ করিয়াছেন, পাঠাইয়াছেন, প্রেরণ করিয়াছেন) আলা (উপর, প্রতি, নিকটে, কাছে) আব্দিহিন্ (তাঁহার বান্ধা, তাঁহার দাস, তাঁহার অনুগত, তাঁহার অধীন ব্যক্তি, তাঁহার ভৃত্য, তাঁহার চাকর) কিতাবা (কেতাব, যে মহাবিজ্ঞানের ধারাবাহিকতায় সৃষ্টিসমূহ বিকশিত ও প্রকাশিত হইতেছে তাহাকে কোরান-এর ভাষায় ও দর্শনে কেতাব বলা হয়) ওয়া (এবং, আর, অধিকন্তু, ও, আরও) লাম্ (নাই, না) ইয়াজ্আন্ (রাখা, থাকিতে দেওয়া, হইতে দেওয়া, ঘটিতে দেওয়া, অনুমোদন করা) লাহ (তাহাতে, তন্মধ্যে, তাহার জন্য) ইওয়াজান্ (বাক্য, বক্তৃতা, অসরলতা, বিকৃতি, অসাধুতা, যাহা চোখে ধরা পড়ে না, বরং বিবেক-বুদ্ধি এবং অনুভূতির দ্বারা ধরা পড়ে তাহাকেও 'ইওয়াজান' বলা হয়)।

প্ট একমাত্র প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁহার বান্ধার উপর কেতাব নাজেল করিয়াছেন এবং রাখেন নাই তাহাতে বক্তৃতা।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণটি করতে গেলে মনে হয় কত সহজ, কত সরল! কিন্তু ইহার গভীর হতে গভীরতর ব্যাখ্যাটি লিখতে গেলে বোকার মতো কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি। কারণ, প্রথমেই বলা হয়েছে, 'একমাত্র প্রশংসা আল্লাহর জন্য' – অর্থাৎ, প্রশংসার অধিকারটি আর কাহাকেও দেওয়া হয় নি। এখন প্রশ্ন আসে, আল্লাহ ছাড়া কেহ আছে কি? অথবা, কেহ অবস্থান করছে কি? যদি বলা হয়, সামান্য একটি ধূলিকণা – সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, উহা আল্লাহ হতে আলাদা অথবা বিচ্ছিন্ন; যদি এই অতীব ক্ষুদ্র ধূলিকণাটি আল্লাহ হতে আলাদা অথবা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে তা হলে সেই ধূলিকণাটিও তার অতীব ক্ষুদ্র অংশীদারিত্ব দাবি করতে পারে এবং এই অংশীদারিত্ব দাবি করাটাই হলো শেরেক করা।

সুতরাং, আল্লাহর এই মহাবিজ্ঞানময় নিয়মে যে-সৃষ্টিসমূহ প্রকাশিত হচ্ছে উহার বাহিরে কিছুই থাকার কথা নয়; কারণ, কিছু থাকলে তো কিছুর প্রশংসা করার প্রশ্নটি আসতে পারে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই সুতরাং, প্রশংসা করার প্রশ্নটি আসতে পারে না। ইহা এবং ইহার রহস্য অনেকেই বুঝতে পারে না বলে এটা-সেটা বলতে বাধ্য হয়। না বুঝবার দরুনই যত গোলমালের সৃষ্টি হয়। লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ – নাই কোনো মওজুদ তথা নাই কোনো অস্তিত্ব একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। অস্তিত্বের বাহিরে কিছু নাই বলে ইহাকে গণিতের পরিভাষায় শূন্য বলা হয়। শূন্য যোগ শূন্য সমান সমান শূন্য; তথা নাই যোগ নাই সমান সমান নাই। তাই এই সুরার প্রথমেই বলা হয়েছে, একমাত্র প্রশংসাটি আল্লাহর জন্য। অবশ্য এই রকম আয়াত কোরান-এর বহু স্থানে বহুবার বলা হয়েছে। দৃষ্টির দর্শনের গভীরতার অভাবে আমরা বুঝতে পারি না।

তারপর, এই আয়াতেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর বান্ধার উপর কেতাব নাজেল করেছেন। এই বিষয়টি আরও রহস্যপূর্ণ। কারণ, আল্লাহর বান্ধাতে পরিণত হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আল্লাহর বান্ধার উপর যেমন কেতাব নাজেল করা হয়, তেমনি আল্লাহর বান্ধাকে মেরাজের মাধ্যমে সৃষ্টিরাজ্যের শেষ প্রাপ্ত সিদ্দরাতুল মুনতাহা ডিঙিয়ে লা-মোকামে নিয়ে যায়। আল্লাহর এই নাজেল করা কেতাবটিকে কি কাগজ আর কালিতেই আটকিয়ে রাখা যায়, নাকি জাবালুন নুর পর্বতের আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত হেরা গুহার মতো স্থানে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ রহমতে লাভ করা যায়? ধ্যানসাধনা ছাড়া বইপড়া এলেম দিয়ে এই রহস্যপূর্ণ কেতাবের সামান্যতম অংশটিও বুঝবার কোনো ব্যবস্থাপত্র আছে কি না, অধম লিখকের জানা নাই। দুনিয়ার বৈষয়িক বিষয়সমূহ নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণার পর গবেষণা করেই নুতন-নুতন জিনিস মানবজাতিকে উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে সাধারণ

বৈষয়িক জ্ঞানের প্রশ্নে গবেষণা অবশ্যজ্ঞাবী, সেখানে আল্লাহর এই কেতাব-জ্ঞানের রহস্য নির্জনে একাকী বছরের পর বছর ধ্যানসাধনা না করে কেমন করে জানা যায় ইহা অধম লিখকের জ্ঞানা নাই। বই পড়ে যে-জ্ঞানটি অর্জন করা যায় উহার দ্বারা অনেক রকম কথার মারপ্যাচ শেখা যায়, কিন্তু সত্যসাগরে অবগাহন করা যায় না। তাই একটি কথা পাঠকদেরকে বলতে চাই, আর সেই কথাটি হলো, আপনারা কোনো দিন মৌল্লা দিয়ে মুহম্মদ (সা.)-এর বিচার করতে যাবেন না। এতে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবার সম্ভব বিপদ অপেক্ষা করে। তেমনি যাজক দিয়ে যিশুখ্রিস্টকে বিচার করতে যাবেন না। কারণ, যাজক আর যিশুখ্রিস্ট কখনোই এক নন। যদি করতে যান তা হলে এতে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবার সম্ভব বিপদ অপেক্ষা করে। তেমনি খাদেম দিয়ে খাজা বাবাকে বিচার করতে গেলে বিরাট ভুল করে বসবেন। কারণ, খাদেম খাদেমই আর খাজা বাবা খাজা বাবাই। তেমনি পাণ্ডা-পুরোহিত দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর মহাদেবকে বিচার করতে গেলে মারাত্মক ভুল করবেন।

মহানবির উপর যে কেতাব নাজেলের কথাটি বলা হয়েছে, ইহাতে কাগজ আর কালির কথাটি বলা হয় নি। কারণ, আল্লাহর এই কেতাব নুরময় কেতাব। এই নুরময় কেতাবটিকে ধরে রাখার জন্য কাগজ আর কালির ব্যবহার ছাড়া সম্ভবপর নয়। তাই কাগজের উপর কালি দিয়ে ভাষার মাধ্যমে যে-কেতাবটি আমরা পাই উহাও মহাপবিত্র। এই মহাপবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমেই কেহ আল্লাহর রহস্যে ভুব দিতে পেরেছেন, কেহ পারেন নি। পারাটাও তকদির, না পারাটাও তকদির। সূতরাং, চরম পর্যায়ে অবস্থান করতে গিয়ে দেখতে পাবেন, আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে বিদুমাত্রণ্ড ভুলের অবকাশ নাই।

২. কাইয়্যিমান (অবদ্ব, যাহা বাঁকা নয়, ঋজু, সোজা, সিধা, সরল, সরাসরি, সোজাসুজি, খাড়া, অকপট ও সৎ, ন্যায়পরায়ণ, সুষম) লিইউন্জিরা (সতর্ক করিবার জন্য, যেন সাবধান করিতে পারেন, অবহিত করিবার উদ্দেশে, ইশিয়ার করিতে) বাসান্ (ভয়, আতঙ্ক, আশঙ্কা, মহা আতঙ্ক, ভীতিপ্রদ বা ভয়ঙ্কর কিছু, সম্ভ্রাস) শাদিদাম্ (শক্ত, মজবুত, পাক্কা, কঠিন, ভয়ঙ্কর, ভীষণ, দোঁর্দণ্ড, শোচনীয়) মিন্ (হইতে) লাদনহ্ (তাহার [আল্লাহর] দিক হইতে, তাহার [আল্লাহর] পক্ষ হইতে) ওয়া (এবং) ইউবাস্শিরাল (সুসংবাদ দিতে, সুখবর দিবার জন্য, সুবার্তা জানাইবার উদ্দেশে, সুসমাচারি জানাইতে) মুমিনিনা (মোমিনদেরকে [আমানুদেরকে নয়]) অলিলাজিনা (যাহারা) ইয়ামালুনাস্ (আমল করে, কাজ করে) সালিহাতি (উত্তম, শুভ, ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ, সৎ, যথাযথ, ঠিক, পক্ষপাতহীন) আননা (অবশ্যই, নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে) লাহম্ (তাহাদের জন্য) আজ্জান্ (পুরস্কার, পারিতোষিক, প্রতিদান, বকশিশ) হাসানান্ (উত্তম, অতিশয় ভালো, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, উন্নত, সর্বপ্রধান)

প্ট (ইহাকে করিয়াছেন [ইহাকে করিয়াছেন অথবা তাহাকে করিয়াছেন এই দুটি শব্দবন্ধ এই আয়াতে নাই, ইহা বাক্য মিলানোর জন্য আমাদের বানানো মনগড়া শব্দ]) সোজাসুজি, তাহার পক্ষ হইতে ভীষণ আশঙ্কা হইতে সতর্ক করিবার জন্য এবং মোমিনদেরকে সুসংবাদ দিতে যাহারা উত্তম আমল করে, নিঃসন্দেহে তাহাদের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

৩. মাকিসিনা (তাহারা অবস্থানকারী, তাহারা অধিবাসী, তাহারা বসবাসকারী, তাহারা বাসিন্দা) ফিহি (ইহার মধ্যে) আবাদান (সব সময়, দীর্ঘস্থায়ী)।

প্ট তাহারা বসবাসকারী ইহার মধ্যে সব সময়।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে মানুষের মন হতে সকল প্রকার বন্ধতা ও বিভ্রান্তির জটাজালগুলো ঝেড়ে ফেলে দেবার আশ্বানটি জানানো হয়েছে। এই বন্ধতা, এই বিভ্রান্তির জটাজালগুলো কেমন করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত হওয়া যায়? ইহা কথার কথায় মনে হয় অতি সহজ, কিন্তু প্রয়োগের প্রশ্নে ইহা একটি যুদ্ধ করার মতো জটিল সমস্যা বলে মনে হবে। কেন? এই বিভ্রান্তি, এই জটিলতা মনের মাঝে কে জাগিয়ে তোলে? কে বন্ধতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়? কে বিভ্রান্তির জটাজালে মানুষটিকে আর্চেপুর্ন্ত বেঁধে ফেলতে চায়? তার পরিচয়টি তো সর্বপ্রথম জেনে নিতে হবে – অন্যথায় বিষয়টির সমাধান খুঁজতে গিয়ে লেজে-গোবরে অবস্থায় পরিণত হতে পারেন, হতে পারেন গাছের শেকড় কেটে গাছের মাথায় পানি ঢালার মতো। মূল বিষয়টি জানা নাই, অথচ বিষয়গুলোর মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সাতার কাটা। সে কে, যে আমাদেরই মাঝে বসবাস করে আমাদেরই প্রতিনিয়ত ধোঁকা দিয়ে চলেছে, আমাদেরই প্রতারণার ফাদে ফেলে দিতে চাইছে? সে আর কেহই নয়, একমাত্র শয়তান ছাড়া। এই শয়তানের চারটি নাম : শয়তান, ইবলিস, মরদুদ এবং খাল্লাস। সে এই চারটি রূপ ধারণ করে মানুষকে বন্ধতার দিকে, বিভ্রান্তির মধ্যে প্রতিনিয়ত ডুবিয়ে রাখতে চায়। তাই এই বন্ধতার পথটি পরিত্যাগ করতে চাইলে শয়তানের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই যুদ্ধ জাগতিক তরবারি, জাগতিক অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র দিয়ে নয়, বরং মহানবির হেরা গুহায় নির্জনে পনেরটি বছর ধ্যানসাধনার মতো ধ্যানসাধনার মাধ্যমে জয়লাভ করতে হয়। এই ধ্যানসাধনার যুদ্ধটিকে এড়িয়ে গেলে, অবহেলা করলে, পাঠা দিতে না চাইলে পরিণতিটি হয় দুঃখজনক। বন্ধতার স্রষ্টাকে তাড়িয়ে না দিয়ে বন্ধতার কথাগুলো বলা আর না বলা একই কথা। সুতরাং, মূলে আঘাত না করে পলুবঘ্নাহিতার আশ্রয় গ্রহণ করাটি বোকার স্বর্গে বাস করার নামান্তর। তাই একজন মানুষ যখন ধ্যানসাধনার ধৈর্যধারণের প্রতিজ্ঞা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে তখন অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে যে, সে নফসে আশ্রয় হতে নফসে লাউয়াম্মার মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে। নফসে লাউয়াম্মা তথা সংগ্রামরত নফস তথা যুদ্ধরত নফসটি বছরের পর বছর ধ্যানসাধনায় মশগুল থেকে তথা দায়েমি সালাতের মধ্যে ডুবে থেকে আল্লাহর বিশেষ রহমতটি আল্লাহর রহিম-রূপের কাছ থেকে পেলেই নফসে মোৎমায়েন্নার রাজ্যে অবস্থান করতে পারে। এই নফসে মোৎমায়েন্নার অধিকারী মানুষটিকেই আল্লাহ জাল্লাতে প্রবেশ করার আশ্বানটি জানান। কারণ, নফসে মোৎমায়েন্নার মাঝে শয়তান অবস্থান করতে পারে না এবং নফসে মোৎমায়েন্নার মধ্যে শয়তানকে অবস্থান করার বিধানটি দেওয়া হয় নি। ইহাকেই উত্তম আমল বলা হয়েছে এবং এই আমলের দ্বারা শয়তানকে পরিত্যাগ করতে পারলেই মোমিনে পরিণত হবার সুসংবাদটি এই আয়াতে দান করা হয়েছে এবং একটি পুরস্কার পাবার কথাটিও এই আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেই পুরস্কারটিকে উত্তম পুরস্কার বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

দুনিয়ার বস্তু ততদিনই একটি মানুষের কাছে বন্ধন-রূপে অবস্থান করে, যতদিন শয়তান তার চারটি রূপ ধরে অবস্থান করে। সুতরাং, শয়তানমুক্ত মোমিনের কাছে দুনিয়ার কোনো আকর্ষণই আর আকর্ষণ থাকে না। সুতরাং, মোমিনের কাছে দুনিয়ার বস্তুসমূহ কখনোই বন্ধন-রূপে অবস্থান করে না। সুতরাং, বস্তু তখনই মোহের বন্ধন তৈরি করে যখন শয়তান অবস্থান করে। এই শয়তানকেই পূর্বে কামনা, মায়াবাদ, ষড়রিপুর বন্ধন ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হতো। আসলে, কোনো বস্তুই বন্ধন হতে পারে না যতক্ষণ সেই বস্তুর উপর কামনা না থাকে। সুতরাং, কামনাই বস্তুকে বন্ধন-রূপে তুলে ধরে। সুতরাং, মোমিন তিনিই, যিনি এই কামনার বন্ধন হতে মুক্ত হতে পেরেছেন। এই

কামনাই দুনিয়ার কর্মণ্ডলোকে কলুষিত করে ফেলে। সুতরাং, কামনাই বন্ধন, বস্তু মোটেও বন্ধন নয়। আবার, আরও মজার কথাটি হলো এই যে, এই শয়তানের চারটি রূপ আল্লাহর সৃষ্টির রাজ্যের কোথাও অবস্থান করে না, অবস্থান করে মাত্র দুইটি স্থানে : একটি জিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। এই অন্তর বিহনে শয়তানকে অন্য কোথাও অবস্থান করার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই। সুতরাং, সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য তোহিদে বাস করে – কেবলমাত্র মানুষ আর জিনের অন্তর দুটি ছাড়া। অন্য জীবগুলো দেখতে যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, যত মারাত্মকই হোক না কেন, যত ক্ষতিকারকই হোক না কেন – কিন্তু শয়তানের অবস্থানটি নাই। ইহাই কোরান-এর বিজ্ঞানময় অপূর্ব ঘোষণা। কেউ বুঝতে পারে, আবার কেউ বুঝতে পারে না। কেউ বুঝতে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, আবার কেউ চেষ্টা করে কামিয়াব হয়। ব্যর্থ হওয়াটাও তকদির, কামিয়াব হওয়াটাও তকদির। সুতরাং, চরম সত্যে, আল্লাহর সৃষ্টির এই ছুটে চলার বিকাশমান ধারাসমূহের মধ্যে কিছুমাত্র ভুল নাই। ভুলের অবস্থান আমাদের দৃষ্টিতে, ক্রটির অবস্থান আমাদের দর্শনে ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ এই মায়ারূপী কামনা, এই খান্নাসরূপী শয়তানের অবস্থানটি থাকে। এই অবস্থান হতে মুক্তি পেলেই, কোরান বলছে ‘মাকিসিনা’, তথা ‘তাহারা বসবাসকারী’ ইহার মাঝে সব সময়।

৪. ওয়া (এবং) ইউনজিরা (সতর্ক করা, বিপদের সঙ্কেত জ্ঞাপন করা, অমঙ্গলের সঙ্কেত জ্ঞাপন, আদেশ জানানো, সাবধান করা, শাস্তির ভয় দেখাইয়া আদেশ দেওয়া) আল্লাজিনা (যাহারা) কানু (বলে) ইত্তাখাজা (গ্রহণ করিয়াছেন, পছন্দ করিয়াছেন) আল্লাহ (আল্লাহ) ওয়ালাদান (সন্তান, অপত্য, পুত্র বা কন্যা, বংশধর, অবিচ্ছেদ্য ধারা, বিস্তার)।

প্ট এবং সাবধান করো, যাহারা বলে আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন সন্তান।

৫. মা (না) লাহম (তাহাদের জন্য) বিহি (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহা দিয়া) মিন (হইতে) ইলমিন (জ্ঞান) ওয়া (এবং) লা (না) লিআবাইহিম (বাপ-দাদাদের জন্য, পূর্বপুরুষের জন্য, পিতৃপুরুষেরা),

প্ট তাহাদের জন্য ইহা হইতে জ্ঞান নাই এবং না বাপ-দাদাদের জন্য,

+ কাবুরাত্ (কঠিন, দুঃখদায়ক, গুরুতর, ভয়ানক, সাজ্জাতিক, শোচনীয়, নিদারুণ, যন্ত্রণাদায়ক) কালিমাতান (কথা, উক্তি, বচন, মত, কথকতা, বিষয়, আলাপ) তাখরুজু (বাহির হয়, নির্গত হয়, নিঃসৃত হয়, উৎসারিত হয়, উৎপন্ন হয়, উদ্ভিত হয়) মিন (হইতে) আফওয়াহিহিম (তাহাদের মুখগুলি, তাহাদের মুখ)

প্ট ভয়ানক কথা বাহির হয় তাহাদের মুখ হইতে।

+ ইন্ (যদি, না, যদি না, অবশ্যই) ইয়াকুলুনা (তাহারা বলে) ইল্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত) কাজিবান্ (মিথ্যা, মিথ্যাভিষণ, প্রতারণা, ছলনা)।

প্ট তাহারা মিথ্যা ব্যতীত বলে না।

১ ব্যাখ্যা : এই চার ও পাচ নম্বর আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে দেখা যায়, প্রথমেই বলা হয়েছে যে-কথাটি, সেই কথাটি একটি খণ্ডিত কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, বরং সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য, আর সেই কথাটি হলো – আল্লাহ কখনোই কোনো সন্তান গ্রহণ করেন না এবং করার প্রশ্নই ওঠে না। প্রশ্ন তখনই উঠত যদি আল্লাহর জাত-রূপের মধ্যে নফসটিরও অবস্থান থাকত – যেহেতু নফস সন্তান জন্ম দেয়, তা সেই নফস নিম্ন হতে যত উঁচুতেই অবস্থান করুক না কেন। যেহেতু আল্লাহর মধ্যে কোনো নফসেরই অবস্থানটি কোথাও কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না, সেই হেতু আল্লাহর সন্তান গ্রহণ করার প্রশ্নটিও

অবাস্তব এবং একটি ডাঁহা মিথ্যা কথা। এই বিষয়টি এতই সূক্ষ্ম একটি বিষয়, যেখানে এসে অনেক বড়-বড় সাধকেরাও তালগোল পাকিয়ে ফেলেন।

একটি পবিত্র নফসের উপর আল্লাহর আগমনটি হলেও আল্লাহ আল্লাহই এবং নফস নফসই। আল্লাহর বিশাল প্রভাবে অনেক সময় একটি পবিত্র নফস এমনভাবে হারিয়ে যায় যে, নফসটিকে খুঁজে আর বের করা যায় না। তখন সেই নফস হতেই শব্দ বেরিয়ে আসে : ‘আনাল হক’ অথবা ‘আনা সুবহানি মা আজামুশশানি’ কিংবা ‘সোহহম সোহমি’ – তখনই সাধারণ নফসগুলো মনে করতে চায় যে সেই হারিয়ে যাওয়া নফসটি কথাগুলো ঘোষণা করছেন – আসলে আল্লাহর কথা আল্লাহই বলেছেন এবং সেই পবিত্র নফসটি কেবলমাত্র আল্লাহর বাহনের ভূমিকা পালন করেন। এই আল্লাহর বাহনের ভূমিকাটি পালন করার জন্যই জগতের সমস্ত নফসগুলোকেই যুগে-যুগে, কালে-কালে মুনি-খাম্বা-সাধু-সন্ত-আবদাল-ওলি-গাউস-কুতুব-আরিফদের মাধ্যমে আল্লাহ আস্তান জ্ঞানারছেন।

আবার, এ-রকম পবিত্র নফসের অধিকারীদেরকে লক্ষ করে আল্লাহ এমন সব কথা বলেছেন যে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। যেমন, আল্লাহর পবিত্র বাক্যের জিস্মাটি আল্লাহর জিস্মায় পরিণত হয়, হাত দু’টি আল্লাহর হাতে পরিণত হয় – ইত্যাদি। এই পরিণত হওয়ার মধ্যেই অতীব একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য থেকে যায় – সেই পার্থক্যটি কেবলমাত্র যারা আল্লাহর নুরে নুরময় হয়ে গেছেন তারাই বুঝতে পারেন, অন্যদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই বোঝা সম্ভবপর নয়। কারণ, অন্যান্য সাধারণ নফসগুলো কথার গবেষণা করেছেন, কিন্তু ধ্যানসাধনার গবেষণায় প্রবেশ করেন নাই। সুতরাং, যে-সকল পবিত্র নফসগুলো আল্লাহর নুরে নুরময় হতে পেরেছেন তাঁদের দেহগুলো যে-স্থানে রাখা হয় সেই স্থানগুলোকে ‘মাজার’ অথবা ‘রওজা’ বলা হয়। সুতরাং, যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, তারা ডাঁহা মিথ্যুক। কারণ, সন্তান জন্ম দেবার প্রক্রিয়াটি আল্লাহর জাতের মধ্যে রাখা হয় নাই। আল্লাহর উপর এই রকম জঘন্য অপবাদ দেওয়া হয় ইহা তাদের পিতৃপুরুষদের জ্ঞান ছিল না, তাই ইহা একটি গুরুতর এবং সাজ্যাতিক কথা এবং একটি ডাঁহা মিথ্যা কথা।

৬. ফালাআল্লাকা (সুতরাং সম্ভবত আপনি) বাখিউন্ (দুঃখভোগকারী) নাফসাকা (আপনার নফস [রহস্যাক] বলা হয় নাই, কারণ রহস্য প্রাণ নয়, বরং আল্লাহর আদেশ) আলা (উপর) আসারিহিম (তাহাদের চিহ্ন, তাহাদের পদচিহ্ন) ইন্ (যদি) লাম (না) ইউমিনু (তাহারা ইমান আনে) বিহাজাল (ইহার সহিত) হাদিসি (কথা) আসাফান (দুঃখ, তীব্র শোক, মর্মযন্ত্রণা, কষ্ট, মর্মপীড়া, ক্লোভ, মনস্তাপ)।

সুতরাং সম্ভবত মর্মযন্ত্রণায় দুঃখভোগকারী আপনার নফস, তাহাদের চিহ্নের উপর, যদি না তাহারা ইমান আনে এই কথার সহিত।

৭. ইননা (নিশ্চয়ই [আমরা]) জাআলনা (আমরা করিয়াছি, আমরা বানাইয়াছি, আমরা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি) মা (যাহা) আলাল (উপর) আরদি (জমিন, মাটি, পৃথিবী, দেহ) জিনাতান (ঐচ্ছল্য, চাকচিক্য, আকর্ষণীয়তা, শোভা, সৌন্দর্য, কাস্তি, বাহার) লাহা (তাহার জন্য) লিনাবলুওয়াহম (আমরা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদেরকে) আইউহম (তাহাদের মাঝে কে) আহসানু (শ্রেষ্ঠ, উত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট) আম্মালান (আমল)।

সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] করিয়াছি যাহা পৃথিবীর উপর তাহাকে সুন্দর, আমরা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদেরকে, তাহাদের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ আমল (করে)।

৮. ওয়া (এবং) ইননা (নিশ্চয়ই আমরা) লাজায়িলুনা (অবশ্যই পরিণত করি, অবশ্যই পরিপক করি, অবশ্যই অবস্থার পরিবর্তন করি, অবশ্যই রূপান্তরিত করি, অবশ্যই ভিন্ন অবস্থায় লইয়া যাই) মা (যাহা) আলাইহা (তাহার উপর) সাইদানু (মাটি, ভূমি, জমি, ভূপৃষ্ঠ, মৃত্তিকা) জরুজানু (খালি ময়দান, বৃক্ষহীন মাঠ, উদ্ভিদহীন প্রান্তর, উষর ভূমি, অনুর্বর জমি, মরুময় ক্ষেত্র)।

প্ট এবং নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] অবশ্যই পরিণত করি যাহা মাটির উপরে (আছে তাহাকে) খালি ময়দান।

১ ব্যাখ্যা : এখানে প্রথমেই নবি-রসুলদের এবং মহানবিকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলছেন যে, সাধারণ মানুষেরা সহজে বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না। কারণ, সমাজের প্রচলিত চিন্তাধারার উপর যখন সত্যের আঘাত আসে তখন সত্যটি জ্ঞানবার পরেও সবার পক্ষে গ্রহণ করে নিতে কষ্ট হয়। তাই নবি-রসুল এবং মহানবিকে পর্যন্ত এই বিষয়ে দুঃখ প্রকাশের বদলে ধৈর্যধারণ করাটাকেই আল্লাহ শ্রেয় মনে করছেন। সত্যকে গ্রহণ করে নিতে না চাইলে সত্যের ধারক ও বাহক যে-কোনো নবি-রসুলের দুঃখ পাবারই কথা। সমাজ-জীবনের বিষয়গুলো সেই সময়, সেই পরিবেশে, সেই পরিস্থিতিতে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই সত্যের আঘাতগুলো সহ্য করতে পারতো না বলে গ্রহণ করে নিতে চাইত না। তাই আপন-আপন পবিত্র নফসটির মর্মযন্ত্রণায় দুঃখ পাওয়াটা স্বাভাবিক।

আল্লাহ বলছেন, এই পৃথিবীকে সৌন্দর্যের রূপমাধুর্য দিয়ে তৈরি করেছি। সুতরাং, মানুষের এই পৃথিবীর রূপমাধুর্যের প্রলোভনে পড়াটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এবং এই প্রলোভনের খপ্পরেই বেশিরভাগ মানুষ পড়ে যায়। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না যে, পৃথিবীর এই সৌন্দর্যের রূপমাধুর্যগুলো কেবলমাত্র পরীক্ষা করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর এই রূপমাধুর্য সবাইকেই কম-বেশি অভিভূত করে এবং অভিভূত করাটাও একটি সুন্দর মতাদর্শ। কিন্তু, প্রলোভনে পড়ে যাওয়াটা মতাদর্শ হতে পারে না। মানুষকে কে প্রলোভনের শিকারে পরিণত করে? খাল্লাসরূপী শয়তানের মায়াজাল, যাহা আপন-আপন নফসের মধ্যেই অবস্থান করে তারই মন্ত্রণা। সুতরাং, পৃথিবীর সৌন্দর্যের রূপমাধুর্যের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেওয়া এক বিষয় এবং এর প্রলোভনে পড়ে যাওয়াটা সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। একই বিষয়, কিন্তু দর্শন দুই রকম : একটি ইতিবাচক দর্শন, অপরটি নেতিবাচক দর্শন। ইতিবাচক দর্শনের দিকে তারাই ধাবিত হতে পারে যারা শ্রেষ্ঠ আমলের পক্ষাবলম্বন করে তথা যারা আপন নফসে প্রলোভনের যে-মায়াটি জড়িয়ে আছে উহা হতে পরিত্রাণের আমলে ব্যাপ্ত থাকে। এক কথায়, ঘুরেফিরে একটিমাত্র দর্শনের কথাই বলা হচ্ছে, অখচ ভাষার ব্যবহার, পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যবহার এবং ঐতিহাসিক কারণগুলো উত্থাপন করা কত ব্যাপক, কত বিস্তৃত, কত বিরাট প্রসারিত। মনে হয়, কত বিরাট-বিরাট বিষয় হতে বিষয়াস্তরে সাতার কেটে

চলছি : আসলে একটিমাত্র মূল দর্শনের দিকে আমাদেরকে বারবার বহু রকমে, বহু ভাষার শৈলীতে, বহু রঙ-চঙের উপমায়ে আন্তরিক জানানো হচ্ছে।

কে এই উত্তম আমলের দিকে এগিয়ে গিয়েছে অথবা এগিয়ে যায়, আর কে এই উত্তম আমলের ধারই ধারণে না, ইহার বিচারটি কে করবে? কেমন করে এই উভয়ের পার্থক্যটি বুঝতে পারব? এক কথায়, এই বিষয়টি অন্যের দ্বারা বুঝবার উপায় নাই। ইহার বিচারের ভারটি সম্পূর্ণরূপে নিজের উপরই নিতে হবে। নিজেই নিজের বিচার করে দেখতে হবে, কীটুকু উত্তম আমলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং, আল্লাহর এই পরীক্ষা একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং উত্তম আমল করাটিও একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সুতরাং, ভবের নাট্যশালায় নিজেকে চেনা দায় বলে যে বা যিনি বুঝতে চাইবে সে-ই উত্তম আমলের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে।

৯. আম্র (কি) হাঙ্গিবতা (তুমি মনে করিয়াছ, তুমি বুঝিয়াছ) আননা (যে) আস্হাবান (অধিবাসী, নিবাসী, বাসিন্দা, বসবাসকারী) কাহফি (গুহা, গিরি গুহা, গম্বর, পর্বতকন্দর, গুপ্ত বা নির্ভুত স্থান, অন্তরতম প্রদেশ) ওয়া (এবং) বাকিমি (খোদাই বা খচিত লিপি, গ্রন্থভুক্ত বা তালিকাভুক্ত, উৎসর্জন, অস্ত্র লিখন, অস্ত্রলেখ, শিলালিপি-মুদ্রালিপি-তাম্রিলিপি ইত্যাদি) কানু (ছিল) মিন্ (হইতে) আয়াতিনা (আমাদের আয়াতসমূহ, আমাদের পরিচয়প্তি, আমাদের নিদর্শনাবলি) আজাবান (বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক, অলৌকিক ব্যাপার, আজব ব্যাপার, অদ্ভুত)।

স্ট আপনি কি মনে করিয়াছেন যে কাহাফের অধিবাসীরা এবং খোদিত লিপি ছিল আমাদের আয়াতসমূহ হইতে আশ্চর্যজনক?

১০. ইজু (যখন, যে-সময়, যেহেতু) আওয়ালু (বাস করিল, বাসা লইল, স্থান গ্রহণ করিল, আশ্রয় লইল, অবলম্বন করিল) ফিতইয়াত (কয়েকজন যুবক, যুবকগণ) ইলাল (দিকে, সঙ্গে, পর্যন্ত) কাহফি (গুহায়) ফাকালু (সুতরাং তাহারা বলিলেন) রাব্বানা (হে আমাদের রব, হে আমাদের প্রতিপালক, হে আমাদের সদাপ্রভু) আতিনা (আমাদেরকে দাও) মিন্ (হইতে) লাদুনকা (তোমার পক্ষ) রাহমাতান (রহমত) ওয়া (এবং) হাইয়ি (ঠিক কর) লানা (আমাদের জন্য) মিন্ (হইতে) আমরিনা (আমাদের আদেশ, আমাদের কর্ম, আমাদের কাজ) রাশাদান (সঠিকভাবে, সোজাভাবে, নির্ভুলভাবে, যথাযথভাবে, ন্যায়সঙ্গতভাবে, স্বচ্ছতা, মঙ্গল, পথপ্রাপ্তি, নির্ভুলতা)।

স্ট যখন আশ্রয় লইলেন কয়েকজন যুবক কাহাফের (গুহার) দিকে সুতরাং তাহারা বলিলেন, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দাও তোমার পক্ষ হইতে রহমত এবং ঠিক করো আমাদের জন্য আমাদের কাজ হইতে নির্ভুলতা।

১১. ফাদারাবনা (সুতরাং আমরা [আল্লাহ] আঘাত করিয়াছি, আমরা [আল্লাহ] মোহর মারিয়া দিয়াছি, সুতরাং আমরা বলিয়া দিয়াছি, সুতরাং আমরা শুনাইয়া দিয়াছি, সুতরাং আমরা বয়ান করিয়াছি) আলা (উপর) আজানিহিম্ (তাহাদের কানগুলি) ফিল্ (মধ্যে) কাহফি (কাহাফে, গুহায়) সিনিনা (বহর) আদাদান (কয়েক)।

স্ট সুতরাং আমরা [আল্লাহ : বহুবচনে বলা হয়েছে] আঘাত করিয়াছি তাহাদের কানগুলির উপর কাহাফের মধ্যে কয়েক বহর।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াত তিনটি হতে কাহাফবাসীদের অধ্যাত্মজগতের বিস্ময়কর রহস্যের কিছুটা মৌখিকভাবে জানতে পারলাম, যদিও মৌখিকভাবে জানবার বিষয়টি মোটেও সত্যিকার জানা নয়। সত্যিকারভাবে কাহাফবাসীর রহস্যগুলো জানতে হলে কাহাফবাসীর মতো পরিবেশে ধ্যানসাধনা করা ছাড়া সম্ভবপর নয় - অর্থাৎ, আল্লাহর দেওয়া দায়েমি সালাত তথা সর্বক্ষণ আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেই এগিয়ে যেতে হয় এবং তখনই কাহাফবাসীর অনেক রহস্যের মধ্যে কিছুটা অনুধাবন করা সম্ভবপর। নতুবা বই পড়ে এই রহস্যের কিছুই বোঝা যাবার কথা নয়। রহস্যলোকে প্রবেশ করা বিহনে রহস্যের বর্ণনা দেওয়াও একটি মৌখিক বিষয়। এই মৌখিক বিষয় দিয়ে সত্যসাগরে অবগাহন করা যায় না।

আপন-আপন নফসের সঙ্গে যে খান্নাস-রূপী শয়তানের কত রকম রঙ-চঙ প্রকাশ পায় সেই রঙ-চঙগুলোকে তাড়িয়ে দিতে হলে এই কাহাফবাসীর মতোই ধ্যানসাধনা করার আস্তানটি জানানো হয়েছে। কাহাফবাসীরা আল্লাহর কাছে বারবার ফরিয়াদ করেছেন। সেই ফরিয়াদের সঙ্গে কাহাফবাসীদের ছিল বিরাট একটি ধৈর্যধারণের ক্ষমতা। বাহিরের জগৎ হতে এই কাহাফবাসীরা এতটাই বিচ্ছিন্ন ছিলেন যে তিনশত নয়টি বহর ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকার পরেও কতটুকু সময় অতিবাহিত হয়েছে তাহা বুঝতে পারা যায় নি। এ-জন্যই ভাষার শৈলীতে

বলা হয়ে থাকে যে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুম যে-রকম মানুষকে সব রকম বৈষয়িক সংযোগ হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে তেমনি কাহাফবাসীদের তিনশত নয় বছরের ধ্যানসাধনাটিকে ঘুমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কাহাফবাসীদের কাহাফে প্রবেশ করাটা সত্যিই একটি বিস্ময়কর ঘটনা, কিন্তু এই বিস্ময়কর ঘটনাটি হলো সাধনার প্রথম পদক্ষেপ। পরিপূর্ণতা তখনই হয় যখন নিজের নফসের কাছেই রুবরূপী রব পরিপূর্ণরূপে নিজের মধ্যেই জাগ্রত হয় এবং তখনই আর নিজেকে আলাদাভাবে খুঁজে পায় না। তখনই আপন পবিত্র নফসটি রবরূপী আল্লাহর নুরে নুরময় হয়ে একাকার হয়ে যায়। এদেরকেই আল্লাহ আবদাল-আরিফ-মুনি-খামি ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং, কাহাফবাসীরা এবং খোদিত লিপিগুলো যদিও বিস্ময়কর তথাপি সবটাইতে বেশি বিস্ময়কর হতে পারে তখনই, যখন রবরূপী আল্লাহর নুরে নুরময় হয়ে একেকটি নিদর্শনরূপে পরিচিত হয়ে ওঠে। কাহাফে প্রবেশ করা এবং খোদিত লিপি সত্যিই বিস্ময়কর, কিন্তু এই বিস্ময়কর বিষয়টি প্রথম পদক্ষেপ আর রবরূপী আল্লাহর নুরে নুরময় হয়ে যাওয়াটা হলো আল্লাহর একেকটি নিদর্শন। সুতরাং, নিদর্শনরূপে পরিগণিত হওয়াটাই মুখ্য বিষয়, যদিও গোণ বিষয় অগ্রযাত্রা আর খোদিত লিপি তথা ওজিফা পাঠ, আল্লাহর গুণগানে মগ্ন থাকা আর সমাপ্তির নিদর্শনটি হলো আল্লাহর নুরে নুরময় হয়ে যাওয়া।

কাহাফে প্রবেশ করার সময়েও খান্নাসরূপী শয়তানটি সাধকের সঙ্গেই থাকে, কিন্তু ধ্যানসাধনা এবং আল্লাহর বিশেষ রহমত পাবার পরে খান্নাসরূপী শয়তান হতে মুক্ত হতে পারলেই আল্লাহর আদ-দ্বীনের রাজ্যে অবস্থান করে। ভাষা এবং শব্দের বিভিন্নতা থাকতে পারে, সাধকদের দেশ-কাল-পাত্রের বিভিন্নতায় বিভিন্ন রকম ভাষা থাকতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়টি হলো আল্লাহর নুরে নুরময় হয়ে যাওয়া তথা আদ-দ্বীনের মাঝে অবস্থান লাভ করা।

জীবদ্দশায় যে-সাধকেরা ধ্যানসাধনার আঘাত খেতে-খেতে আপন সত্তায় মিশে থাকা খান্নাসটিকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে পেরেছেন তারা সত্যিই ভাগ্যবান। এটাকেই অন্য ভাষায় বলা হয়ে থাকে মরার আগে মরে যাওয়া। এই কাহাফবাসীগণ ইহারই একটি অন্যতম নিদর্শন। এই কাহাফে অবস্থানকারী সাধকদের কথাবার্তা, চালচলন সাধারণ মানুষদের পক্ষে বোঝা তো অনেক কষ্টকর বটেই এমনকি দুনিয়ার বৈষয়িক জ্ঞানে জ্ঞানীরাও এদের রহস্য বুঝে উঠতে পারে না। তখনই বৈষয়িক জ্ঞানে জ্ঞানীরা অনেক ডিজাইনের অনেক রকম টিল ভুড়তে থাকেন। ঢাকা শহরের চান খাঁর পুলের নিকটেই বোরহান উদ্দিন কলেজসংলগ্ন একটি টেলিফোনের খান্নার পাশে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতেন করিম মাস্তান। কাপড় থাকা তো দূরে থাক, সমগ্র শরীরে একটি সুতাও থাকতো না, অথচ মাঝে-মাঝেই তিনি বলে ফেলতেন, ‘আমিই শাহেন শাহ’। বৈষয়িক জ্ঞানে গিজগিজ করা এই অধম লেখকই এহেন কথাটি শুনে একদিন মনে মনে হেসেছিলাম আর মনে মনে বলেছিলাম : ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দারেরও শরীরে কাপড় আছে, আর তোমার শরীরে তো একটি সুতাও নাই, তা হলে তুমি কেমন করে বলছ যে ‘আমিই শাহেন শাহ’? নিয়তির নির্মম পরিহাস, বেশ কয়েক বছর পর ঢাকা শহরে এমন শৈত্যপ্রবাহ হলো যে তাপমাত্রা রাতের বেলায় সাত-আটে নেমে এলো। এত নিম্নতাপমাত্রা সাধারণত শ্রীমঙ্গলে আর রাজশাহীতেই দেখা যায়। আর আমি অধম লেখক খিপিস স্যুট পরেও ঘ্রীর কাছে একটি কাশ্মীরী শাল চেয়ে নিলাম এবং তিন ব্যাটারির এভারেডি টর্চলাইট ও সেই দিনের তিব্বত কোম্পানির তিনটি চান্দা ব্যাটারি টর্চলাইটে ভরে করিম মাস্তানকে দেখতে গেলাম। করিম মাস্তান একটি নিম্নগাছের গোড়াতে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি

ভক্তিসহকারে শুধু একটি কথাই করিম মাস্তানকে শুনিয়ে দিলাম (যদিও তিনি কথা বলতেন না) : হজুর, দুনিয়ার যত বড় শাহেন শাহই হোক না কেন, এই প্রচণ্ড শীতে খুব কম হলেও এক টুকরা কাপড় তার শরীরে শোভা পাবেই; কিন্তু আজ মনে-প্রাণে বুঝতে পারলাম, আপনি শাহেন শাহদেরও শাহেন শাহ। ওই একই অবস্থায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার গনি শাহ বাবাও লোকের মাঝে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়ই থাকতেন। সুতরাং, বৈষয়িক বিদ্যার বঙ্ক আটনিতে অনেক কথা বলা যায়, অনেক কিছু লেখা যায়, অনেক রকম যুক্তিতর্ক দাঁড় করানো যায়, আসলে যে সবই ফসকা গেরো এই কথাটি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে অসহায়ের মতো বুঝতে হয় এবং তখন চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

কাহাফবাসীদের এই অলৌকিক ঘটনাসমূহ যত অলৌকিক বলেই চালিয়ে দিই না কেন, আসলে ইহা বিজ্ঞান বহির্ভূত আরেকটি বিজ্ঞান। কেউ বুঝতে পারে এবং মেনে নেয়। এই বোঝাটা এবং মেনে নেওয়াটা তকদির। কেউ বুঝতে পারে না এবং মেনেও নেয় না – ইহাও তকদির। এই তকদিরের বলয় কেবল তখনই ভাঙা যায় যখন আল্লাহর বিশেষ রহমতটি বর্ষিত হয়।

১২. সুম্মা (তারপর, অতঃপর, অনন্তর) বাআস্নাহম্ (আমরা তাহাদিগকে জাগরিত করিয়াছি, আমরা তাহাদেরকে পুনরায় উঠাইয়াছি, আমরা তাহাদেরকে উত্তিত করিয়াছি) লিনালাম্মা (আমরা জানিবার জন্য, পরীক্ষা করিবার জন্য, বুঝিয়া লইবার জন্য) আইউন্ (কোনটি, কেমন, যাহা, কে-কে, কী-কী) হিজ্বাইনি (দুই দলের মধ্যে) আহ্সা (গণনা করিয়া লইয়াছে, নির্ণয় করিতে পারিয়াছে, নির্ধারণ করিতে পারিয়াছে, সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারিয়াছে, হিসাব করিতে পারিয়াছে, বিচার-বিবেচনা করিয়া লইয়াছে) লিমা (যাহারা, যে) লাবিস্ (তাহারা ছিল, তাহারা অবস্থান করিয়াছিল) আম্মাদান্ (সীমিত এবং নির্দিষ্ট সময়, সময়কাল)।

প্ট তারপর আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাদেরকে জাগরিত করিয়াছি জানিবার জন্য, দুই দলের মধ্যে কোনটি নির্ণয় করিতে পারিয়াছে যে সময়কাল তাহারা অবস্থান করিয়াছিল।

১ ব্যাখ্যা : এখানে দুইটি দলের কথা বলা হয়েছে। এই দুই দল বলতে কী বুঝানো হয়েছে তা সঠিক করে বলা যায় না। হয়তো একটি দল দুনিয়াদার আর অপর দলটির নাম কাহাফবাসী। কেমন পরিবেশে, কেমন অবস্থাতে কাহাফের মাঝে অবস্থান করেছিলেন এবং কেমন করে এই মাটির দেহগুলি খাদ্য-পানীয় ছাড়া টিকে ছিল এবং সময়ের বিষয়টিতে যে-সব অনুভূতির প্রশ্ন দেখা দিয়েছে মানুষ একটু চিন্তা ও গবেষণা করে দেখুক, এই বিষয়টির মাঝে কী এমন গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। ইহার প্রকৃত সত্য ও মূল্য বুঝতে চেষ্টা করুন; কারণ, এতটি বছর কাহাফে বাস করার পরেও সেখান থেকে দেহযোবনের কোনো ঘাটতি না ঘটিয়ে আবার কেমন করে সংসার-জীবন পালন করতে পারে? এই বিষয়টি সত্যিই ভাবিয়ে তোলার মতো রহস্যময় বিষয়। অতএব, এই তিনশত নয় বছর খাদ্য-পানীয় বিহনে ঘুমিয়ে থাকার পর আবার জাগিয়ে তোলা, আবার সংসার-জীবনে প্রবেশ করানোটাই কী আল্লাহর একটি রহস্যলোকের দিকে

ধাবমান হবার দিক-দর্শন? জগৎবাসী বুঝতে চেষ্টা করুক এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে শিখুক যে, এই মারোফতের গোপন রহস্যগুলো কেমন করে উপলব্ধির আশিনায় আনা যায়। যদিও কাহাফ একটি পর্বতগুহা, কিন্তু ইহা কি কেবলই একটি পর্বতগুহা, নাকি টাইম অ্যান্ড স্পেসের তথা স্থান-কালের একটি অতীত গোপনীয় বিষয়, যাহা আধুনিক বিজ্ঞান কিছুটা ধরতে পেরেও ধরতে পারছে

না। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর বিজ্ঞান-ভাবনাগুলো আমাদের কিছুটা হলেও ভাবিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। বহু পূর্বের মুনি-ঋষিরাও পাহাড়-পর্বতে একই স্থানে বসে ধ্যানসাধনা করতে করতে তাদের সমগ্র শরীর উই পোকাকার টিপির মাঝে ঢেকে গেছে, শত শত বছর পর আবার জাগ্রত হবার কথাটি শুনেছি। সেই রকম একজন মুনি-ঋষির নামটি হলো সুধন বৈষ্ণব। কথিত আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রথের নিকট আগমনের একটু আগেই অর্জুনের বাণে তাঁর মাথা কাটা যায়, তারপর প্রতিটি রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ার আগে, ‘হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ’ ধ্বনিটি শোনা যায়। এমনকি কাটা মুণ্ডুর চৌট দুটিও ‘হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ’ বলে ভগবান কৃষ্ণের পদতলে মাথাটি রেখে দিলেন। অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘ভগবান, কাকে হত্যা করলাম?’ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ‘ওরে অর্জুন, তুই তো নিজ হাতে আমাতে নির্বাণ হয়ে যাওয়া আরেকটি দেহকেই হত্যা করলি!’ অতএব, আমরা আশা রাখি, বিজ্ঞান-বহির্ভূত এই রহস্যময় বিজ্ঞানও একদিন আবরণী উন্মোচন করতে পারবে।

১৩. নান্নু (আমরা [আল্লাহ]) নাকুসু (বর্ণনা করিতেছি, বিবরণ দিতেছি, ব্যাখ্যা দিতেছি, পরিচয় দিতেছি, বলিতেছি) আলাইকা (আপনার উপর, আপনার প্রতি) নাবাআহম্ (তাহাদের খবর, তাহাদের সংবাদ, তাহাদের বার্তা, তাহাদের তত্ত্ব, তাহাদের সন্ধান) বিলহাক্কি (সত্যের দ্বারা, সত্য দিয়া, সত্যের সহিত, বিশ্বস্ততার সহিত, যথার্থতার সহিত, নির্ভুলতার সহিত)।

স্ট আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] বর্ণনা করিতেছি আপনার উপর তাহাদের খবর সত্যের সহিত।

+ ইন্নাহম্ (নিশ্চয়ই তাহারা) ফিতইয়াতন্ (যুবক, তরুণ, জোয়ান, পূর্ণবয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক) আমানু (ইমান আনয়নকারী, বিশ্বাস স্থাপনকারী) বিরাব্বিহিম্ (তাহাদের রবের সহিত) ওয়া (এবং) জিদ্নাহম্ (আমরা তাহাদের বাড়াইয়া দিয়াছি, বর্ধিত করিয়াছি, আমরা তাহাদেরকে বেশি করিয়া দিয়াছি, অগ্রসর করাইয়া দিয়াছি, উন্নতি সাধন করিয়াছি, অগ্রগতি সাধন করিয়াছি) হদান্ (হেদায়েত, পথনির্দেশ, পরিচালনা)।

স্ট নিশ্চয়ই তাহারা যুবক ইমান আনয়নকারী তাহাদের রবের সহিত এবং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাদের বাড়াইয়া দিয়াছি হেদায়েত।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে ‘বিল-হাক্কি’ বলতে সত্যের দ্বারা অথবা সত্যের সহিত অথবা সত্যরূপে বোঝানো হয়েছে। ‘তাদের খবর সত্যের সহিত বলছি’—এটাই হলো শাক্ষিক অনুবাদ। এখানে ঘটনাটির ধারাবাহিকতা না রেখে বরং সত্যের সহিত কাহিনীটিকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো তুলে ধরতে হলে ইহার খবর এবং ঘটনাবলির কিছুটা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। কারণ, কাহিনীর ধারাবিবরণী সত্যের দ্বারা অথবা সত্যের সহিত মণ্ডিত থাকতে হবে। মনের আনন্দের খোরাক যোগাবার জন্য এটা নহে। সুতরাং, কাহিনীর কোনো প্রকার প্রাধান্য এখানে নেই। আবার, যুবক বলতে এখানে যে দৈহিকভাবে যুবকই হতে হবে এমন কথাটিও অনেক গবেষক মেনে নিতে চান না। আবার, অনেকে মেনে নিতে চান। উভয়েরই যুক্তি এবং উপস্থাপন সুন্দর এবং মার্জিত। সময়ের বিবর্তনে আমরা দেখতে পাই যে, ধর্ম-বিষয়ে সাধারণত প্রোট ও বুদ্ধদের সম্মাগমটি বেশি লক্ষ করা যায়। তবু, আমরা সময়ের বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী বয়সে বৃদ্ধ হলেও মনের মাঝে যুবশক্তির বর্ণনাটি কোরান এবং হবহু অর্থের প্রশ্নে গ্রহণ করে নিতে পারলাম না। তা ছাড়া, এই একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা দেখতে পাই, অনেক টগবগে যুবকেরা ধর্মের জন্য চরম আত্মত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকে। সুতরাং, ওই কাহাফে যারা ছিলেন তাদেরকে আমরা যুবক বলেই ধরে নিতে চাই।

আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে তথা রব-রূপে বিশ্বাস স্থাপন করাটি তথা ইমান আনাটি মোটেও একটি সাধারণ বিষয় নয়। কারণ, যেইমাত্র প্রতিপালকরূপে তথা রব-রূপে আল্লাহকে গ্রহণ করে নিতে যায় তখনই আপন নফস হতে খান্নাস-রূপী শয়তানিটি দুর্বল হতে থাকে এবং আল্লাহকে রব-রূপে নিজের ভেতর পরিপূর্ণরূপে জাগিয়ে তোলে এবং এই জাগিয়ে তোলার বিষয়টির প্রশ্নে ধৈর্য এবং একাগ্র ধ্যানসাধনার প্রয়োজন। আপন নফসের সঙ্গে যে-খান্নাসটি মিশে একাকার হয়ে আছে সেই খান্নাসের ইচ্ছায় পরিচালিত খাওয়া-পরা-চলা-ফেরা সব কিছুকেই প্রতিপালকের ইচ্ছায় তথা রবের ইচ্ছায় পরিচালনা করার সাধনায় ডুবে থাকে। এভাবেই ধীরে-ধীরে, ধাপে-ধাপে পূর্ণ হেদায়েত পেয়ে আল্লাহর বান্দাতে পরিণত হয়ে যায়। এটাকেই আল্লাহর প্রত্যক্ষ আদেশে চলা বোঝানো হয়েছে। এই রকম আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর এতই নিকটে অবস্থান করেন যে তাঁদের জিহ্বা আল্লাহর জিহ্বাতে পরিণত হয়, তথা তারা যা বলেন ওটা আল্লাহর কথা - ইত্যাদি। এরপরেও একটি মূল্যবান কথা পাঠকদেরকে বলে রাখতে চাই যে, এই বিষয়গুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ইহা মোটেও সমাজকেন্দ্রিক নহে। সমাজ এই সত্য ঘটনাগুলো তুলে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে পারে মাত্র, কিন্তু জোর করে ধ্যানসাধনাটি করার বাধ্যবাধকতার প্রেসক্রিপশন দিতে পারে না। এ-জন্যই, আল্লাহর দুনিয়ার উপর কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি অথবা বলপ্রয়োগের অবকাশ নেই - এই কথাটি বলা হয়েছে।

১৪. ওয়া (এবং) রাবাত্না (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] শক্তি দিয়াছি, আমরা ক্রমতা দিয়াছি, আমরা বলবান করিয়াছি, আমরা সামর্থ্য দিয়াছি, আমরা মজবুত করিয়াছি, আমরা অটল করিয়াছি, আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা অকম্পিত করিয়াছি, আমরা বলিষ্ঠ করিয়াছি) আলা (উপর, প্রতি) কুলুবিহিম্ (তাহাদের অন্তরসমূহ, তাহাদের হৃদয়গুলি, তাহাদের মর্মদেশ, তাহাদের মন, তাহাদের কলব) ইজ্ (যখন, যে-সময়, যেহেতু) কামু (তাহারা দাঁড় করাইলেন, তাহারা দণ্ডায়মান হইলেন, তাহারা খাড়াইলেন) ফা (সুতরাং, কাজেই, অগত্যা, অতএব) কালু (তাহারা বলিলেন) রাব্বুনা (আমাদের রব, আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সদাপ্রভু) রাব্বুস (রব, প্রতিপালক, সদাপ্রভু) সাম্মাওয়াতি (আকাশসমূহের, মনসমূহের) ওয়া (এবং) আরুদি (জমিনের, পৃথিবীর, দেহের) লান্ (না) নাদুট (আমরা ডাকিব, আমরা আহ্বান করিব, আমরা স্মরণ করিব, আমরা সন্তোষন করিব) মিন্ (হইতে) দুনিহি (তিনি ছাড়া, তিনি ব্যতীত) ইলাহান্ (ইলাকে, প্রভুকে, মনিবকে, কর্তাকে, অধিকারীকে) লাকাদ্ (নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে, অবশ্যই) কুলনা (আমরা বলিব) ইজ্জান্ (তখন, ওই সময়) শাতাতান্ (যাহা সত্য হইতে দূরে, যাহা অসত্য, গর্হিত, অতীব নিক্রান্ত, কুৎসিত, জঘন্য, মন্দ, মস্ত অপরাধ, নিদারুণ, দুষ্কার্য, অবিচার, অন্যায়)।

প্ট এবং আমরা [আল্লাহ : বহুবচনে বলা হয়েছে] শক্তি দিয়াছি তাহাদের কলবের উপর, যখন তাহারা দাঁড়াইলেন সুতরাং তাহারা বলিলেন, আমাদের রব আকাশসমূহের এবং জমিনের রব, আমরা ডাকিব না তিনি ছাড়া ইলাকে, (ডাকিলে) নিশ্চয়ই আমরা বলিব তখন অসত্য।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে রবরূপী আল্লাহ তথা প্রতিপালকরূপী আল্লাহর উপর কাহাফবাসীগণ নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করলেন তথা ফেলে দিলেন আর তখনই রব তথা প্রতিপালক তাঁদের কলবে শক্তি ও দর্শনের বিশ্বয়কর ক্রমতা প্রদান করলেন। এখানে 'রাবাত্না' শব্দটির দ্বারা কলবের উপর বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং আধ্যাত্মিক শক্তি এবং দর্শনশক্তি রহমতরূপে দান করার কথাটি বোঝানো হয়েছে। লোভ-মোহ-মাৎস্য-কাম-ক্রোধ আর অহংকার নামক খান্নাস-রূপী পর্দা অথবা দেয়ালগুলো তখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

যায়। তখনই রূহরূপী আল্লাহর অসীম শক্তির সঙ্গে হয় পরিপূর্ণ মিলন ও দর্শন। ইহাই তোহিদ। ইহার বাহিরের অবস্থানটি যতই সুস্থ-স্বাভাবিক হোক না কেন, উহাতে সামান্য হলেও শেরেকের গন্ধটি থেকে যায়। সমগ্র সৃষ্টির রাজ্য হতে বিচ্ছিন্নতার শেরেকরূপী পর্দা ছুটে গিয়ে এক অখণ্ড তোহিদে লীলাখেলা সৃষ্টির মাঝে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থার মোকামে তখন কাহাফবাসীগণ অবস্থান করেছেন। এ-জন্য ‘ইজকাম’ অর্থাৎ ‘যখন দাঁড়াইলেন’ কথাটির দ্বারা কাহাফ হতে আবার যখন সংসার-জীবনে লোকসমাজে আসলেন তখনও বলেছেন ‘বাব্বুনা বাব্বুস সাম্মাওয়াতি ওয়াল আরদি’ – তথা, আমাদের রবই আসমান-জমিনের রব তথা যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব তিনিই আবার তাদেরই মাঝে রবরূপেই বিরাজ করছেন। এই গুঢ় রহস্যটি, এই অতীব গোপন বিষয়টি তারা মর্মে-মর্মে বুঝতে পারলেন। তারা আরও বুঝতে পারলেন যে, নিজের ডেতরের রবকে বিকশিত করতে পারলেই জগৎসমুহের রবের পরিচয়টি পাওয়া যায়।

কাহাফে প্রবেশ করার আগেও রবরূপে আল্লাহ তাদেরই মাঝে বিরাজ করছিলেন। কিন্তু তখন তারা এত বড় বিরাট বিষয়টি বুঝে উঠতে পারেন নি। তখনই বুঝে উঠতে পারলেন যখন নিজের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাস-রূপী পর্দাটি, যাকে আমিতের পর্দা বলা হয়, উহা একেবারেই ছিন্ন হয়ে গেল তথা খান্নাস-রূপী শয়তানটি হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবার পর আল্লাহর রব-রূপের অখণ্ড তোহিদ-রূপটি সমগ্র সৃষ্টিজগতে দৃষ্টিগোচর হলো। ইহাই তোহিদ, ইহাই কাবাতে বাস করা, ইহাই মসজিদে অবস্থান করা এবং এখানেই আত্মসমর্পণের তথা ইসলামের চরম সার্থকতা। আপন নফস হতে খান্নাসের পলায়নে সৃষ্টি ও সৃষ্টির তোহিদে মিলিত হবার বিজ্ঞানময় দর্শনটি তখনই ধরা পড়ে। তখনই দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে আসল পরিচয়টি ধরা দেয়, তখন দেখতে পায় দুইয়ের কোনোই

অস্তিত্ব নাই। তাই সাধারণ মানুষকে বুঝাবার জন্য কাহাফবাসীরা বললেন, অন্য কাহাকেও আর ডাকব না।

তবে, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এই কথাগুলো ব্যক্তিসাধক-কেন্দ্রিক, ইহা মোটেও সমাজকেন্দ্রিক নয়।

১৫. হাউলাই (ওইসব লোক, ওই সকল মানুষেরা) কাওমুন (আমাদের কওম, আমাদের জাতি, আমাদের সম্প্রদায়) ইত্তাখাজু (গ্রহণ করিয়াছে, বরণ করিয়াছে, ধারণ করিয়াছে, অবলম্বন করিয়াছে, মানিয়া লইয়াছে) মিন (হইতে) দুনিহি (তাহাকে ছাড়া, তাহাকে ব্যতীত) আলিহাতান্ (ইলা, দেবতা, উপাস্য, বিগ্রহ, আরাধ্য)।

ঐ আমাদের সম্প্রদায়ের ওই সকল মানুষেরা মানিয়া লইয়াছে তাহাকে ছাড়াও ইলা।

+ লাও (কেন) লা (না) ইয়াতুনা (তাহারা আনে, তাহারা আনয়ন করে) আলাইহিন্ (তাহাদের উপর) বিসুলতানিন্ (প্রমাণ, নজির, নিশ্চয়বোধ, যথার্থ জ্ঞান, বিশ্বাসের হেতু, যাহা দ্বারা নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করা যায়, জোর, শক্তি, সনদ, রাষ্ট্র) বাইয়িনিন্ (প্রকাশ্য, খোলাখুলি, স্পষ্ট, সুস্পষ্ট, পরিষ্কার, কিছু গোপন নাই এমন)।

ঐ কেন তাহারা আনয়ন করে না তাহাদের উপর স্পষ্ট প্রমাণ?

+ ফামান্ (সুতরাং কে) আজ্লাম (বেশি জালিম, বেশি অত্যাচারী, অন্যায়কারী, দ্রাষ্ট, অসৎ) মিম্মানি (যাহা, যে) ইফতার (আরোপ করা, উদ্ভাবন করা, কল্পনা করা, বানানো) আলা (উপর) লাহি (আল্লাহ) কাজিবান্ (মিথ্যা, ছলনা, প্রতারণা, অসত্য, অমূলক, কল্পিত, নিষ্ফল, অনর্থক)।

সুতরাং কে বেশি জ্বালেম (সে ছাড়া) যে আরোপ করে আল্লাহর উপর মিথ্যা।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে ইহা দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে কাহাফে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তথা হেরা গুহার মতো নির্জনে ধ্যানসাধনা না করা পর্যন্ত তথা যে-কোনো নির্জন স্থানে ধ্যানমগ্ন হওয়া ছাড়া আপন নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাস-রূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া অনেকটা অসম্ভব বিষয়ে পরিণত হয়। খান্নাস-রূপী শয়তানটি আপন পবিত্র নফস হতে যখন বিদায় গ্রহণ করে তখনই তোহিদের মূল্যায়নটি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। অন্যথায় কাহাফবাসীরা তিনশত নয় বৎসর কাহাফে অবস্থান করার পর যখন সমাজ-জীবনের মুখোমুখি হলেন তখন সমাজ ছিল খ্রিস্ট-ধর্মাবলম্বী মুসলিম এবং রাজা একই ধর্মে বিশ্বাসী ছিল – তা হলে কেন কাহাফবাসীরা আফসোসের ভাষায় গোটা সমাজ-জীবনকে মিথ্যা ইলার পুজায় ভরে গেছে বলে ঘোষণা করলেন? মৌখিক স্বীকৃতির মাঝে সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকে, কিন্তু উলঙ্গ সত্যটি উদ্ধার করতে গেলে আপন নফস হতে খান্নাস-রূপী শয়তানকে তাড়াতেই হবে। কাহাফবাসীদের মূল কথাগুলো এই আফসোসের মধ্য দিয়েই পরিস্ফুটিত হয়েছে। তা না হলে সমাজ-জীবনে তোহিদের স্বীকৃতি আছে এবং এই স্বীকৃতি থাকার পরেও কেন কাহাফবাসীরা আফসোস করতে যাবেন? এই আফসোসের রহস্যটিই হলো আপন পবিত্র নফস হতে অপবিত্র খান্নাস-রূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া। যদিও সত্য বলতে কি, ওই কাহাফবাসীর মতো কালে-কালে একই আফসোসের ভাষাটি ফুটে উঠেছে, ওঠে এবং উঠবেই। তা না হলে আল্লাহর বিচিত্র লীলাখেলার বিচিত্র ভঙ্গি আর শৈলীগুলো হারিয়ে যাবে। সুতরাং, সর্বশেষ কথাটি হলো : বায়তুল মোকাদ্দাসে শরিয়ত, কিন্তু কাহাফে মারেকত। কাবাতে শরিয়ত, কিন্তু হেরা গুহায় মারেকত। এই মারেকতের রহস্যটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ইহা কখনই সমাজকেন্দ্রিক হয় নাই, হয় না এবং হবেও না। এবং যদি কোনোদিন সমাজকেন্দ্রিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহর এই বিচিত্র লীলাখেলার শৈলীরও সমাপ্তি ঘটবে।

১৬. ওয়া (এবং, অধিকন্তু, আর, ও, অপিচ) ইজি (যখন, যে-সময়, যেহেতু) তাজালতুম (তোমরা পৃথক হইয়া গেলে, তোমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, তোমরা আলাদা হইয়া গেলে, তোমরা সম্পর্কশূন্য হইয়া গেলে, তোমরা বিভক্ত হইয়া গেলে, তোমরা বিযুক্ত হইয়া গেলে) ইম্ম (তাহাদের) ওয়া (এবং) মা (যাহাদের) ইয়াবদুনা (তাহারা এবাদত করে) ইল্লাল্লাহা (আল্লাহ ছাড়া) ফাউ (সুতরাং আশ্রয় লও, সুতরাং শরণ লও, সুতরাং অবলম্বন গ্রহণ করো, সুতরাং সহায় গ্রহণ করো) ইলীন্ (দিকে, অভিমুখে) কাহ্ফি (গুহা) ইয়ান্শুর (বর্ষণ করা, অকাতরে দান করা, বিস্তার করা, খুলিয়া দেওয়া, প্রস্তুত করিয়া দেওয়া) লাকুম্ (তোমাদের জন্য) রাব্বুকুম্ (তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদের রব, তোমাদের সদাপ্রভু) মিন্ন (হইতে) রাহ্মাতিহি (তাহার রহমত, তাহার করুণা, তাহার অনুকম্পা, তাহার ক্ষমাশীলতা, তাহার দয়া) ওয়া (এবং) ইউহাইয়ি (জীবন্ত করিয়া দেওয়া, সজীব করিয়া দেওয়া, জীবিত করিয়া দেওয়া, প্রাণসঞ্চার করা) লাকুম্ (তোমাদের জন্য) মিন্ন (হইতে) আম্মরিকুম্ (তোমাদের কাজকর্ম, তোমাদের কর্মসমূহ, তোমাদের কার্যাবলি) মিন্নফাকিন্ (ফলপ্রসূ, ফলদায়ক, উপকারী, সিদ্ধিদায়ক, সহজ)।

সুতরাং এবং যখন তোমরা আলাদা হইয়া গেলে তাহাদের (হইতে) এবং যাহাদের তাহারা এবাদত করে আল্লাহ ছাড়া সুতরাং আশ্রয় গ্রহণ করো গুহার দিকে। খুলিয়া দিবেন তোমাদের জন্য তোমাদের রব তাহার রহমত এবং জীবন্ত করিয়া দিবেন তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্ম (ও) সহজ।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে মারফতের অতি গোপন রহস্যের কথাগুলো বলা হয়েছে। অবশ্য এই রহস্যের বিষয়টি বুঝতে চাইলে সামান্য একটু চিন্তাভাবনা করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সমগ্র মানবজাতিকে পর্বতগুহার দিকে যাবার আদেশটি দেয়া হয়েছে এ-জন্য যে, আপন নফস হতে খাল্লাসরূপী শয়তান তথা আমিতু তথা মায়ার দাসত্ব হতে মুক্ত হতে চাইলে কাহাফের মতো গুহায় আশ্রয় নেয়ার আশ্বান করা হয়েছে। বাহিরের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গেলে দুনিয়ার সকল মানুষের কাহাফের দিকে তথা পর্বতগুহার দিকে আগমন করার আশ্বানটি মিলীনো যায় না। কারণ, দুনিয়ার সব মানুষের পক্ষে এত পর্বতগুহা নেই যে উহার দিকে আশ্রয় নিতে পারবে। মানুষ আল্লাহ ছাড়া কাদের দাসত্ব তথা এবাদত করে? আপন নফসের সঙ্গে যে-শয়তানটি অবস্থান করছে, তারই বহু চমক-ঠমকের রূপমাঝারে ডুবে থাকি, অথচ বুঝতে পারি না। মৌখিক এবাদত-বন্দেগির মূল্য কতটুকু বাস্তবে ফলপ্রসূ হতে পারে ইহা অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য। কারণ, পাথরের আঘাত-খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাই, তথা ‘আউজুবিল্লাহি মিনাশ্ শয়তানির রাজিম’- মুখে-মুখে যত বারই পড়ি না কেন, তাতে কি শয়তানের খাল্লাসরূপ হতে মুক্তি পাওয়া যায়? মুখে বারবার পড়া একটি বিষয়, আর কাহাফের দিকে ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকাটি সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। এই ধ্যানসাধনার মাধ্যমে কাহাফের মতো রহস্যময় গুহার দিকে আগমন করতে পারলেই এবং কিছু দিনের ধৈর্যধারণ করে আল্লাহর এবাদতে ডুবে থাকতে পারলেই আল্লাহ তাঁর রহমতের রহস্যের ভাণ্ডারটি খুলে দেন এবং তখনই সাধক রহস্যলোকের অনেক কিছু জানতে পারেন এবং এই জানাটাই হলো আইনুল একিন তথা চোখে দেখা ইমান। বই পড়া ইমান এতই তুনকো যে যে-কোনো সময়ে ডেঙে পড়ার সমুহ বিপদ থেকে যায়। সুতরাং, এক কথায় বলতে গেলে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে কাহাফের দিকে আগমন করার আশ্বানটি এ-জন্য করা হয়েছে যে, আল্লাহর রহমতের রহস্যময় ভাণ্ডারটি দেখে নিক এবং নবজীবন লাভ করুক তথা যে-জীবন লাভ করলে মৃত্যু ঘটে না। বারবার জন্মচক্রের জাহান্নামের বলয়ে আবদ্ধ করে না।

কাহাফেই মুক্তির বারতা। এখন প্রশ্ন হলো, কোথা হতে মুক্তি পাওয়া? আপন নফস হতে খাল্লাস-রূপী শয়তানটিকে বিদায় করে দিতে পারলেই মুক্তির সৌন্দর্য সাধকের সামনে ফুটে ওঠে - নতুবা বহর দাসত্ব করাটি মুখে না মানলেও প্রতিটি কর্মের মাঝে ফুটে উঠতে বাধ্য। এই বহর দাসত্ব করাটাই শেরেক। মুখে-মুখে ‘শেরেক করছি না’ বললেই শেরেক হতে মুক্তি পাওয়া যায় না, মুক্তি তখনই পাওয়া যায় যখন আল্লাহর দাসত্বটি বরণ করে নিতে পারে, যখন একজন মানুষ কাহাফের মতো পর্বতগুহায় নির্জনে ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে।

এই রকম ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সাধকের নিকট পরিশেষে আল্লাহর রহমতের দরজাগুলো একে-একে খুলে যায় এবং সাধক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। অনেক সময় আল্লাহ এতই রহমত বর্ষণ করতে থাকেন যে, কর্মগুণিও জীবন্ত হয়ে যায়। এতেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা।

এই আল কাহাফে তথা পর্বতগুহায় নিজ হতে প্রবেশ করা যায় না এবং যায় না বলেই ‘কাহাফের দিকে যাও’ বলা হয়েছে। কাহাফে যাও - বলা হয় নি। আধ্যাত্মিক রহমতের রাজ্যে আপন ক্রমতায় মানুষ যেতে পারে না এবং উহার আমল করাটাও মোটেও সহজ বিষয় নয়। তাই গুরুর প্রয়োজন।

তাই আমরা দেখতে পাই যে, লক্ক-লক্ক ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা গুরু ধরেই রহস্যলোকে প্রবেশ করার রহমতটি পেয়েছেন এবং এই

সকল মহামান্য গুরুরা একবাক্যে বলেছেন যে, যার গুরু নাই, শয়তান তার গুরু।

১৭. ওয়া (এবং) তারাশ্ (আপনি দেখিবেন, আপনি দর্শন করিবেন, আপনি টের পাইবেন, আপনি বুঝিবেন, আপনি উপলব্ধি করিবেন, আপনি নির্ণয় করিবেন, আপনি সাক্ষাৎ করিবেন, আপনি অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, আপনি দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইবেন) শামসা (সূর্যকে) ইজা (যখন) তালাআত্ (উদ্ভিত হয়, ওঠে, প্রকাশিত হয়, আবির্ভূত হয়) তাজাওয়াক্ (সরিয়া যায়, অতিক্রম করে, চলিয়া যায়, হেলিয়া যায়) আন্ (হইতে, যে, এই যে) কাহফিহিম্ (তাহাদের কাহাফ, তাহাদের গুহা) জাতাল্ (পাশ দিয়া) ইয়ামিনি (ডাইন, দক্ষিণ) ওয়া (এবং) ইজা (যখন) গারাভাত্ (অস্ত যায়, ডুবিয়া যায়) তাকরিদুহম্ (তাহা অতিক্রম করে তাহাদেরকে, তাহা পার হইয়া যায়, তাহাদিগকে, তাহা ডিঙাইয়া যায় তাহাদেরকে, তাহা ছাড়িয়া যায় তাহাদেরকে) জাতাশিমালি (বাম পাশ দিয়া, বাম দিক দিয়া) ওয়া (এবং) হম্ (তাহারা) ফি (মধ্যে) ফাজওয়াতিন্ (খোলা জায়গায়, প্রশস্ত চত্বরে, প্রশস্ত স্থানে) মিনহ্ (উহার মধ্যে)।

প্ট এবং আপনি দেখিবেন সূর্যকে - যখন উদ্ভিত হয়, সরিয়া যায় তাহাদের গুহা হইতে ডান পাশ দিয়া এবং যখন অস্ত যায়, তাহা অতিক্রম করে তাহাদেরকে বাম পাশ দিয়া এবং তাহারা খোলা জায়গার মধ্যে, উহার মধ্যে।

+ জালিকা (ওইটাই, উহাই) মিন্ (মধ্য হইতে) আয়াতিল্লাহি (আল্লাহর আয়াতসমূহের, আল্লাহর নিদর্শনাদির)।

প্ট ওইটাই আল্লাহর আয়াতসমূহের মধ্য হইতে।

+ মান্ (যাহাকে) ইয়াহদিলাই (আল্লাহ পথ দেখান) ফাহওয়াল্ (সূতরাং সেই) মুহতাদি (হেদায়েতপ্রাপ্ত, সঠিক পথপ্রাপ্ত)।

প্ট যাহাকে আল্লাহ পথ দেখান সূতরাং সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত।

+ ওয়া (এবং) মান্ (যাহাকে) ইউদলিল্ (পথহারা করেন, পথভ্রষ্ট করেন, বিপথগামী করেন, বিভ্রান্ত করেন) ফালান্ (সূতরাং কখনোই না) তাজিদা (তুমি পাইবে) লাহ্ (তাহার জন্য) ওয়ালিয়াম্ (কোনো ওলি, কোনো অভিভাবক) মুরশিদান্ (কোনো মুরশিদ, কোনো পথপ্রদর্শক)।

প্ট এবং যাহাকে পথহারা করেন সূতরাং কখনোই না তুমি পাইবে তাহার জন্য কোনো ওলি, কোনো মুরশিদ।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের বিষয়গুলো অধম লেখক বুঝতে পারল না। সামান্য কিছু বুঝে আসতে চায়, আবার বুঝে আসে না - এই দোটার মধ্যে পড়ে ইহার ব্যাখ্যাটি লিখতে পারলাম না। কারণ, মূল বিষয়টির কিছুটা ধারণা থাকলেও ব্যাখ্যা লেখা যায়, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, পাঠকদের এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি দিতে পারলাম না। এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি অনেক তফসিরকারকদের তফসির হতে বারবার পড়েও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি নি। তবে মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির ব্যাখ্যাটি এবং শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতির ব্যাখ্যাটি পাঠকেরা পড়ে দেখতে পারেন। তবে আয়াতের শেষ অংশে বর্ণিত ওলি এবং মুরশিদের প্রয়োজন হয় সঠিক পথে অগ্রসর হবার জন্য - ইহা পরিষ্কার কমবেশি সবাই বুঝতে পারেন। কারণ, আল্লাহ যখন কাহাকেও সঠিক পথে পরিচালিত করেন তখন আদমসুরত ধারণা করেই করা হয়।

তাই ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা বলে থাকেন যে, যে আল্লাহকে দেখেছেন বলে দাবি করেন, কোনো সন্দেহ নাই, তাকে আদমসুরতেই দেখা দেওয়া হয়েছে। আবার আমরা কমবেশি এটাও জানি যে,

আল্লাহ বলেছেন ‘আই ম্লেইড অ্যাডাম ইনট মাই ওউন ইমেজ’ – তথা আদমকে আমার সুরতেই তৈরি করা হয়েছে। আরবিতে ‘ওয়াজহুল্লাহ’ তথা আল্লাহর চেহারা, ফারসি ভাষায় ‘সারাপা’ – পা থেকে মাথা পর্যন্ত আল্লাহর নুরে নুরময় এবং হিন্দু ধর্মে নরের রূপে নারায়ণ শব্দগুলো আমরা দেখতে পাই। এই কথাগুলো গ্রহণ এবং বর্জনের এখতিয়ার যার যার তকদিরের উপর সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ। সুতরাং, পরিশেষে পাঠকদের জানিয়ে দিতে চাই যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে পারলাম না।

১৮. ওয়া (এবং) তাহসাবুহম্ (তুমি তাহাদের ধারণা করিবে, তুমি তাহাদের মনে করিবে, তুমি তাহাদিগকে গণ্য করিবে, তুমি তাহাদিগকে বিবেচনা করিবে) আইকাজিন্ (জাগ্রত, জাগিয়া আছে এমন, সজাগ, সচেতন, নিদোষিত) ওয়া (এবং) হম্ (তাহারা) রুকুদুন (ঘুমন্ত, ঘুমাইতেছে এমন, নিদ্রিত, সুপ্ত)।

প্ট এবং তুমি তাহাদিগকে ধারণা করিবে সজাগ এবং তাহারা ঘুমাইতেছে।

+ ওয়া (এবং) নুকাললিবুহম্ (আমরা [বহবচনে বলা হয়েছে] তাহাদেরকে পাশ ফিরাইয়া দেই, আমরা তাহাদেরকে পরিবর্তন করাই, আমরা তাহাদিগকে ঘুরাইয়া দেই, আমরা তাহাদিগকে উল্টাইয়া দেই) জাতাল ইয়ামিনি (ডান পাশে, ডান দিকে, দক্ষিণে) ওয়া (এবং) জাতাশশিমালি (বাম পাশে, বাম দিকে, উত্তরে)।

প্ট এবং আমরা [বহবচনে বলা হয়েছে] তাহাদেরকে পাশ ফিরাইয়া দেই ডান দিকে এবং বাম দিকে।

+ ওয়া (এবং) কালবুহম্ (তাহাদের কুকুর) বাসিতুন (ছড়াইয়া দেওয়া, বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা) জিরাআইহি (তাহার সামনের দুই পা) বিলওয়াসিদি (গর্তের মুখে, গুহার দ্বারে)।

প্ট এবং তাহাদের কুকুর ছড়াইয়া দিয়াছে তাহার সামনের দুই পা গুহার মুখে।

+ লাও (যদি) ইত্‌তালাতা (উঁকি মারিয়া দেখিতে) আলাইহিম্ (তাহাদের উপর) লাওয়াল্লাইতা (তুমি অবশ্যই পিছন ফিরিয়া পালাইতে, তুমি অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিতে) মিন্‌হম্ (তাহাদের থেকে, তাহাদের হইতে) ফিরারান্ (পলায়ন করিতে, পালাইতে) ওয়া (এবং) লামুলিতা (অবশ্যই সংস্কারিত হইত, অবশ্যই সংক্রমিত হইত, অবশ্যই উদয় হইত, অবশ্যই উদ্বেক হইত) মিন্‌হম্ (তাহাদের হইতে) রুবান্ (ভয়, ভীতি, আতঙ্ক, ভ্রাস, শঙ্কা)।

প্ট যদি উঁকি মারিয়া দেখিতে তাহাদের উপর তুমি অবশ্যই পিছন ফিরিয়া তাহাদের হইতে পলায়ন করিতে এবং অবশ্যই উদ্বেক হইত তাহাদের হইতে আতঙ্ক।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের প্রথমেই আমাদেরকে একটি ছোট্ট উপদেশ দেওয়া হয়েছে এই বলে যে, তুমি ধারণা করতে যেয়ো না যে, তাহারা তথা কাহাফবাসীরা জেগে আছেন তথা জাগ্রত। তারা ঘুমিয়ে আছেন এবং আল্লাহ এখানে নিজেকে বহবচনের রূপ ধারণ করে তাদেরকে ডান এবং বাম দিকে পাশ ফিরিয়ে দিয়েছেন। নবি এবং ওলিদের শরীর মাটি গ্রাস করতে পারে না তথা খেয়ে ফেলার বিধানটি দেওয়া হয় নি। তাই কিছু তফসিরকারক ডান-বাম পাশ ধরানোর অজুহাতটি এই বলে দাঁড় করান যে, মাটি যেন তাদের দেহগুলোকে গ্রাস না করে। ইহা একটি অনুমানের অন্ধ ঢিল ছোড়ার মতো। অগ্র-পশ্চাৎ না ডেবে এ-রকম ব্যাখ্যা করাটি মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর যে কুকুরটি গুহার মুখে পা দুটো ছড়িয়ে বসে আছে সেখানেও কিছু তফসিরকারক বিরাট ভুল করে বসেন। অনেকেই এই কুকুর বিষয়টি নিয়ে এমন সব আজগুবি কথার অবতারণা করেন যা উদ্ভট, বানোয়াট

এবং সম্পূর্ণ শ্বেকি। কারণ, কুকুর নফসের অধিকারী, কিন্তু কুকুরের নফসের সঙ্গে খান্নাস-রূপী শয়তানের থাকার আইনটি কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নি। সুতরাং, কুকুর যতই প্রভুভক্ত হোক অথবা স্পর্শ করার অযোগ্য হোক না কেন, মূলতঃ কুকুরটি তোহিদের বাস করে। খান্নাস-রূপী শয়তান তোহিদের অবস্থান হতে সরিয়ে দেয়, কিন্তু যেহেতু কুকুরের নফসের সঙ্গে খান্নাস-রূপী শয়তানের থাকার প্রশ্নই ওঠে না, সেখানে নিঃসন্দেহে কুকুর তোহিদের অবস্থান করে।

এই আয়াতে আমাদেরকে এটুকু অবশ্যই ভাবিয়ে তুলবে যে, তিনশত নয় বছর কাহাফবাসীদের এবং কুকুরটিকে খাদ্য-পানীয় বিহনে আলাহ বাচিয়ে রেখেছেন। অবশ্য 'বাল ইন্দা রাবিবিহিম ইয়ার জাকুন' - তথা, 'বরং আমরা তাদেরকে গোপনে রেজেক দিয়ে বাচিয়ে রাখি।' - এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি মনের অজান্তে খান্নাসের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মনে নিতে কষ্ট হয় এবং গোজামিলের নানা রকম কৌশল অবলম্বন করা হয়। অবশ্য মূল বিষয় হতে ছিটকে পড়ে গেলে এ-রকম হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। এই কাহাফবাসীদেরকে উঁকি মেরে দেখতে গেলে কেন আতঙ্কগ্রস্ত হবার কথাটি বলা হয়েছে ইহার আগা-মাথা কিছুই বুঝতে পারলাম না। এই না বোঝাটাই অধম লেখকের বিরাট একটি ক্রটি। কাহাফবাসীরা তো সর্বোচ্চ আবদুহ মোকামের ওলি, সুতরাং এই ওলিদেরকে দেখে কেন ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হবো ইহার রহস্যটি অধম লেখকের জ্ঞান নাই। তবে হ্যাঁ, একটি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে চাই যে, অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন বানু বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন যে, তিনশত নয় বছর কাহাফে ঘুমিয়ে থেকেও শরীরের মাঝে বার্ধক্যের চিহ্নমাত্র ফটে ওঠে নি; বরং কাহাফে প্রবেশ করার সময় যেমনটি ছিলেন তেমনই আছেন। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন যে, এমন কিছু কি ছিল বা আছে যার মাধ্যমে দেহগুলোকে বার্ধক্যের প্রভাব হতে মুক্ত রাখা যায়? যেহেতু কোরান বলছে, এই কাহাফবাসীদেরকে উঁকি মেরে দেখতে গেলে ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাবে, সুতরাং কোরান-এর এই বাণী অমোঘ সত্য এবং সত্যেরও সত্য। কিন্তু আফসোস! অধম লেখক গাধার মতো পরিশ্রম করে কোরান-এর চল্লিশ-বিয়াল্লিশটি তফসির পড়েও অজ্ঞতাই প্রকাশ করলাম তথা অধম লেখকের পক্ষে ইহার ব্যাখ্যা লেখাটা ভয়ঙ্কর কষ্টসাধ্য বিষয়। তাই পাঠকের কাছে করজোরে কক্ষা চেয়ে নিলাম।

১৯. ওয়া (এবং) কাজালিকা (ওইভাবেই, ওইরূপেই, সেইভাবেই, তেমনই [কোরান-এ যেখানে হবহ শাব্দিক অর্থে 'ওইভাবেই' - হয়, সেখানে তাকে 'এইভাবে' অনেকেই অনুবাদ করে থাকেন। জ্ঞানি না ইহা ইচ্ছাকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত, তবে দুঃখজনক]) বাআস্নাহম (আমরা তাহাদেরকে উঠাইলাম, আমরা তাহাদেরকে জাগাইলাম, আমরা তাহাদিগকে উখিত করিলাম, আমরা তাহাদিগকে জাগরিত করিলাম, আমরা তাহাদেরকে ডাকিয়া তুলিলাম, আমরা তাহাদের ঘুম ভাঙাইলাম, আমরা তাহাদের সচেতন করিলাম) লিয়াতাসাআল (যেন তাহারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া লয়, যেন তাহারা পরস্পর প্রশ্ন করে, যেন তাহারা একে-অপরের কাছে জানিতে চায়) বাইনাহম (তাহাদের মধ্যে, তাহাদের মাঝে)।

স্ট এবং ওইভাবেই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাদের উঠাইলাম যেন তাহারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহাদের মধ্যে।

+ কালা (বলিল) কায়িলুন (একজন বক্তা, একজন কথক) মিন্হম (তাহাদের মধ্য হইতে) কাম (কি) লাবিসত্‌ম (তোমরা অবস্থান করিয়াছিলে, তোমরা বাস করিয়াছিলে, তোমরা ছিলে, তোমরা থাকিয়াছ)।

স্ট বলিল একজন তাহাদের মধ্য হইতে, কত (কাল) তোমরা বাস করিয়াছিলে?

+ কালু (তাহারা বলিল) লাবিস্তানা (আমরা বাস করিয়াছিলাম, আমরা অবস্থান করিয়াছিলাম) ইয়াওমান (একদিন) আও (অথবা) বাদা (কিছু) ইয়াওমিন (একদিনের)।

পট তাহারা বলিল, আমরা বাস করিয়াছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু (অংশ)।

+ কালু (বলিল) রাব্বুকুম (তোমাদের রব, তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদের সদাপ্রভু) আলামু (জানেন) বিম্মা (যাহা) লাবিস্তুম (তোমরা বাস করিয়াছ)।

পট (অন্যদল) বলিল, তোমাদের রব জানেন যাহা (কতকাল) তোমরা বাস করিয়াছ।

+ ফাবআসু (সুতরাং তোমরা পাঠাও) আহাদাকুম (তোমাদের একজনকে, তোমাদের কাহাকেও) বিওয়ারিকিকুম (তোমাদের মুদ্রাসহ) হাজ্জিহি (এই) ইলালু (দিকে) মাদিনাতি (শহর)।

পট সুতরাং তোমরা পাঠাও তোমাদের কাহাকেও তোমাদের মুদ্রাসহ এই শহরের দিকে।

+ ফালইয়ানজুর (সুতরাং সে দেখে) আইউহা (কোনটি) আজ্কা (পবিত্র, উত্তম, শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে ভালো) তাআমান (খাদ্য) ফালইয়াতিকুম (সুতরাং তোমাদের জন্য) বিরিজ্কিম (রিজিকসহ, খাদ্যসহ) মিনহ (উহার মধ্যে)।

পট সুতরাং সে দেখে কোনটি উত্তম খাদ্য, সুতরাং তোমাদের জন্য খাদ্যসহ উহার মধ্যে।

+ ওয়াল (এবং) ইয়াতালাত্‌তাহু (সে যেন সাবধান হয়, যে যেন অবহিত হয়, সে যেন সতর্ক হয়) ওয়া (এবং) লা (না) ইউশইরান্না (কাহাকেও জানানো, কাহাকেও বুঝিতে দেওয়া, কাহাকেও টের পাইতে দেওয়া) বিকুম (তোমাদের বিষয়ে, তোমাদের সম্বন্ধে, তোমাদের সম্পর্কে) আহাদীন (কাহাকেও)।

পট এবং সে যেন সাবধান হয় এবং না বুঝিতে দেয় তোমাদের বিষয়ে কাহাকেও।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের ব্যাখ্যাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যাগুলো লিখতে গিয়ে অনেক ঝানু-ঝানু তফসিরকারক মনের অজান্তে এদিক-সেদিক করে ফেলেন। প্রথমেই বলতে হয় যে, তিনশ নয়টি বছর কাহাফবাসীরা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ না করে যে ঘুমিয়ে ছিলেন, সেই ঘুম হতে উঠেই খাদ্য ভক্ষণ করার ক্ল্যাটি গজগজ করে কেন যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ইহা বুঝতে পারলাম না। এটি কাল খাদ্য বিহনে আরামে ঘুমিয়েছিলেন, আর যেইমাত্র ঘুমটি ভেঙে গেল সেইমাত্র ক্ল্যার তাড়নাটি প্রকাশ পেল ইহাও বুঝতে পারলাম না। আর না বোঝারই কথা। কারণ, আল্লাহর রহস্যগুলো কি এত সহজেই ধরা দেয়!

সময় তথা টাইম অ্যান্ড স্পেস বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক অল্প, অনেক অসম্পূর্ণ, কিছু বিজ্ঞানীরা সময়জ্ঞানের রহস্যটি উন্মোচন করার প্রয়াসে গবেষণার পর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইহাও আল্লাহর ইশারা। আল্লাহই অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে দেন, আবার কিছুটা জ্ঞানও দান করেন, আবার জ্ঞানের অনেকখানি অগ্রসর হবার পর দ্বিগুণ উৎসাহে রহস্যের পর্দাগুলো ভেদ করার অনুপ্রেরণাটি তিনিই রহমতরূপে দান করেন। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, 'কালই আমি, সুতরাং কালকে গালি দিও না।' আল্লাহর এই কথাটি অধম লেখক বুঝতে পারে নি এবং বুঝবার প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে অগ্রসর হতে গেলেও মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারি নাই। অধম লেখকের পরিপূর্ণ আন্তরিকতা থাকতে পারে, কিন্তু এই কালের বিষয়টি লিখতে গিয়ে অনুমানের ঢিল ছুঁতে অনেকটা

বাধ্য হলাম। এই পার্থিব জীবনে সময়-বিষয়টিতে যে খণ্ড জ্ঞান এবং অসম্পূর্ণতা থেকে যায় তা থেকে অখণ্ড জ্ঞান নামক কালের মধ্যে তখনই একজন ভূবে যেতে পারে যখন, একজন কাহাফবাসীর মতো নির্জন গুহাতে অথবা নির্জন স্থানে অথবা নির্জন কুটিরে বিরাট ধৈর্যসহকারে বছরের পর বছর ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকেন। এই সময় বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানটি অর্জন করা নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তবে আল্লাহ দুনিয়ার বিজ্ঞানীদেরকেও এই কাল বিষয়ে অখণ্ড জ্ঞানের কিছুটা ধারণা দেন। যোয়া দেখলে যেমন আগুনের অবস্থানটি বোঝা যায়, সেই রকম দুনিয়ার বিজ্ঞানীদেরকেও গবেষণার ফলটি রহমতরূপে দান করেন। কারণ, আল্লাহ জ্ঞানসন্ধানী গবেষকদেরকে নিরাশ করেন না। আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার অসীম। এই অসীম রহমতের ভাণ্ডার হতে যারা জ্ঞান-গবেষণায় ভূবে থাকে তাদেরকে বঞ্চিত করেন না। কিছু না কিছু তিনি দান করেন। এটাই আল্লাহর সুলত তথা নীতি। সুতরাং, স্থান-কালের উর্ধ্বের বিষয়টি কেমন এবং তার রহস্যই বা কেমন ইহা কেবল আল্লাহই জানেন। কিন্তু আল্লাহকে রবরূপে তথা প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করে নিতে পারলে এবং কাহাফবাসীর মতো নির্জন গুহায় ধ্যানসাধনা করলে রবের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া যায়। তাই ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি বলেছেন : যখন তোমার মাঝে তুমি সম্পূর্ণরূপে থাকবে না, তখনই তুমি সম্পূর্ণরূপে থাকবে। ইমামুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামির এই কথাগুলোর রহস্য অধম লেখকের পক্ষে বোঝাটা কষ্টকর। কারণ, কথায় আছে, সিংহই জানে বাঘের গায়ে কতটুকু শক্তি আছে, কিন্তু একটি ইঁদুর অথবা খরগোশের পক্ষে ইহা বোঝা অসম্ভব। সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দিন হাসান সানজারি বলতেন : ওই মানুষটাই সবচাইতে আরামে আছে, যে-মানুষটি জীবনেও আরাম পায় নি। ঢাকা শহরের চানখার পুলে বোরহান উদ্দিন কলেজের পাশেই টেলিফোনের খাম্বার পাশে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় নয় ডিগ্রি সেলসিয়াসের প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহের মধ্যেও করিম মাস্তান বলতেন : আমিই শাহেন শাহ। মানুষ দেখতে একই রকম, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্নে কত বিরাট পার্থক্য! সুতরাং, আল্লাহ এই মানুষকেই এমন অবস্থানে নিয়ে যান যাহা কালের অতীত এবং কল্পনারও বাহিরে।

২০. ইননাহম্ (নিশ্চয়ই তাহারা) ইন্ (যদি) ইয়াজ্হাকু (জানিতে পারে, টের পাওয়া, সম্মুখীন হওয়া, সাক্ষাৎ পাওয়া, আক্রমণ করা, সন্ধান পাওয়া, হৃদিস পাওয়া) আলাইকুম্ (তোমাদের উপর) ইয়ারজুমুকুম্ (পাথর মারিয়া তোমাদেরকে হত্যা করিবে, তোমাদেরকে পাথর মারিবে, তোমাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করিবে, তোমাদিগকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবে) আও (অথবা, কিংবা, বা, পক্ষান্তরে) ইয়ুইদুকুম্ (তোমাদেরকে ফিরাইয়া লইবে, তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনিবে, তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করাইবে, তোমাদেরকে আনিবে) ফি (মধ্যে, ভিতরে, অভ্যন্তরে) মিল্লাতিহিম্ (তাহাদের দল, তাহাদের সম্প্রদায়, তাহাদের জোট, তাহাদের পক্ষ, তাহাদের ধর্মীয় দর্শনে, তাহাদের ধর্মে, তাহাদের দ্বীনে) ওয়া (এবং) লান্ (কখনও না) তুফ্লিহ্ (তোমরা সাফল্য লাভ করিবে, তোমরা সফল হইবে) ইজান্ (তাহা হইলে, সেই ক্ষেত্রে, এমনভাবে, তাহাতে, ওইরূপ অবস্থায়, ওইরূপ ঘটিলে) আবাদান্ (কখনই, কখনো, কোনো সময়েই, কোনো কারণেই, কোনো অবস্থাতেই)।

স্ট নিশ্চয়ই তাহারা যদি জানিতে পারে তোমাদের উপর পাথর মারিবে অথবা তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনিবে তাহাদের দলের ভিতর এবং কখনও না তোমরা সাফল্য লাভ করিবে তাহা হইলে, কখনোই।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে, মূলত তিনশত নয় বছর পর মূর্তিপূজা ত্যাগ করে যে খ্রিস্টীয় তৌহিদবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই আম তৌহিদবাদী সমাজও ফানাকিল্লাহ মোকামে অবস্থান করা কাহাফবাসীদের গুঢ়

রহস্যগুলো গ্রহণ করে নিতে চাইবে না। কাহাফবাসীরা সম্পূর্ণরূপে খান্নাসমুদ্র তৌহিদের সর্বোচ্চ স্তরে তথা আবদুহর মোকামে অবস্থান করেন এবং এই কাহাফবাসী তথা আবদুহদের কর্মকাণ্ড সমাজের সাধারণ তৌহিদবাদীরা তো দূরে থাক, এমনকি জাদিরেল নবি-রসুলদেরও বুঝে উঠতে কষ্ট হয়। দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে যে আবদুহ নামের খিজির – তাঁকে হজরত মুসা (আ.)-এর মতো জাদিরেল নবিরও বুঝতে পারা তো দূরে থাক, বরং তিনি তিন-তিনবার ধৈর্যধারণের চুক্তিটিও ভঙ্গ করলেন। সুতরাং, এই কাহাফবাসী আবদুহদের তৌহিদি সমাজব্যবস্থার মধ্যেও অবস্থান করাটি একটি বিপজ্জনক বিষয়। তাই কাহাফবাসীদেরকে অত্যন্ত উদ্ভূতার সহিত এবং বিনয়ের নম্রতায় অতি সাবধানে কথা বলার উপদেশটি দেওয়া হয়েছে। নতুবা আদর্শের বিভিন্নতায় জনগণের কাহাফবাসীদেরকে বরদাস্ত করার বিষয়ে সমূহ সন্দেহ থেকে যায়। তাই কাহাফবাসীদেরকে এই বলে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে যে, তৌহিদি সমাজের মানুষেরা আবদুহদের এত উঁচু স্তরে অবস্থান করার দরুন তাদেরকে বুঝতে না পেরে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার সমূহ সম্ভাবনাটি থেকে যায়। তৌহিদি সমাজের অবস্থানটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কাহাফবাসীর মতো অতি উঁচু স্তরের ওলিদেরকে বুঝে ওঠাটা কষ্টকর। তাই আমরা দেখতে পাই : সর্বযুগে, সর্বকালে এবং এই অত্যাধুনিক যুগেও কাহাফবাসীর মতো অতি উঁচু স্তরের ওলিদেরকে গ্রহণ করে নিতে অথবা মেনে নিতে দারুণ কষ্ট হয়। সমাজ বৈষয়িক বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে তৌহিদে বাস করে, আর পক্ষান্তরে কাহাফবাসীর মতো অতি উঁচু স্তরের ওলিরা বৈষয়িক বিষয়ের ধারা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই দুই বিপরীতমুখী জীবন ও দর্শনের মাঝে সংঘর্ষের ঘনঘটা থাকতেই পারে। তৌহিদি সমাজ এ-রকম কাহাফবাসীর মতো অতি উঁচু স্তরের ওলিদের চালচলন কথাবার্তা হতে গুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈপরীত্যের গন্ধ খুঁজবে। তাই আল্লাহ কাহাফবাসীদেরকে এই আয়াতে সাবধানতা অবলম্বন করে চরম উদ্ভূতা প্রদর্শন করতে এবং বিনয়ের অসীম ধৈর্যধারণ করে সাবধানে চলার উপদেশটি দিচ্ছেন।

২১. ওয়া (এবং) কাজালিকা (ওইভাবেই [এই সামান্য শব্দটুকুর হুবহু অনুবাদ না করে কেমন করে 'এইভাবে' লেখা হয় ইহা দেখে অবাক হই এবং 'ওইভাবেই-কে 'এইভাবে' যারা লেখেন তাদের জন্য দুঃখ হয়]) আসারনা (আমরা জানাইলাম, আমরা অবগত করিলাম, আমরা জ্ঞাত করিলাম, আমরা বিদিত করিলাম, আমরা সংবাদ জ্ঞাপন করিলাম, আমরা প্রকাশ করিলাম) আলাইহিম (তাহাদের উপর) লিইয়ালাম (যাহাতে তাহারা জানে) আননা (অবশ্যই, নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে) ওয়াদলিহি (আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহর অঙ্গীকার, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি) হাককুন (সত্য, যথার্থ, প্রকৃত, নির্ভুল) ওয়া (এবং) আননা (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে) সাআতা (সাআত, কিয়ামত) লা (নাই) রাইবা (কোনো সন্দেহ, সংশয়, অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, ইতস্তত ভাব) ফিহা (উহার মধ্যে)।

স্ট এবং ওইভাবেই আমরা [হুবহুভাবে বলা হয়েছে] জানাইলাম তাহাদের উপর যাহাতে তাহারা জানে, অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং অবশ্যই সাআত, নাই কোনো সন্দেহ উহার মধ্যে।

+ ইজ (যখন) ইয়াতানাজাউনা (তাহারা পরস্পর বিতর্ক করিতেছিল, তাহারা একে-অপরের সাথে আলোচনা করিতেছিল, তাহারা বাদানুবাদ করিতেছিল, তাহারা তর্কাতর্কি করিতেছিল [এই কাহাফবাসীরা সর্বোচ্চ মোকামে আবদুহিয়াতে অবস্থান করছেন এবং তাহারা চক্রব্রূণের উপরেও চক্রব্রূণ। সুতরাং বিতর্ক করার বিষয়টি এখানে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। তবে ইচ্ছাকৃত তথা তাকিয়া গ্রহণ করে মানুষকে বোঝাবার প্রশ্নে সাংঘর্ষিক হয় না])

বাইনাহম (তাহাদের মধ্যে, তাহাদের মাঝে) আমরাহম (তাহাদের বিষয়ে, তাহাদের কাজে, তাহাদের ব্যাপারে) ফাকাল (সুতরাং তাহারা বলিল) ইবনু (তোমরা বানাও, তোমরা নির্মাণ করো, তোমরা তৈরি করো, তোমরা স্থাপন করো, তোমরা গড়, তোমরা প্রতিষ্ঠা করো) আলাইহিম (তাহাদের উপর) বুইয়ানান (অট্টালিকা, সোধ, প্রাসাদ, ইমারত, পাকা বাড়ি, হর্ম্য)।

প্ট যখন তাহারা একে-অপরের সাথে আলোচনা করিতোছিল তাহাদের মধ্যে তাহাদের কাজে, সুতরাং তাহারা বলিল তোমরা নির্মাণ করো তাহাদের উপর অট্টালিকা।

+ রাব্বুহম (তাহাদের রব, তাহাদের প্রতিপালক, তাহাদের সদাপ্রভু) আলাম (জানেন) বিহিম (তাহাদের সম্পর্কে, তাহাদের বিষয়ে, তাহাদের সম্বন্ধে)।

প্ট তাহাদের রব জানেন তাহাদের সম্পর্কে।

+ কালা (বলিল) আল্লাজিনা (যাহারা) গালাব (প্রবল হইল, বলশালী হইল, প্রচণ্ড হইল, তীব্র হইল, বিজয়ী হইল, জয়লাভ করিল, সফল হইল, প্রভাববিস্তারে সক্ষম হইল, বুঝাইয়া রাজি করাইতে সক্ষম হইল) আলা (উপর) আমরিহিম (তাহাদের কাজ, তাহাদের কর্ম, তাহাদের কার্য) লানাততাখিজাননা (অবশ্যই আমরা বানাইব, নিশ্চয়ই আমরা নির্মাণ করিব, অবশ্যই আমরা তৈরি করিব, নিশ্চয়ই আমরা প্রতিষ্ঠা করিব, অবশ্যই আমরা স্থাপন করিব, নিশ্চয়ই আমরা গড়িব) আলাইহিম (তাহাদের উপরে) মাসজিদান (মসজিদ)।

প্ট বলিল, যাহারা বিজয়ী হইল তাহাদের কাজের উপর, অবশ্যই আমরা বানাইব মসজিদ।

১ ব্যাখ্যা : পাঠকদেরকে বলে রাখতে চাই যে আল্লাহর কালামের এই আয়াতের মর্ম এবং গূঢ় রহস্য অধম লেখকের পক্ষে বোধগম্য হয় নাই। তাই বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে কিছুই লিখতে পারলাম না। এক কথায়, এই আয়াতের অর্থটি অধম লেখক বুঝতে পারি নি। চল্লিশ-বেয়াল্লিশটি কোরান-এর তফসির গাধার মতো খাটুনি দিয়ে গভীর মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করেও কিছুই বুঝতে পারলাম না। কাহাফবাসীরা যে-শহরটিতে প্রবেশ করেছিল উহার নাম ছিল দাক্বনুস। তিনশত নয় বছর আগের মুদ্রাটি দেখে যে হইচই পড়েছিল এবং গুপ্তধন পাবার সন্ধেহ পোষণটি করেছিল, কেহ-কেহ বলেন যে, ওই শহরে যে বাদশাহ ছিলেন উনার নাম দাকিয়ানুস। আবার, কোনো-কোনো তফসিরকারকেরা বলেন যে, সেই বাদশাহের নাম ছিল বন্ধসিস। তফসিরকারকদের মধ্যে বিরাট-বিরাট মতপার্থক্য দেখতে পাই। কেহ-কেহ বলেন, দাকিয়ানুস বাদশাহ মুসলমান ছিলেন, আবার কেহ-কেহ অস্বীকার করেন। তারপর, বন্ধসিস নামের বাদশাহ মুসলমান ছিলেন বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। এই দাকিয়ানুস নামক বাদশাহ এবং বন্ধসিস নামক বাদশাহ মুসলমান ছিলেন কি না ইহার মধ্যেও মতপার্থক্য দেখতে পাই। এইসব আজগুবি প্যাচাল লিখে পাঠকদের কী উপকার হবে অধম লেখকের জানা নাই। অবশ্য এই প্যাচালেরও প্রয়োজন আছে। কারণ, যে যে-রকম সে সে-রকমই বিষয়টিকে গ্রহণ করে নেবে। এতে সত্য থাক আর না-ই থাক এতে কিছু যায় আসে না। তবে যে-পাঠকেরা আন্তরিকভাবে সত্যসাগরে অবগাহন করীর তবে একদম নিরপেক্ষ হয়ে জন্মসূত্রে কাঁধের উপর পাওয়া ধর্মীয় সাইনবোর্ডটি ফেলে দিতে পেরেছেন কেবল তাদেরকেই বলছি, কোরান-এর এই আয়াতটির মর্মার্থ এবং গূঢ় রহস্য অধম লেখকের জানা নাই। তবে, শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি রচিত কোরান দর্শন নামের কোরান-তফসিরের দ্বিতীয় খণ্ডে এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি পড়ে দেখতে পারেন। ভালো

লাগলে ইঁহা পাঠকের তকদির এবং ভালো না লাগলে ইঁহাও তার তকদির। কারণ, চরম সত্যে কোনো গালি থাকে না, থাকে কেবল অনেক রকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উঁচু-নিচু ধাপগুলো।

২২. সাইয়াকুলুনা (তাহারা অবিলম্বে বলিবে, তাহারা দ্রুত বলিবে, তাহারা শীঘ্র বলিবে, তাহারা অচিরেই বলিবে, তাহারা সত্বর বলিবে) সালাসাতুর (তিন জন) রাবিউহুম (তাহাদের চতুর্থটি) কালবুহুম (তাহাদের কুকুর)।

প্ট তাহারা অবিলম্বে বলিবে তিন, তাহাদের চতুর্থটি তাহাদের কুকুর।

+ ওয়া (এবং) ইয়াকুলুনা (বলিবে) খামসাতুন (পাঁচ) সাদিসুহুম (তাহাদের ছয় নম্বরটি, তাহাদের ষষ্ঠটি) কালবুহুম (তাহাদের কুকুর) রাজমাম (না বুঝিয়া কথা বলা, অনুমানে কথা বলা, চিন্তাভাবনা না করিয়া কোনো কথা বলা, অনুমানের পাথর ছুঁড়িয়া মারা, প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা, অভিশাপ করা, মন্দ বলা) বিল্গাইবি (অজানা বিষয়, অজ্ঞাত বিষয়, অবিদিত বিষয়, অপ্ৰকাশিত বিষয়, জ্ঞানা যায় নাই এমন বিষয়, অবিজ্ঞাত বিষয়, প্রকাশিত বা ব্যক্ত হয় নাই এমন বিষয়, গুপ্ত বিষয়)।

প্ট এবং বলিবে, পাঁচ, তাহাদের ছয় নম্বরটি তাহাদের কুকুর, অনুমানে কথা বলা অজানা বিষয়ে।

+ ওয়া (এবং) ইয়াকুলুনা (বলিবে) সাবআতুন (সাত) ওয়া (এবং) সামিনুহুম (তাহাদের আট নম্বরটি) কালবুহুম (তাহাদের কুকুর)।

প্ট এবং বলিবে, সাত এবং তাহাদের আট নম্বরটি তাহাদের কুকুর।

+ কুল (বলো) রাবি (আমার রব, আমার প্রতিপালক, আমার সদাপ্রভু) আলামু (জানেন, অবগত আছেন, জ্ঞাত আছেন) বিইদদাতিহিম (তাহাদের সংখ্যা সম্পর্কে, তাহাদের হিসাব সম্পর্কে, তাহাদের রাশি বিষয়ে) মা (না) ইয়ালামুহুম (তাহারা জানে, তাহারা অবগত আছে, তাহারা জ্ঞাত, তাহারা বিদিত রহিয়াছে) ইল্লা (ব্যতীত, কিন্তু, একমাত্র) কালিলুন (সামান্য, অল্প, কমসংখ্যক, সামান্য ইজ্জতওয়ালা, খুব কম ইজ্জতওয়ালা, কতিপয়, অতি অল্প, কম)।

প্ট বলো, আমার রব জানেন তাহাদের সংখ্যা সম্পর্কে, তাহারা জানে না অল্প ব্যতীত।

+ ফালা (সূতরাং না) তুমারি (বিতর্ক, বিরোধ, মতবিরোধ, বাদানুবাদ, তর্ক) ফিহিম (তাহাদের মধ্যে) ইল্লা (ব্যতীত, কিন্তু, একমাত্র) মিরায়ান (আলোচনা, অনুশীলন, মতবিনিময়, পর্যালোচনা, যগড়া করা, এমন জিনিস সম্পর্কে যগড়া করা যার মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে) জাহিরান (প্রকাশ্য, খোলা, বাহ্যিক, জাহেরি)।

প্ট সূতরাং না মতবিরোধ তাহাদের মধ্যে প্রকাশ্য আলোচনা ছাড়া।

+ ওয়া (এবং) লা (না) তাসতাকুতি (তুমি জিজ্ঞাসা করো, তুমি তাহকিক করো) ফিহিম (তাহাদের মধ্যে) মিন্হুম (তাহাদের মধ্যে হইতে) আহাদান (একলা, এক, প্রথম, একা, কাহাকেও)।

প্ট এবং তুমি জিজ্ঞাসা করিও না তাহাদের মধ্যে তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে, কাহাফবাসীরা সংখ্যার দিক দিয়ে কয়জন ছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। একদল তিনজন, অপর দল পাঁচজন, অপর দল সাতজন – কিন্তু সংখ্যার বিষয়টি যে মোটেই গুরুত্ব বহন করে না তাই বলা হয়েছে, এদের সংখ্যাটি রবই জানেন। মানুষ আপন নফসের সঙ্গে খান্নাস-রূপী শয়তানটি থাকার দরুন গরুর বাছুরের চেয়েও অধিক চঞ্চল এবং প্রবৃত্তি নামক খান্নাসের পুজারি হয়ে যায়, তাই

কিংবদন্তিরূপে এই রকম কল্পিত কাহিনীগুলো নিয়ে তর্ক-বিতর্কে ডুবে থাকতে ভালোবাসে। কাহাফ ঘটনার আসল শিক্ষাটি এবং সেই শিক্ষায় কেমন করে শিক্ষিত হওয়া যায় সেই আসল বিষয়টিকে ফেলে দিয়ে কোনো মূল্য নেই এমন সব আঙ্গুণি তর্ক-বিতর্কেই তাদের কথাগুলো ফুটে ওঠে। মানুষ খুব কমই আসল শিক্ষাটিকে গ্রহণ করে, বরং কাহিনীকেই ধরে রাখতে চায়। এই কথাটুকু বোঝাবার জন্য প্রথমেই বলা হয়েছে - 'সাইয়াকুলুনা' তথা শীঘ্রই মানুষ আসল শিক্ষা হতে ছিটকিয়ে পড়ে উপাখ্যানের মধ্যে ডুবে থাকবে। আসল শিক্ষায় থাকে ত্যাগের মহড়া, উৎসর্গের উদ্দীপনার বাণী আর কাহিনী ও উপাখ্যানের মধ্যে থাকে আনন্দ পাবার ভোগ। তাই মানুষ খান্নাসের ওয়াসওয়াসায় কাহিনীর দিকেই ধাবিত হতে ভালোবাসে এবং ইহাই স্বাভাবিক। এখানে একটু খেয়াল করুন যে, সংখ্যার বিষয়টি সোজাসজি বলা হলো না। কারণ, ইহা অর্থহীন। কিন্তু সংখ্যার সাথে যে-কথাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তাহা বাদ পড়ে নাই।

প্রতিবারেই কুকুরকে সাথে নিয়েই সংখ্যার কথাটি বলা হয়েছে। যতবারই সংখ্যাটির কথা বলা হয়েছে ততবারই বহাল তবিয়তে কুকুরটিও সাথেই আছে। যদিও সংখ্যার কথাটি অর্থহীন, তবু পরোক্ষভাবে ইহার ইশারাটিও রয়ে গেছে। যেহেতু শেষ সংখ্যাটি সাত তাই খুব সম্ভবত তারা সাতজনই ছিলেন। এই আয়াতে কয়জন কাহাফবাসী ছিলেন এটাই বড় কথা নয়, বরং বড় কথাটি হলো, এই রকম কাহাফবাসী হবার রহস্যটি অর্জন করা একটি চিরন্তন বিষয় এবং ইহা একদম সার্বজনীন। কোনো গণ্ডির খণ্ডিত দর্শন দ্বারা কাহাফবাসীর দর্শনটিকে খণ্ডিত করা হয় নাই, বরং কাহাফবাসীর মতো ধ্যানসাধনা করার বিষয়টি আসল এবং মূল বিষয় ইহা আমরা জেনেও জানি না, আমরা বুঝেও বুঝতে পারি না, আমরা দেখেও দেখি না এবং শুনেও শুনি না। কেন? ওই অতি পুরাতন অতি প্রাচীন একটিমাত্র কথা, একটিমাত্র বাক্য, একটিমাত্র দর্শন - আর সেই দর্শনটি হলো : পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে অথবা সৃষ্টিলীলার লীলায়িত বহু রঙ-চঙগুলোকে বহু রূপে প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে আপন-আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার আশ্বাস। পবিত্র নফসটি বুঝতেই পারে না যে, আপন সত্তার অভ্যন্তরে খান্নাসটিকে মাখনের মতো মিশিয়ে একাকার করে রাখা হয়েছে। এই কাহাফবাসীর মতো চরকির বিরামহীন টানে দুধ হতে যে-রকম মাখন বেরিয়ে পড়ে সে-রকম আপন-আপন নফস হতে খান্নাসটিও বেরিয়ে পড়ে। এই ধ্যানসাধনার বিষয়টি কাহাফবাসীর মূল এবং একমাত্র দর্শন। তাই আমরা দেখতে পাই, মহানবির মতো নবিও, যিনি প্রথম মানব আদম (আ.) যখন মাটি ও পানিতে ভাসমান তখনও নবি, সেই মহানবি উম্মতদেরকে তথা অনুসরণকারীদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন, দেড় হাজার বছর আগে আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে একদম নির্জন অন্ধকার একটি গুহা - যার নাম হেরা, সেই গুহাতে পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে, এই গোপন রহস্য ভেদ করতে হলে নির্জন সাধনার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যথায়, অনেকগুলো কথার বস্তা, অনেকগুলো রেফারেন্স বইয়ের বস্তা, অনেক রকম কথার স্টাইল, অনেক রকম নাগরআলি আর সাগরআলির মতো ডুগডুগি বাজিয়ে মায়ার ডেক্সিবাজি দেখিয়ে শুধু মানুষকে বিভ্রান্ত করা।

তাই এই কাহাফ সূরাতে আমরা দেখতে পাই, যারা সাধক তাদেরকে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বরং ভয় পেয়ে যায় এবং কত রকম আত্মবিরোধের বুড়ি আবিষ্কার করতে থাকে।

বারবার কুকুরের কথাটি কেন বলা হচ্ছে? কুকুর একটি প্রভুভক্ত জীব। এই প্রভুভক্ত কুকুরের মতো আপন কামেল গুরুকে অনুসরণ করতে হয়, অথবা

কোনো কাম্মেল গুরুর সনদপ্রাপ্ত সাধক খলিফার অনুসরণ করতে হয়। যদি কোনো পীর-ফকির ধ্যানসাধনা করার শিক্ষাটি না দেন তা হলে সেই পীর-ফকির হতে তাড়াতাড়ি সরে পড়ুন। অনুষ্ঠানিক এবাদত-বন্দেগির রূপ দেখিয়ে যারা আসল বিষয়টি তথা ধ্যানসাধনার বিষয়টি ফেলে দেন তাদের থেকে সরে পড়ুন। জানি, সরে পড়াটি কষ্টকর, কিন্তু তকদির যদি সহায়ক হয় তা হলে সেই মুরিদ অবশ্যই সরে পড়বে – যদি সেই মুরিদের কোনো বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়াটি না থাকে। সরে পড়াটাও তকদির, আবার সরতে না পারাটাও একটি তকদির। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছি এটাও যে-রকম আমার তকদির সে-রকম, যিনি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন ওটাও তার তকদির। গৃহত্যাগ করা যায় সহজে, দেশত্যাগ করা যায় সহজে, কিন্তু তকদির বদল করা সহজ কথা নয়। ওই কাহাফের কুকুর কিতমির-এর মতো যে-মুরিদ ধৈর্যধারণ করে সাধনায় ধ্যানমগ্ন থাকবে, আল্লাহর রহমতের দরজাটি তৌ তারই জন্য খোলা থাকার কথা।

২৩. ওয়া (এবং) লা (না) তাকুলাননা (কখনও বলিও) লিশাইয়িন (কোনো বিষয়ে, কোনো কিছু, কোনো ব্যাপারে) ইন্নি (নিশ্চয়ই আমি) ফাইলুন (করা, কর্মসম্পাদনকারী, যিনি করেন, কারকণ, সম্পাদনকারী) জালিকা (ওইটা, উহা) গাদান (আগামীকাল, কেয়ামত, ভবিষ্যৎকাল)।

প্ট এবং কখনোই বলিবে না কোনো বিষয়ে, নিশ্চয়ই আমি করিব ওইটা (উহা) আগামীকাল।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে আল্লাহর কালামের মর্মটি অধম লিখকের বোধগম্য নহে। তাই ইহার ব্যাখ্যা লিখতে পারলাম না। হালকা-পাতলা অনেক রকম কথা অনেকেই লিখেছেন এবং সুন্দরও হয়েছে বলে মনে হয়েছে। কিন্তু, কোরান-এর চল্লিশ-বেয়াল্লিশটি তফসির পড়ে এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি আমার মনঃপূত হয় নি। এই আয়াতের শানে নজুল হিসাবে বলা হয়েছে যে, মহানবি-কে অবিশ্বাসী কুরাইশরা আসহাবুল কাহাফ, জুলকারনাইন ও রুহ বিষয়ে প্রশ্ন করলে ‘আগামীকাল ইহার জবাব দেব’ বলে তাদেরকে বিদায় করে দিয়েছিলেন।

মহানবি ভুলের বশবর্তী হয়ে ‘ইনশাল্লাহ’ তথা যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন – এই কথাটি বলেন নাই। এই ভুলের জন্য তখন পনের দিন পর্যন্ত মহানবির প্রতি ওহি অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ থাকে এবং মহানবি ওই সময় পর্যন্ত তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। এ-জন্যই নাকি এ-রকম আয়াতটি নাজেল হয়েছে। এই শানে নজুলটি উম্মাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজবংশের বিক্রি হয়ে যাওয়া আলেম-উলামাদের বানানো শানে নজুল কি না ইহা অধম লিখকের জানা নাই। মহানবিকে খাটো করার জন্য এই উম্মাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজবংশ কত রকম যে চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করেছে উহা ইতিহাসের পাতায় কিছু-কিছু সত্যিকার আলেম-উলামা ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজশক্তির প্রচণ্ড বলয়ের প্রচণ্ড চাপেও সেই সত্য কথাগুলো হারিয়ে না যাওয়ায় আমরা তা জানতে পারি। সুতরাং, এত তফসির এবং ইসলামের এত ইতিহাস পড়বার পরেও অধম লিখক পাঠকদেরকে জানিয়ে দিতে বাধ্য হলাম যে, এই আয়াতের মর্মটি আমার জানা নাই।

২৪. ইল্লা (ব্যতীত, কিন্তু, একমাত্র) আন (যে) ইয়াশা আল্লাহ (আল্লাহ ইচ্ছা করিলে) ওয়া (এবং) ইজ্জুর (জিকির করো, স্মরণ করো, স্মৃতিতে আনো, ধ্যান করো) রাব্বাকা (তোমার রব, তোমার প্রতিপালক, তোমার সদাপ্রভু) ইজ্জা (যখন, তখন, ওই সময়, হঠাৎ) নাসিতা (তুমি ভুলিয়া যাও) ওয়া (এবং) কুল (বলো) আসা (নিকটে, শীঘ্রই, সম্ভবত, আশা করা যায়, সন্দেহ, খটকা) আন (যে) ইয়াহদিইয়ানি (আমাকে সঠিক পথ দেখাইবেন)

বাবুবি (আম্মার রব, আম্মার প্রতিপালক, আম্মার সদাপ্রভু) লিআক্‌রাবা (নৈকট্যের জন্য, নিকটবর্তী, কাছাকাছি, সামীপ্যের জন্য) মিন্ (হইতে) হাজ্জা (ইহা) রাশাদান (স্বচ্ছতা, মঙ্গল, পথপ্রাপ্তি, সত্য)।

প্ট আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন (তাহা) ব্যতীত এবং জিকির করো তোম্মার রবকে যখন তুমি ভুলিয়া যাও এবং বলো, সম্ভবত যে আম্মাকে সঠিক পথ দেখাইবেন আম্মার রব ইহা হইতে সত্যের নৈকট্যের জন্য।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, দায়েমি সালাত তথা যোগাযোগ ছাড়া ভবিষ্যৎকাল সম্বন্ধে কোনো কিছুই নিশ্চিত করে বলা ঠিক নয়। আপন রবের অনুমতি নিয়ে বলা চলে। রবের সঙ্গে যখন যোগাযোগটি কায়েম হয়ে যায় তখন ভবিষ্যতে কী করা হবে অথবা না করা হবে তা আপন রবই নিয়ন্ত্রণ করেন। অধিক নৈকট্যের বিষয়টি আশা করতে চাইলে সে যেন রবের জিকির করে তথা স্মরণ করে।

বুখারি ও মুসলিম শরিফ-এ বর্ণিত আছে যে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন যে, মহানবি বলেছেন, একবার হজরত সোলায়মান (আ.) বলেছিলেন, 'আজ রাতে আমি আম্মার সত্তরজন বিবির সাথে সঙ্গম করিব।' অন্য বর্ণনায় নব্বইজন স্ত্রী, আরেক বর্ণনায় একশতজন স্ত্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেক স্ত্রী এমন একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেবে যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে। সেই সময় এক ফেরেশতা সোলায়মান নবিকে বললেন, 'আপনি ইনশাল্লাহ বলুন।' কিন্তু, সোলায়মান নবি 'ইনশাল্লাহ' বললেন না। তারপর তিনি সত্তর হতে একশ স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করলেন, কিন্তু কারও পেটেই বাচ্চা রইল না। কেবলমাত্র একজন স্ত্রী অর্ধেক সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন। এভাবে এই সুন্দর অপূর্ব হাদিসখানা মহানবির নামে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ইহার বর্ণনাকারী সহি বুখারি ও মুসলিম শরিফ।

হায় রে খোদা! কী সুন্দর আম্মাদের ভাগ্য যে এই জাতীয় অপূর্ব হাদিসগুলো আম্মাদের পড়তে হয়! অধম লিখক বলতে চাই না যে, এক রাতে সত্তর হতে একশ বার বীর্যপাত করলে শরীরের অবস্থা কেমন হবে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহার সত্যতা কতটুকু উহা চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের হাতেই তুলে দিলাম। সত্তর হতে একশ বিবির সঙ্গে মিলনে বীর্যপাত এবং সেই বীর্যপাতে সব বিবির পেটে বাচ্চা থাকতো, কিন্তু হজরত সোলায়মান নবির মতো জাদুরেল নবি 'ইনশাল্লাহ' শব্দটি ইচ্ছা করে না বলার দরুন কোনো বিবিরই পেটে বাচ্চা রইল না। আবার একজন ফেরেশতা এ-রকম জাদুরেল নবিকে 'ইনশাল্লাহ' বলার উপদেশটি খয়রাত করছেন। এই জাতীয় অনেক রকম কথা তুলে ধরতে পারি। কিন্তু অধম লিখকের বিবেকের রুচিতে লিখতে চায় না। তা হলে লিখলাম কেন? সামান্য একটু এই জাতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে পাঠকদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাইলাম যে, এইসব কথার মর্মার্থ অধম লিখকের জানা নাই।

অনেক ইসলামি গবেষক হজরত সোলায়মান নবিকে আদর্শের প্রতিমূর্তি বানাতে গিয়ে বলে ফেলেছেন যে, তিনি ঝুড়ি বানিয়ে বাজারে বিক্রি করে যে-পয়সা উপার্জন করতেন উহাতে সংসার চালানো হতো। এই সামান্য ব্যতির টাকায় একশত বিবির সংসার কেমন করে চালানো হতো, ইহাও অধম লিখকের জানা নাই।

হিন্দু ধর্মের জন্ম যখন হয় তখন যে-চাউলকে সেদ্ধ করে আম্মরা ভাত তৈরি করে খাই সে চাউলও আবিষ্কার হয় নাই। এই কথাটির সত্যতা যাচাই করতে যদি চান তাহলে গাজীপুরে অবস্থিত ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে গেলেই পরিষ্কার জানতে পারবেন। এখন চিন্তা করুন, যে-যুগে চাউলই আবিষ্কার হয় নি তারও প্রায় আনুমানিক হাজার বছর আগে রীম-লক্ষ্মণের পিতা রাজা দশরথের তিনশত পঞ্চাশ জন স্ত্রী ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের নিরানব্বই জন পুত্র এবং একমাত্র কন্যা

দুঃশলা ছিলেন। গ্রিক পুরাণে রাজা জিউসের হাজার-হাজার স্ত্রী ছিল, তবে হেরা নামক স্ত্রীকে রাজা জিউস এতই ভালোবাসতেন যে স্ত্রী হেরার কথায় উঠতেন-বসতেন। প্রাচীন মিশরের রাজা তুতেন খাম্মেনের পিতা-মাতা ছিলেন আপন ভাই-বোন। এই যুগে এটা কল্পনা করাও কষ্টকর। আবার আমাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে চাচাতো ভাই-বোন, মামাতো ভাই-বোন, খালাতো ভাই-বোন এবং ফুফাতো ভাই-বোনদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একদম স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা এই রকম বিবাহ বন্ধনটি কল্পনাও করে না। সুতরাং, সময়কালের বিবর্তন এবং বিশেষ-বিশেষ পরিবেশে বিশেষ-বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানগুলো সমাজের বুকে ফুটে ওঠে। সুতরাং, নেতিবাচক চিন্তাধারা পরিহার করে ইতিবাচক চিন্তাধারায় দেখতে গেলে আমরা দেখতে পাই সবই একেরই লীলাখেলা।

২৫. ওয়া (এবং) লাবিস (তাহারা ছিল, তাহারা অবস্থান করিয়াছিল, তাহারা বাস করিয়াছিল, তাহারা স্থিতিবান ছিল) ফি (মধ্যে) কাহফিহিম (তাহাদের কাহাফে, তাহাদের গুহায়, তাহাদের গিরিগুহায়, তাহাদের পর্বতকন্দরে, তাহাদের গহ্বরে) সালাসা (তিন) মিনাতিন (শত) সিনিনা (বহুর, সন, অর্ধ, বারমাস, বৎসর) ওয়া (এবং) ইজ্জাদু (বাড়াইয়া লও, বৃদ্ধি করিয়া লও, বর্ধিত করো) তিসআন (নয়)।

প্ট এবং তাহারা অবস্থান করিয়াছিল তাহাদের কাহাফের মধ্যে তিনশত বছর এবং বাড়াইয়া লও নয় (বহুর)।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে সৌরমাস হিসাবে গণনা করতে গেলে হয় তিনশত বছর। রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে কাহাফবাসীদের অবস্থান এবং রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা সৌরমাস হিসাবে তাদের বছর গণনা করত। পক্ষান্তরে, আরববাসীরা চান্দ্রমাস হিসাবে বছর গণনা করত। সুতরাং, এই ওহির মাঝে সেই দিনের আরববাসীরা যে-ভুলটি খোজার চেষ্টা করত – কারণ, চান্দ্রমাসের হিসাবে বছর গণনা করতে গেলে তিনশত নয় বছর হয় – তাই আল্লাহ নয় শব্দটি দিয়ে বাড়িয়ে নেবার উপদেশটি দিয়েছেন, যাতে সন্ধেহপ্রবণ আরববাসীদের সন্ধেহটির চিরতরে অবসান হয়। বিষয়টি যাই হোক না কেন, সন্ধেহের গুরুত্বটি লক্ষ্য করেই নয় বছর বাড়িয়ে নেবার কথাটি বলা হয়েছে। কারণ, সেই দিনে মহানবির (সা.) সামান্য দোষ বা খুঁত খোজার জন্য বিরোধীরা অধীর আগ্রহ প্রকাশ করত। সেই অধীর আগ্রহের মাথায় এভাবেই বাড়ি দেওয়া হয়েছে।

২৬. কুলিন (বলো) -লাহ (আল্লাহ) আলামু (জানেন, অবগত আছেন, জ্ঞাত রহিয়াছেন, বিদিত আছেন) বিমা (যাহা, ওই বস্তু হইতে) লাবিসু (তাহারা অবস্থান করিয়াছিল, তাহারা ছিল, তাহারা বাস করিয়াছিল, তাহারা স্থিতিবান ছিল) লাহ (তাহার জন্য, তাহার) গাইবুস (গায়েব, অদৃশ্য, অজ্ঞাত, ভবিষ্যতে যা ঘটবে সেই সমস্ত বিষয়, মানুষের জ্ঞান এবং অনুভূতির উপরের জ্ঞান, বাতেনি জ্ঞান, অদৃশ্যের জ্ঞান) সাম্মাওয়াতি (আকাশসমূহ, মনগুলি) ওয়াল্ (এবং) আরদি (পৃথিবী, জমিন, মাটি, দেহ)।

প্ট বলো, আল্লাহ জানেন যাহা তাহারা অবস্থান করিয়াছিল, তাহার জন্য গায়েব আকাশ এবং পৃথিবী।

+ আবসির বিহি (কী অদ্ভুত দেখেন, কত সুন্দরভাবে দেখেন, কতই না সুন্দর দেখেন, কত সুন্দর দ্রষ্টা, কত চমৎকারভাবে দেখেন, কত সূক্ষ্মভাবে দেখেন, কত তীক্ষ্ণভাবে দেখেন, কত নিখুঁতভাবে দেখেন) ওয়া (এবং) আস্মি (শোনা, শ্রবণ করা, কর্ণপাত করা, কত সুন্দর শোনে)।

প্ট কত সুন্দরভাবে দেখেন এবং কত সুন্দরভাবে শোনে!

+ মা (নাই) লাহ্ম (তাহার জন্য) মিন্দুনিহি (তিনি ছাড়া, তিনি ব্যতীত, তিনি ভিন্ন, তিনি বিনা, তিনি বাদে) মিন্ (হইতে) ওয়ালিয়িন্ (অভিভাবক, সাহায্যকারী, বন্ধু, কর্তা, রক্ষণাবেক্ষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক, আশ্রয়দাতা, মিত্র, সুহৃদ, হিতৈষী, আল্লাহর মনোনীত বান্দা) ওয়া (এবং) না (না) ইয়ুশরিকু (তিনি শরিক করেন, তিনি অংশীদার করেন, তিনি ভাগীদার করেন) ফি (মধ্যে) হুকুমিহি (তাহার হুকুমে, তাহার কর্তৃত্বে, তাহার নিয়ন্ত্রণে, তাহার শাসনে, তাহার আদেশে, তাহার আজ্ঞায়, তাহার অনুমতিতে) আহাদান্ (কাহাকেও)।

পট নাই তাহার জন্য তিনি ছাড়া অভিভাবক এবং না তিনি শরিক করেন তাহার হুকুমের মধ্যে কাহাকেও।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা কাহাকে অবস্থান করেন তথা রহস্যলোকে অবস্থান করেন তাদের বিষয়ে যারা খান্নাস তথা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছে, তাদেরকে বুঝবার জ্ঞানের বাইরে রাখা হয়েছে। কারণ, খান্নাস-রূপী মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ চোখ-কান উহার রহস্য বুঝতে পারে না এবং শ্রবণ করার শক্তিটি থাকে না। কারণ, রহস্যলোকের জ্ঞানটি যে একমাত্র আল্লাহর। তাই কোরান-এ বলা হয়েছে, ওটা দেখতে ও শুনতে চাইলে আল্লাহর দ্বারা দেখ ও শোন। কারণ, আল্লাহ বলেছেন যে, বান্দা আমার এত নিকটে এসে পড়ে যে, বান্দার জিহ্বা আমার জিহ্বা হয়ে যায়, বান্দার চোখ-কান-নাক আমারই হয়ে যায়, কিন্তু খান্নাসের মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে মানবের ইন্দ্রিয়গুলোর রহস্যলোকে প্রবেশ করার বিধানটি আল্লাহ নিজেই রাখেন নি। তাই মানুষ যখন আল্লাহর গুণে গুণাবৃত হয়ে যায় তখন তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও সব রকম অনুভূতির আল্লাহর দর্শন-শ্রবণ জ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। সেই মানুষটি তখন আল্লাহকে দিয়ে দেখে এবং আল্লাহকে দিয়ে শোনে এবং আল্লাহকে দিয়ে বোঝে। একজন খান্নাসমুক্ত তথা মায়ার বন্ধন হতে মুক্ত নফসটির ইন্দ্রিয়গুলো তখন আল্লাহর গুণাবলির সঙ্গে মিশে গিয়ে অতীত, ভবিষ্যৎ, দূর-নিকট, জাহের-বাতেন সবই পরিষ্কারভাবে দেখতে ও বুঝতে পারে। ইহাই এক কথায় আল্লাহর গুণে গুণাবৃত হওয়া, আল্লাহর রঙে আপন নফসটিকে রাঙিয়ে নেওয়া। যতদিন খান্নাস-রূপী শয়তানটি নফসের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে থাকে ততদিন অতীত-ভবিষ্যৎ, দূর-নিকট, জাহের-বাতেন ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে পারে না এবং বুঝবার বিধানটিও রাখা হয় নি। সুতরাং, ধ্যানসাধনা ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে রহস্যলোকের সত্যের মাঝে নিমজ্জিত হওয়া অসম্ভব। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রহস্যলোকের কিছু কথা জানা যায় অথবা বলা যায়। এই রকম জানা ও বোঝাটি বই-পড়া ইমানের ওপর নির্ভরশীল এবং এই বই-পড়া ইমান যে-কোনো সময়, যে-কোনো মুহূর্তে, যে কোনো পরিবেশে ভেঙে যেতে পারে এবং মতামতের ওলট-পালটও হতে পারে। কিন্তু আইনুল একিন তথা চোখে দেখা ইমানের বিষয়টি ভেঙে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং, কাহাফবাসীদের মতো অথবা হেরা গুহার মতো যে-কোনো নির্জন স্থানে একাকী ধ্যানসাধনা ছাড়া রহস্যের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া যায় না। নফস যখন খান্নাস-রূপী শয়তানের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে তথা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন অন্ধকার আবরণের মাঝে অন্ধের মতো সব কিছু হাতড়াতে থাকে এবং কথার নাগরআলি-সাগরআলিতে পরিণত হয়। এরাই মতপার্থক্য তৈরি করে, এরাই বিভেদের নানা রকম প্রাচীর দাঁড় করায়, এরাই এক ইসলামের মধ্যে নানা রকম ফেরকাবাজি তৈরি করে। জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে থেকে স্থূল সংবাদ সংগ্রহ করা ছাড়া এদের আর কোনো উপায় থাকে না।

দেখা এবং শোনা এই দুটো কথা উদাহরণ মাত্র। সুতরাং, আপন নফস হতে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে খাল্লাস-রূপী শয়তানকে তাড়িয়ে দিতে পারলে নুরে মুহাম্মদির রহস্য অবলোকন করা যায়। অধম লেখকের বাবা মুসলমান – সুতরাং, অধম লেখকও মুসলমান। হিমালয় পর্বতের চেয়েও শক্ত এই তকদির। সুতরাং, আমি অধম লেখক নুরে মুহাম্মদি বললাম এবং অন্য যে-কোনো ধর্মের অনুসারী তার প্রভুর নুরে নুরময় হবার কথাটি বললে কোনো দোষের বিষয় বলে মনে করি না। কোরান-এর অন্যত্র বলা হয়েছে, বিশ্বাসীর মুরুবি হলেন আল্লাহ আর অবিশ্বাসীদের মুরুবি হলো তাণ্ডত তথা আপন নফস তথা খাল্লাস-রূপী শয়তানের ওয়াসওয়াসা। যারা বিশ্বাসী তারা রবের দ্বারা দেখে ও শোনে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো অভিভাবক বা বন্ধু থাকে না। সর্বঅবস্থায় আল্লাহই তাদের অভিভাবক হয়ে তাদেরকে পরিচালনা করেন।

২৭. ওয়াতুল (এবং তেলাওয়াত করো, এবং আবৃত্তি করো এবং পাঠ করো) যাহা (যাহা) উহিয়া (ওহি করা হইয়াছে, ওহি করিয়াছেন, প্রত্যাদেশ করিয়াছেন, দৈববাণী হইয়াছে, বাণী আসিয়াছে) ইলাইকা (তোমার দিকে) মিন (হইতে) কিতাবি (কিতাব) রাব্বিকা (তোমার রব, তোমার প্রতিপালক, তোমার সদাপ্রভু)।

প্ট এবং তোমরা তেলাওয়াত করো যাহা ওহি করিয়াছেন তোমার দিকে কিতাব হইতে তোমার রব।

+ লা (নাই) মুবাদদীলা (পরিবর্তনকারী, বদলকারী, রূপান্তরকারী, অবস্থান্তরকারী) লিকালিমাতিহি (তাঁহার কালামসমূহ, তাঁহার বাণীসমূহ, তাঁহার বাক্যসমূহ, তাঁহার শব্দসমূহ, তাঁহার কথাগুলি)।

প্ট নাই পরিবর্তনকারী তাঁহার কালামসমূহের।

+ ওয়া (এবং) লান (কখনোই না) তাজ্জিদা (তুমি পাইবে) মিনদুনিহি (তাঁহাকে ব্যতীত, তাঁহাকে ছাড়া, তাঁহার স্থলে, তাঁহার জায়গায়) মুলতাহীদান (আশ্রয়স্থল, আশ্রয়ের স্থান, অবলম্বন, শরণ, আশ্রয়)।

প্ট এবং কখনোই তুমি পাইবে না তাঁহাকে ব্যতীত আশ্রয়স্থল।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন আসবে, কিতাব বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ইহা কি কাগজ-কালিতে লেখা কিতাব, নাকি আল্লাহর নুরময় প্রকাশ ও বিকাশের কিতাব? কারণ, সেই যুগের কাগজ-কালিতে লেখা কিতাবের সংখ্যা খুব অল্পই ছিল বলে মনে হয়। তারপরেও আরেকটি প্রশ্ন আসে যে মহানবি (সা.) উম্মি ছিলেন তথা কাগজ-কালিতে লেখা কিতাব তিনি পড়তে পারতেন না। সুতরাং, নির্দিধায় বলা চলে যে, এই আয়াতের উল্লিখিত কিতাবটি আল্লাহর নুরময় বিকাশ ও প্রকাশের কিতাব, যাহা অনেকেরই ধারণায় আসতে চায় না। এবং যারা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আল্লাহর আপন ইচ্ছায় রহমত লাভ করেছেন তারাই এই কিতাবের রহস্যটি বুঝতে পারেন। আমরা তথা অধম লেখক এখানে অনুমানের ভিত্তিতে ঢিল ছোঁড়া ছাড়া আর কীইবা লিখতে পারি! কারণ, অন্ধ কখনও সত্যের মাপকাঠি হয় না। কাগজ-কালিতে লেখা অথবা অন্য কিছুতে লেখা আল্লাহর কিতাবগুলোর মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অভিযোগটি দেখতে পাই, যদিও কোরান নামক কিতাবের মধ্যে এই রকম ঘটনার অবতারণা হবার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য নাজ্জেলের ধারাবাহিকতার প্রশ্নে কিছুটা এদিক-সেদিক হয়েছে, কিন্তু কোরান নামক কিতাবের কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয় নাই। নবিদের বিশেষ একটি সন্মান আল্লাহ দিয়েছেন, তাই নবিদের নিকট আগত বাণীকে ‘ওহি’ বলা হয়, কিন্তু আল্লাহর গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফদের নিকট যে-বাণীর আগমন ঘটে তাঁহাকে ‘ওহি’ না বলে ‘এলহাম’ বলা হয়ে থাকে। যদিও নামের এ-রকম কোনো ভাগ করে কোরান-এ দেখানো হয় নাই।

আল্লাহর ওলি-গাউস-কুতুব-আবদালরাই নবিদের সম্মানকে আলাদা করে দেখাবার জন্য এই বিভাজনটি করে গেছেন, কিন্তু কোরান উভয় ক্ষেত্রে একই শব্দ ব্যবহার করেছে এবং সেই শব্দটি হলো 'ওহি'। আবার, আরেকটি পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সুরা নাহল-এ মোম্মাহির কাছেও যে ওহি নাজিল করা হয়েছে উহাও দেখতে পাই। আবার, কোনো-কোনো নবির মায়ের নিকট ওহি নাজিল করার কথাটিও কোরান-এ দেখতে পাই। যদিও শব্দ চয়নের প্রশ্নে একমাত্র 'ওহি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সম্মানের এবং মর্যাদার প্রশ্নে বিভাজন করাটা স্বাভাবিকভাবেই অত্যাৱশ্যক। তা ছাড়া আরেকটি কথা পাঠকদের জ্ঞানিয়ে রাখতে চাই যে, পৃথিবীতে যে-কয়টি ভাষা অতি সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, তার মধ্যে আরবি ভাষা একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। কিন্তু, এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবি ভাষাটি যে এত গরিব ভাষা ইহা অধম লেখকের জ্ঞান ছিল না। কারণ, একটি শব্দের দ্বারা অনেক রকম অর্থ হয়। যেমন, 'দারবুন' তথা পেটানো অথবা মারা শব্দটি দিয়ে কমপক্ষে একশত রকম অর্থ হয়। এ জন্যই বোধহয় ফেরকাবাজির বিভিন্নতা দেখতে পাই। তারপরেও বলতে হয় যে, রবের কথা বদলিয়ে নিলে উহা আর রবের কথা না হয়ে মানুষের কথাতে পরিণত হয়ে যায়।

আল্লাহর কিতাবরূপী নুরি বিকাশ ও প্রকাশের ধারাটিকে বদলানো যায় না এবং বদলাবার প্রশ্নই ওঠে না। উহা অনন্তকাল একই রূপে কার্যকর ভূমিকা নিয়ে ছুটে চলছে। পরিশেষে, আল্লাহর এত উপদেশ, এত কথা, এত সাবধানতার বাণী, এত ভীতি প্রদর্শনের বাণী, এত সুসংবাদ বহনকারী বাণী – সব কিছুর মূলে মাত্র একটি কথাই, আর সেই কথাটি হলো : আপন নবির নফস হতে খান্নাস-রূপী শয়তানটি, যে নফসের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আছে এবং একজন দুইজনে পরিণত হয়ে আছে, সেই খান্নাস-রূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার আস্থানটি হলো চূড়ান্ত আস্থান। ইহাই জেহাদ। ইহাই জেহাদে আকবর। অস্ত্রের জেহাদকে অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হতে দেখি, কিন্তু নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসকে তাড়িয়ে দেবার জেহাদটি সার্বজনীন এবং এই সার্বজনীন কথাটির দ্বারা অনেক কিছু বোঝানো হয়ে থাকে। যে-ইজম তথা মতবাদে আপন নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার ফর্মুলাটি দেওয়া হয়েছে উহাই সার্বজনীন।

২৮. ওয়াস্বির (এবং ধৈর্যসহকারে, এবং ধৈর্য রাখিয়া, এবং সহিষ্ণুতা সহকারে, এবং অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা লইয়া, এবং সহ্য করিবার ক্ষমতাসহ, এবং ধীরতাসহকারে, এবং সহনশীল হইয়া, এবং নিজেকে স্থির রাখিয়া) নাফসাকা (তোমার নফস, তোমার জীবাত্মা, তোমার অন্তরপ্রকৃতি, তোমার নিজেকে [এখানে 'রুহাকা' বলা হয় নি। কারণ, রুহ প্রাণ নয়, বরং আল্লাহর আদেশ। আল্লাহ প্রাণ ফুৎকার করেন না। কারণ, আদমের আগেই আল্লাহ কাক সৃষ্টি করেছিলেন। কাকের মধ্যে প্রাণ আছে, কিন্তু রুহ নাই এবং কাকের মধ্যে রুহ ফুৎকার করার প্রশ্নই ওঠে না। অনেকেই নফস আর রুহের পার্থক্যটি বুঝতে না পেরে ভজঘট পাকিয়ে ফেলেন। ইহাতে পাঠকও বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়।) মাত্মাল (সাথে, সঙ্গে, সহিত) -লাজিনা (যাহারা) ইয়াদউনা (ডাকে, আস্থান করে, সম্বোধন করে, স্মরণ করে) রাব্বাহুম (তাহাদের রবকে, তাহাদের প্রতিপালককে, তাহাদের সদাপ্রভুকে) বিল্গাদাতি (সকালে, প্রভাতে, প্রাতঃকালে) ওয়াল্ (এবং) আশিইয়ি (সন্ধ্যায়, দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে, সাবের বেলায়) ইউরিদুনা (তাহারা চায়, তাহারা সন্ধান করে, তাহারা আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা কামনা করে, তাহারা প্রত্যাশা করে, তাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা বাসনা করে) ওয়াজ্হাহ (তাহার [আল্লাহর] চেহারা, আল্লাহর চেহারা,

আল্লাহর মুখমুগ্ধল) ওয়া (এবং) লা (না) তাদু (ফিরাইয়া লওয়া, উপেক্ষা করা, সরাইয়া লওয়া) আইনাকা (তোমার দুই চোখ) আনহুম (তাহাদের হইতে)।

* এবং ধৈর্যসহকারে রাখো তোমার নফসকে (তাহাদের) সাথে যাহারা ডাকে তাহাদের রবকে সকালে এবং সন্ধ্যায়, আল্লাহর চেহারা চাহিয়া এবং সরাইয়া লইও না তোমার দুই চোখ তাহাদের হইতে।

+ তুরিদু (তুমি চাও, তুমি খোজো, তুমি সন্ধান করো, তুমি পাইবার চেষ্টা করো, তুমি কামনা করো, তুমি পাইতে ইচ্ছা করো) জিনাতান (শোভা, ধুমধাম, ঘটা, জাঁকজমক, আড়ম্বর) হায়াতিদু (জীবনের) দুনিয়া (দুনিয়া, ইহ, পার্থিব, জাগতিক, ঐহিক, এই জনমের)।

* চাহিয়া আড়ম্বর জীবনের (অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবনের আড়ম্বর চাহিয়া)।

+ ওয়া (এবং) লা (না) তুতি (আনুগত্য করা, অনুসরণ করা, মানিয়া চলা, আজ্ঞা পালন করা) মানু (যাহার) আফালনা (আমরা গাফেল বানাইয়াছি, আমরা গাফেল করিয়া দিয়াছি, আমরা অমনোযোগী করিয়া দিয়াছি, আমরা অবহেলাকারী বানাইয়াছি) কাল্বাহ (তাহার কলবকে, তাহার অন্তরকে, তাহার হৃদয়কে, তাহার মনকে) আন (হইতে) জিক্রিনা (আমাদের জিকির, আমাদের স্মরণ) ওয়াত্‌তাবাআ (এবং অনুসরণ করে, এবং আনুগত্য করে, এবং অনুগত থাকে, এবং অনুগমন করে, এবং অনুসরণ করে, এবং অনুসারী হয়) হাওয়াহ (তাহার প্রবৃত্তির, তাহার খেয়াল-খুশির, তাহার প্রবণতার, তাহার অভিরুচির, তাহার স্পৃহার) ওয়া (এবং) কান্না (হইয়াছে) আমরুহ (তাহার কাজ, তাহার কর্ম, তাহার কার্যকলাপ) ফুরতান (সীমাছাড়া, সীমালঙ্ঘনমূলক, সীমা অতিক্রমকারী, চৌহদ্দি ছাড়া)।

* এবং অনুসরণ করিও না যাহাকে আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] গাফেল করিয়া দিয়াছি তাহার কলবকে আমাদের [বহুবচন] জিকির হইতে এবং (যে) অনুসরণ করে তাহার খেয়াল-খুশির এবং যাহার কাজ সীমা ছাড়াইয়াছে।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে প্রথমেই একটু বিশেষভাবে লক্ষ করে দেখুন যে, ‘এবং ধৈর্যসহকারে রাখো তোমার নফসকে (তাহাদের) সাথে যাহারা ডাকে তাহাদের রবকে সকালে এবং সন্ধ্যায়।’— এই আয়াতের প্রথমেই আল্লাহ উপদেশ দিচ্ছেন আপন নফসকে, কিন্তু আপন রুহকে উপদেশ দেবার কথাটি এই আয়াতে তো দূরের কথা, বরং কোরান-এর একটি স্থানেও পাবেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনটি এতই সূক্ষ্ম যে আমাদের অনেকের চোখেই ধরা পড়ে না। যেহেতু নফস জীবাত্মা, পঙ্কাত্মরে রুহ পরমাত্মা তথা স্বয়ং আল্লাহ, সুতরাং রুহকে উপদেশ দেওয়ার মানেটাই হলো আল্লাহকে উপদেশ দেওয়া। তাই যত আদেশ, উপদেশ, ভয়-ভীতি ইত্যাদি বিষয়গুলো নফসকেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং রুহকে উপদেশ দেবার প্রশ্নই আসে না।

এখানেই নফস এবং রুহের মাঝে বিরাট-বিশাল পার্থক্য। নফসের বিষয়টিতে ‘ইন্দা’ তথা ‘ভিতরে’ শব্দটি দেখতে পাই। কিন্তু রুহের বিষয়ে ‘ইন্দা’ শব্দের বদলে ‘ইলাইহে’ তথা ‘দিকে’ অথবা ‘নিকটে’ শব্দটি পাওয়া যায়। তাই আল্লাহ সেই সকল নফসদেরকে ধৈর্যধারণ করে তাদেরই সাথী হবার উপদেশটি দিচ্ছেন যে-সকল নফস আল্লাহর চেহারা লাভের জন্য সকল-সন্ধ্যা তথা দিবানিশি তথা সব সময় দায়েমি সালাতে রত আছে, তাদের আপন-আপন চেহারাগুলোকে রবের চেহারায় পরিণত করার জন্য সাধনায় রত আছে। যে-সকল সাধকদের চেহারা আপন-আপন রবের চেহারায় পরিণত হয়ে গেছে তারা তো অনেক উঁচু স্তরের ওলি এবং এই উঁচু স্তরের ওলিদের কথাটি বাদ দিয়ে যারা দিবারাগ্নি রবকে ডেকে চলছে রবের চেহারা লাভের জন্য, তাদেরকে অনুসরণ করার উপদেশটি এখানে দেওয়া হচ্ছে। সাথী হতে গেলেই

অনুসরণ এবং অনুকরণের প্রয়োজন হয় এবং কেমন করে রবের চেহারাটি লাভ করা যায় তার গোপন ভেদরহস্যগুলো জেনে নেবার জন্যই সাথী হবার উপদেশটি দেওয়া হয়েছে।

যে-নফসগুলোকে আল্লাহ উপদেশ দিচ্ছেন সেই নফসগুলোকে শিষ্য তথা মুরিদ তথা অনুসারী বলা হয়। আর যারা দিবানিশি ধ্যানসাধনার মাধ্যমে রবের চেহারাটি লাভ করার প্রচেষ্টায় রত আছেন তাদেরকেই গুরু বলা হয়েছে তথা পীর ও মুরশিদ বলা হয়েছে। বাংলার বিখ্যাত বাউল সম্রাট লালন সাঁইজির অনেক গানে এই কথাগুলোর রহস্য ফুটে ওঠে। কেউ ধরতে পারে, আবার কেউ পারে না। ধরতে পারাটাও তকদির এবং না পারাটাও তকদির। এই তকদির হিমালয় পর্বতের চেয়েও কঠিন ও শক্ত এবং ইহাকে ভেঙে ফেলে ধৈর্যসহকারে তাদেরই সাথী হতে বারবার আল্লাহ আত্মান করছেন যারা রবের চেহারাটি লাভ করার জন্য দিবানিশি এবাদত-বন্দেগি তথা ধ্যানসাধনায় রত আছেন। এই কথাগুলো কি কেবলই বাউলসম্রাট সাঁইজি লালনের গানেই পাই, নাকি পাঞ্জাবের বাবা বুলুলে শাহর গানে, সিন্ধু প্রদেশের শাহ আবদুল লতিফ ভিটাইয়ের গানে, দিল্লির বাবা আমির খসরুর গানে, বাবা মটকী শাহের গানে, বাবা শাহ সুফি ফতেহ আলি শাহর গজলে, মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির কবিতায়, বাবা শামসে তাবরিজের দিওয়ান-এ, বাবা শরফুদ্দিন বু আলি শাহ কলন্দরের দিওয়ান-এ, সুলতানুল হিন্দ খাজা মঈনুদ্দিন হাসান সানজারির দিওয়ান-এ দিবালোকের মতো চোখে আঙুল দিয়ে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির। এই হিমালয় পর্বতের মতো কঠিন ও শক্ত তকদিরকে পাশ্চাত্যের জন্য এবাদত-বন্দেগি তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে গুরু তথা পীর ও মুরশিদের সাথী হয়ে রবের চেহারাটি লাভ করার আত্মানটি করা হয়েছে। এই আত্মান সার্বজনীন। গণ্ডির বলয়ে সীমিত দেয়ালে এই আত্মানটিকে বেঁধে রাখা যায় না। এই আত্মানটি পরিপূর্ণরূপে সার্বজনীন তথা সবার জন্য। কী সুন্দর ভাষায় আল্লাহ উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, তোমাদের চোখ, তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁদের থেকে ফিরিয়ে নিয়ো না যারা দিবানিশি এবাদত-বন্দেগি তথা ধ্যানসাধনায় মগ্ন আছেন। তারপর আল্লাহ আরও খোলাশা করে বলে দিয়েছেন যে, দুনিয়ার সৌন্দর্য, দুনিয়ার মাধুর্য তোমার দৃষ্টিভঙ্গিকে, তোমার দর্শনকে ছিনিয়ে নিতে পারে তথা কেড়ে নিতে পারে, কারণ দুনিয়ার সৌন্দর্য অত্যন্ত লোভনীয় সৌন্দর্য এবং এ লোভনীয় সৌন্দর্য কণিকের খেলা, কিছুকণের তামাশা। কেন এই কথা বলা হলো? কারণ, আপন-আপন নফসের সঙ্গে খান্নাস-রূপী শয়তানটিকে মিশিয়ে একাকার করে রাখা হয়েছে। এই খান্নাসই দুনিয়ার লোভনীয় সৌন্দর্যের দিকে বারবার ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণা দিয়ে যাবে। এই খান্নাসের কুমন্ত্রণার খপ্পরে পড়ে অনেক নফস ধোকা খেয়ে চলছে এবং এই ধোকা খাবার পরিণামটি মৃত্যু ঘটবার আগে অসহায়ের মতো চাহনির মাঝে ফুটে ওঠে। আল্লাহ উপদেশ দিচ্ছেন এই বলে যে, যে-নফসে তথা যে-অন্তরে আল্লাহর জিকির ও সংযোগ থাকে না সে গাফেল তথা পথচ্যুত। তারপর বলা হয়েছে, এই সকল গাফেল নফসগুলো তথা মানুষগুলো আপন-আপন খেয়াল-খুশির অনুকরণ-অনুসরণ করে চলে। অন্যত্র প্রবৃত্তির এই খেয়াল-খুশিমতো চলাকৈই মূর্তিপূজা বলা হয়েছে। সুতরাং, আসল মূর্তিটি নফসের তথা মানুষের অন্তরে থাকে। আর বাহিরের মূর্তিটি হলো প্রতীকী উপস্থাপন। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। হিমালয় পর্বতের চেয়েও শক্ত ও কঠিন এই তকদিরকে তখনই ভেঙে ফেলা যায় যখন আল্লাহর বিশেষ রহমতটি রহিম-রূপে নাজেল করা হয়। কারণ, আমিত হতে মুক্তিলাভ করাটি রহিম-রূপী আল্লাহর দান। কারণ, এই

দান ক্রমার পরেই করা হয় আর যে-দান সবার জন্য সেই দানটি রহমান-রূপে দান করা হয়। সুতরাং, গফুরর রহমান কখনোই হয় না, বরং গফুরর রহিম হতে হবে। এ যেন অকশান্তের দুই যোগ দুই সমান সমান চার ইবার মতো। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির। সুতরাং, চরম পর্যায়ে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে বিক্ষুব্ধ ভুল নেই এবং থাকতে পারে না। আধার আছে বলেই আলোর পরিচয়। মিথ্যা আছে বলেই সত্যের পরিচয়। অবগুষ্ঠন আছে বলেই মুক্তির প্রয়োজন। সামরির চঞ্চলতার প্রতীক বাহুর-পূজা আছে বলেই ধীর-স্থির-অচঞ্চল ধৈর্যসহকারে ধ্যানসাধনা তথা এবাদত-বন্দেগির প্রয়োজন।

যদি ছয় কোটি বছর এবাদত-বন্দেগি করার পরেও গাণ্ডিবের পুত্র আজাজিল ফেরেশতাদের সর্দার হয়েও আদম (আ.)-কে সেজদা দিয়ে ফেলতো তা হলে বিষয়টা কোন দিকে গড়াতো? যদি সত্যদ্রুটা আদম - যার মাঝে নুরে মুহাম্মদি মণ্ডলুদ আছে এবং যার মধ্যে নুরে মুহাম্মদি তিনিই তো সত্যের মাপকাঠি, নুরে মুহাম্মদি-বর্জিত অন্ধ কখনোই সত্যের মাপকাঠি হয় না। সুতরাং, সত্যদ্রুটা আদম, নুরে মুহাম্মদি যে-আদমের ডেতরে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত, তিনি যদি বলেই ফেলতেন যে, আমি নিষিদ্ধ বৃক্ষের আশ্বাদ গ্রহণ করব না, তা হলে বিষয়টা কোন দিকে গড়াতো? সুতরাং, আল্লাহর এই লীলাখেলা, এই রূপবৈচিত্র্যের বিভিন্নতা, এই চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের বিকাশ ও প্রকাশ গবেষণা করতে গেলে সুম্মা আরজিল বাশারা হালতারামিন ফতু - তথা, গবেষণার প্রচণ্ড গভীরে প্রবেশ করতে পারলে নিজের দৃষ্টি নিজের কাছেই ফেরত আসে এবং বলে ফেলে যে, তোমার সৃষ্টি নিখুঁত এবং অপূর্ব।

২৯. ওয়া (এবং) কুলিল (বলো) হাক্কু (সত্য, নির্ভুলতা, যথার্থতা, বাস্তবতা, ঠিক, প্রকৃত) মির (হইতে) রাববিকুম (তোমাদের রবের, তোমাদের প্রতিপালকের, তোমাদের সদাপ্রভুর)।

প্ট এবং বলো, সত্য তোমাদের রব হইতে।

+ ফা (সুতরাং, অগত্যা, অতএব, যে, এই জন্য, কাজে-কাজেই) মান (যে) শাআ (ইচ্ছা করে, বাঞ্ছা, স্পৃহা, অভিপ্রায়) ফালইউমিন (সুতরাং ইমান আনয়ন করুক, সুতরাং ইমান আনুক, সুতরাং ইমানের কাজ করুক, সুতরাং বিশ্বাস করুক) ওয়া (এবং, আর, ও, অধিকন্তু) মান (যে) শাআ (ইচ্ছা করে) ফালইয়াক্ফুর (সুতরাং অস্বীকার করুক, সুতরাং কুফরি করুক, সুতরাং সত্য প্রত্যাখ্যান করুক, সুতরাং অমান্য করুক)।

প্ট সুতরাং যে ইচ্ছা করে - ইমান আনয়ন করুক এবং যে ইচ্ছা করে - কুফরি করুক।

+ ইনুনা (নিশ্চয়ই আমরা) আতাদনা (আমরা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আমরা তৈরি করিয়া রাখিয়াছি, আমরা আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি, আমরা সাজাইয়া রাখিয়াছি, আমরা নির্মাণ করিয়াছি, আমরা বানাইয়াছি, আমরা গঠন করিয়াছি) লিজ্জালিমিনা (জালেমদের জন্য, অপরাধীদের জন্য, অন্যায়কারীদের জন্য, নীতিলঙ্ঘনকারীদের জন্য) নারান্ (আপ্তন, অগ্নি) আহাতা (সে ঘিরিয়া লয়, বাগে আনে, পরিবেষ্টন করে, জাকিয়া বসে) বিহিম (তাহাদেরকে) সুরাদিকুহা (যে বস্তু অন্য বস্তুকে ঘিরিয়া রাখে তাহাকে 'সুরাদেক' বলা হয়, চরি দেওয়াল, সামিয়ানা, তাবু, আপ্তনের চার দেওয়াল, যাহার ঘনত্ব অথবা মোটাত্ব তথা পুরুত্ব চল্লিশ বছরের দুরত্ব)।

প্ট নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তৈরি করিয়া রাখিয়াছি জালেমদের জন্য আপ্তন, সে ঘিরিয়া রাখিবে তাহাদেরকে চার দেওয়ালে।

+ ওয়া (এবং) ইন্ (যদি) ইয়াস্তাগিসু (তাহারা আশ্রয় চায়, সাহায্য চায়, তাহারা চিৎকার করে) ইউগাসু (তাহাদেরকে দেওয়া হইবে, তাহাদেরকে সাহায্য করা হইবে) বিমায়িন্ (পানির দ্বারা) কালমুহলি (গলিত তাম্রা, তেলের গাঁদ) ইয়াশয়িল (ভাজিয়া যাইবে, ভুনা হইয়া যাইবে, পুড়িয়া যাইবে) উজুহা (তাহাদের চেহারা, তাহাদের মুখমণ্ডল)।

প্ট এবং যদি তাহারা চিৎকার করে তাহাদেরকে দেওয়া হইবে, গলিত তাম্রার মতো পানির দ্বারা পুড়িয়া যাইবে তাহাদের চেহারা।

+ বিসাস (কত নিকৃষ্ট, কত মন্দ) শারাব (পানীয় [অনেকেই ‘শারাব’ বলতে মদ জাতীয় নেশার ধারণা করে ও বুঝতে চায়। কিন্তু ‘শারাব’ শব্দটির নিছক অর্থটি হলো পানীয়])।

প্ট কত নিকৃষ্ট পানীয়।

+ ওয়া (এবং) সাআত্ (অতিশয় খারাপ, খুব মন্দ, খুবই নিকৃষ্ট) মুরতাকাকান্ (নিবাস, আবাসস্থল, আশ্রয়স্থল, বিশ্রামের স্থান)।

প্ট এবং খুব খারাপ বিশ্রামের জায়গা।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, সত্যের আগমন হয় প্রতিপালক রব হতে। সব রকম মন্দ এবং মিথ্যাগুলো আমাদের নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসেরই তৈরি। কারণ, খান্নাস সব রকম অপকর্মের প্রতিমূর্তি। সুতরাং, জগতের যত প্রকার আকাম-কুকামের জনক হলো এই খান্নাস, যে-খান্নাস বাহিরে না থেকে প্রতিটি মানুষের পবিত্র নফসের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে পবিত্র নফসটিকে দূষিত করে ফেলে। খালি চোখে দেখলে মনে হবে একটি নফস তথা একটি মানুষ তো একাই অবস্থান করছে, কিন্তু এই একা মানুষটির সঙ্গে যে খান্নাস মিশে আছে ইহা সহজে ধারণায় আসতে চায় না। যেহেতু আমি নফস এবং খান্নাস দুজনেই অবস্থান করছি, সেই হেতু আমি যদিও দেখতে একা, আসলে একা নই, বরং দুইজন। কোরান-এর অন্যত্র বলা হয়েছে যে, দুইজন ডাক দিলে আল্লাহ শোনে না এবং শুনবার বিধানটি রাখা হয় নি। তাই একা, কেবলই একা ডাকতে বলা হয়েছে। এবং সত্যিই খান্নাসমুক্ত হয়ে একা ডাক দিতে গেলে সঙ্গে-সঙ্গে আল্লাহ জবাব দেবার অঙ্গীকারটি ঘোষণা করেছেন। এই খান্নাসকে সঙ্গে রেখে দিবানিশি যত এবাদত-বন্দেগি করি না কেন, যত কুদুম-চাদুমই করি না কেন, যত পরহেজগারের লেবাসই পরি না কেন – সেই ডাকের জবাব পাবার বিধানটি আল্লাহ রাখেন নি। এত চিন্তাচিন্তি, এত আদেশ-উপদেশ, এত ভয়-ভীতি, এত কথার সতুপের মাঝে মাত্র একটি আদেশ, একটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে আর সেই উপদেশটি হলো – তুমি তথা তোমার নফসটিকে খান্নাসমুক্ত করে তোমার প্রতিপালক রবকে ডাক দিলে রব সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেবার অঙ্গীকার করেছেন। রবের এই অঙ্গীকার যে নিরেট একটি সত্য উহা তখনই সাধক মর্মে-মর্মে বুঝতে পারেন যখন নিজ কানে আল্লাহর জবাবটি শুনতে পান। ইহাই আইনুল একিন। ইহাই চোখে দেখার ইমান। এই ইমান কোনোদিন, কোনো কালেও ভাঙে নাই, ভাঙে না এবং ভাঙবেও না।

হজরত আমির খসরুর আবিষ্কৃত ঠুমরি রাগের বৈশিষ্ট্যটি হলো : মাত্র একটি লাইন, মাত্র একটি বাক্য – যেমন ‘দেখো রিনা মানে সাম্মা’ – মাত্র চারটি শব্দের দ্বারা ছোট্ট একটি বাক্য, অথচ এই চারটি শব্দের বাক্যটিকে ওস্তাদ নাজাকাত আলি এবং ওস্তাদ সালামত আলি আড়াই হাজার বিভিন্ন সুর ও তালে গেয়ে গেছেন। সুর আর তাল আড়াই হাজার অথচ বাক্য মাত্র একটি। সমগ্র কোরান বিরাট একটি গ্রন্থ এবং নিঃসন্দেহে কোরান একটি বিজ্ঞানময় পবিত্র গ্রন্থ। তাই কোরানকে কোরানুল হাকিমও বলা হয়। কত বাক্যের গাঁথুনি,

কত রকম উপহার দৃষ্টান্ত দাঁড় করানো, কত রকম আদেশ-উপদেশ, কত রকম ভয়-ভীতি প্রদর্শন, কত রকম সুসংবাদের বারতা – কিছু মূলে একটিমাত্র কথা, একটিমাত্র দর্শন, একটিমাত্র অস্তিত্ব আর সেটাই হলো : তোমার আপন নফস হতে খান্নাস-রূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দাও, নতুবা মুসলমান বানিয়ে ফেল।

৩০. ইনুনা (নিশ্চয়ই) লাজিনা (যাহারা) আম্মান (ইমান আনিয়াছে) ওয়া (এবং) আম্মিলুস (কর্ম করা, কাজ করা, কার্যসাধন করা) সালিহাতি (ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ, সং) ইনুনা (নিশ্চয়ই [বহুবচনে বলা হয়েছে] আম্মরা) লা (না) নুদিউ (আম্মরা নষ্ট করি, আম্মরা বিনষ্ট করি, আম্মরা ধ্বংস করি, আম্মরা ক্ষয় করি, আম্মরা বিলোপ করি, আম্মরা সংহার করি, আম্মরা বিনাশ করি) আজরা (পুরস্কার, প্রতিদান, কর্মফল, শ্রমফল, পারিশ্রমিক, পারিতোষিক) মান্ (যে) আহ্সানা (উত্তমরূপে করে, ভালো করে, সুন্দর করে) আম্মালান্ (কাজ, কর্ম, কার্য)।

শ্রী নিশ্চয়ই যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং ন্যায়পরায়ণ কর্ম করিয়াছে নিশ্চয়ই আম্মরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] ধ্বংস করি না পুরস্কার যে ভালো কাজ করে।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়ের উপর আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতিটি সমানভাবেই খাটে। প্রথমেই বলতে হয়, বৈষয়িক বিষয়গুলোর উপর যারা সং এবং মহং কাজ করে যায় তাদের পারিশ্রমিক কখনোই নষ্ট করা হয় না। বৈষয়িক জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে সং থাকা এবং মহং কাজ সম্পাদন করা মোটেই একটি মামুলি বিষয় নয়। কারণ, লোভ-মোহ নামক ইন্দ্রিয়গুলোর পরিচালক খান্নাস-রূপী শয়তান হতে মুক্ত হয়ে এই কাজগুলো করতে হয়। মহং কাজ ইমানেরই একটি অঙ্গ, তাই ইমানের সঙ্গে আম্মলে সালেহাকে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। স্বর্ণ আসল না নকল উহা আঙুলে দিলেই ধরা পড়ে, আর মানুষ সং কি-না স্বর্ণ হাতে দিলেই ধরা পড়ে। এই কথাটি বৈষয়িক বিষয়ের সত্যতার প্রক্ষেপে মাপকাঠি রূপে ধরা যেতে পারে। অপরপক্ষে, যারা ইমান আনয়ন করেছে তথা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে আপন পবিত্র নফস হতে অপবিত্র খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার মহড়ায় অথবা মুসলমান বানাবার প্রচেষ্টায় রত আছে তাদের এই কর্মগুলোকেও আম্মলে সালেহা বলা হয় এবং এই জাতীয় আম্মলে সালেহার মাঝে যারা ধ্যানসাধনায় রত আছে তাদের পারিশ্রমিক, তাদের পুরস্কার পাবার কথাটিও আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন। এই বিরাট ধৈর্য, এই বিরাট ধ্যানসাধনা আল্লাহ কোনোদিনই ধ্বংস করে দেন না। এই অঙ্গীকারটুকু আম্মরা এই আয়াতে পাই।

৩১. উলাইকা (উহারাই তাহারা, তাহারা সবাই) লাহম্ (তাহাদের জন্য) জান্নাতু (জান্নাতসমূহ, জান্নাতগুলি, সব জান্নাত) আদুনি (থাকা, বসবাস করা, কোনো স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করা, চিরস্থায়ী, অনন্ত, অবিনশ্বর, শেষহীন, অক্ষয়, স্থিতিশীল, প্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তনীয়, শাস্ত, চিরন্তন, নিত্য) তাজুরি (বহুমান, নির্গত, প্রচুর সরবরাহ, প্রবাহিত) মিন্ (হইতে, থাকিয়া) তাহতিহিমুল্ (তাহাদের পাদদেশ, তাহাদের তলদেশ, তাহাদের নিচে, তাহাদের নিম্নদেশ, তাহাদের মূলদেশ) আনহারু (নহরসমূহ, ঝরনাসমূহ) ইউহাল্লাওনা (তাহাদেরকে গহনা পরানো হইবে, তাহাদেরকে অলঙ্কার পরানো হইবে) ফিহা (উহার মধ্যে, তাহার মধ্যে) মিন্ (হইতে) আসাওয়িরা (কঙ্কণ, চুড়ি, কজ্জির গহনা, ব্রেসলেট) মিন্ (হইতে) জাহাবিন্ (সোনার, স্বর্ণের, কাঞ্চনের, হেমের, হিরণ্যের, কনকের) ওয়া (এবং) ইয়াল্বাসুনা (তাহাদেরকে পরিধান করানো

হইবে, তাহাদেরকে পরানো হইবে, তাহাদের অঙ্গে ধারণ করানো হইবে, তাহাদেরকে আবৃত করা হইবে) সিয়াবান (কাপড়, বস্ত্র, পরিধেয়, আচ্ছাদন, পোশাক) খুদরান (সবুজ, তাজা, টাটকা, সতেজ, জীবন্ত, হরিৎ, শ্যামল) মিন (হইতে) সুন্দুসিন (পাতলা রেশম, মিহি রেশম, এক প্রকার কাপড়, সোনালি টিস্যু, স্বর্ণাভ, সুক্ষ্ম রেশম) ওয়া (এবং) ইস্তাবরাকিম (মোটো রেশম, পুরু রেশম, স্থূল রেশম) মুতাকিয়রা (হেলান দিয়া বসা, গদির উপর ভরকারীগণ, বালিশের উপর ঠেস দিয়া বিশ্রামকারীগণ, ঠেস দিয়া বসা) ফিহা (উহার মধ্যে) আলান (উপরে) আরায়িকি (মহীয়ান সিংহাসনসমূহের, তখত, খাট, পালক যার পর্দা থাকে, শাহী মসনদসমূহের, উচ্চ সিংহাসনসমূহের)।

প্ট উহারাই তাহারা, তাহাদের জন্য জান্নাতসমূহ চিরস্থায়ী, তাহাদের তলদেশ হইতে প্রবাহিত নহরসমূহ, তাহাদেরকে গহনা পরানো হইবে উহার মধ্য হইতে সোনা হইতে (তৈরি) কঙ্কণ এবং তাহাদেরকে পরানো হইবে কাপড় মিহি রেশম হইতে এবং মোটা রেশম হইতে, হেলান দিয়া বসিবে উহার মধ্যে – সিংহাসনের উপরে।

+ নিমাস (নেয়ামত) সাওয়াবু (সওয়াবের)।

প্ট সওয়াবের নেয়ামত।

+ ওয়া (এবং) হাসুনাত (সুন্দর) মুরতাকাকান (আশ্রয়স্থল, বিশ্রামস্থল, আরামের জায়গা)।

প্ট এবং সুন্দর আরামের জায়গা।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে প্রথমেই সাধকদেরকে জান্নাতের সুসংবাদটি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জান্নাতের সঙ্গে স্থায়ী অথবা চিরস্থায়ী কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, জান্নাতে প্রবেশ করাটি কি কখনও অস্থায়ী হতে পারে? অথবা জান্নাত হতে বাহির করে দেবার প্রশ্নটি কি থাকে? যেহেতু, চিরস্থায়ী শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে সেই হেতু অস্থায়ী কথাটি এসে যায়। যেমন, আমরা বলে থাকি কোরান শরিফ। অথচ ‘শরিফ’ তথা পবিত্র শব্দটি কোরান-এর একটি স্থানেও ব্যবহার করা হয়নি, বরং বলা হয়েছে কোরানুল মাজিদ, কোরানুল করিম, কোরানুল মবিন, কোরানুল হাকিম এবং আরও দু’টি নামে যা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। সেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে অনেক ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে। তা হলে বোঝা গেল যে, জান্নাতেও অনেক ঝরনার প্রবহমান সত্তার স্বীকৃতিটি পাওয়া গেল। সেই জান্নাতে তাদেরকে সোনার চুড়ি পরানো হবে। সোনার চুড়ি তথা সোনার কঙ্কণ তো স্নেহেরকেই পরতে দেখি, কিন্তু জান্নাতে যে পুরুষদেরকেও সোনার চুড়ি পরানো হবে এই আয়াতে এই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা গেল। আবার, বলা হয়েছে যে তাদেরকে মোটা ও পাতলা রেশমের কাপড় পরানো হবে – অথচ এই রেশমের পোশাক দুনিয়ার জীবনে পরিধান করাটি কতটুকু সমর্থনযোগ্য উহা পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম। তারপরে তাদের আরামদায়ক গদিওয়ালা খাটের ওপর হেলান দিয়ে অবস্থান করার কথাটিও বলা হয়েছে। এখানে একটি কথা বলে রাখতে চাই যে, মহানবি (সা.)-কে এক সাহাবা প্রশ্ন করেছিলেন এই বলে যে, জান্নাতের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যদি আসমান-জমিনে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে তা হলে দোজখের স্থানটি কোথায়? মহানবি (সা.) সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে, দিন আসলে রাত্রি কোথায় যায় এবং রাত্রি আসলে দিন কোথায় যায়? এই কথাটির ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না। কারণ, যে যতটুকু বোঝে ততটুকুই তার জন্য মঙ্গল।

জান্নাতি পুরুষদেরকেও যে সোনার চুড়ি পরানো হবে এবং মোটা-পাতলা নানা রকম রেশমের তৈরি কাপড় পরানো হবে এবং স্বর্ণ-রৌপ্যে নির্মিত চোখ ঝলসানো গদিওয়ালা খাটের উপর হেলান দিয়ে বসবে এবং পাদদেশে অনেক

ঝরনার স্রোতধারা বয়ে চলবে - ইহা সত্যিই একটি উত্তম প্রতিদান এবং কতই না সুন্দর এবং উত্তম আবাসস্থল। এখানে সামান্য একটু লক্ষ্য করবার বিষয়টি হলো, তুলা দিয়ে তৈরি সুতা - সেই সুতা যতই মিহি অথবা মোটা হোক না কেন - সেই সুতা দিয়ে তৈরি কাপড় পরানো হবে না। দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞান্নাতি হবার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কী বিশাল পার্থক্য! এবং এটা আপেক্ষিকতার দর্শনে ভাসমান কিনা, অধম লেখকের জানা নাই।

৩২. ওয়াদ (এবং) -রিব (পেশ কর, বর্ণনা কর, দাখিল কর, নিবেদন কর, উপস্থাপন কর, সম্মুখে স্থাপন কর, উত্থাপন কর, অবতারণা কর, প্রস্তাব কর, আনয়ন কর) লাহম (তাহাদের জন্য) মাঙ্গালান (উদাহরণ, প্রমাণস্বরূপ নিদর্শন, দৃষ্টান্ত, উপমা, নজির, বক্তব্য বিশদ করিবার জন্য বা তাহার সমর্থনের জন্য অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ, তুলনা, সাদৃশ্য) রাজুলাইনি (দুই ব্যক্তি, দুইটি মানুষ, দুইটি লোক, দুইজন) জাআলনা (আমরা দিয়াছি, আমরা দান করিয়াছি, আমরা করিয়াছি, আমরা করিয়া দিয়াছি, আমরা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি) লিআহাদিহিমা (তাহাদের দুইজনের একজনের জন্য) জান্নাতাইনি (দুইটি জ্ঞান্নাত, দুইটি বাগান, দুইটি উদ্যান, দুইটি বেহেশত, দুইটি বাগিচা, দুইটি উপবন) মিন্ (হইতে) আনাবিন্ (আঙুরের) ওয়া (এবং) হাফাফনাহমা (আমরা তাহাদের দুইজনকে ঘেরাও করিয়াছি, আমরা তাহাদের দুইজনকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছি) বিনাখলিন্ (খেজুর গাছ দিয়া) ওয়া (এবং) জাআলনা (আমরা দান করিয়াছি) বাইনাহমা (দুয়ের মাঝে, উভয়ের মধ্যে, দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে) জারআন্ (শস্যক্ষেত্র, ফসলের ক্ষেত)।

প্ট এবং উপস্থাপন কর তাহাদের জন্য দুই ব্যক্তির একটি উদাহরণ, আমরা দান করিয়াছি তাহাদের দুইজনের একজনের জন্য দুইটি আঙুরের বাগান এবং আমরা তাহাদের দুইজনকে ঘেরাও করিয়াছি খেজুর গাছ দিয়া এবং আমরা দান করিয়াছি উভয়ের মধ্যে ফসলের ক্ষেত।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লেখা অধম লেখকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে বিভিন্ন তফসিরকারীর তফসির হতে অনুমানের ঢিল ছুঁড়তে পারি। তবে পাঠক, এই আয়াতের রহস্যময় ব্যাখ্যাটি যদি একান্তই জানার আগ্রহ থাকে তা হলে সুফিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ বলে যাকে মনে করা হয় সেই হজরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবির ফতুহাতে মক্কিয়া পড়ে দেখতে পারেন। অথবা শাহ সুফি

সদর উদ্দিন আহমদ চিশতির কোরান দর্শন নামক কোরান-এর তফসিরটি পড়ে দেখতে পারেন। তবে ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবিকে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাকের বলে অভিহিত করেছেন। ইসলামের মধ্যে এত ফেরকাবাজির গুঁতাগুঁতিতে সরল পাঠকেরা কোনটা গ্রহণ করে নেবে এই বিষয়ে অনেক সময় হতাশ হয়ে পড়েন। তবে যে যেমন সে তেমনটি বেছে নেবেন। ইহাই তকদিরের লীলাখেলা।

৩৩. কিলতাল্ (উভয়, দুইটি, যুগল, দুই, একজোড়া, যুগ্ম) জান্নাতাইনি (দুইটি জ্ঞান্নাত, দুইটি উদ্যান, দুইটি বাগান, দুইটি বেহেশত, দুইটি উপবন) আতাত (দান করি, দেওয়া, সে আনিল, সে আসিল) উকুলাহা (তাহার ফল) ওয়া (এবং) লাম্ (নাই) তাজ্লাম্ (কমাইয়া দেওয়া, জুলুম করা, লোকসান করা) মিন্হ (উহার মধ্যে, তাহাতে) শাইয়ান্ (কিছু)।

প্ট উভয় জ্ঞান্নাত দিত ফল এবং কম দিত না উহার মধ্যে কিছু।

+ ওয়া (এবং) ফাজ্জারনা (সুতরাং আমরা বহাইয়া দিয়াছি, সুতরাং আমরা প্রবাহিত করিয়াছি) খিলালাহমা (তাহাদের দুইজনের বা দুইটির মধ্যে) নাহারান্ (নহর, ঝরনা)।

পট এবং সুতরাং আমরা বহাইয়া দিয়াছি তাহাদের মধ্যে নহর।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের শাস্তিক অর্থ করা গেলেও ইহার ভেতরের অর্থটি তথা আসল অর্থটি তথা মর্মার্থটি অধম লেখকের জানা নাই। তবে পাঠকদের কাছে অনেক রকম তথা চল্লিশ-বিয়াল্লিশ রকম তফসির হতে হরেক রকম ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরতে পারতাম। এ-জন্যই করি নাই যে, ইহা হতো অধম লেখকের দৃষ্টিতে একটি গুলম্বারা বিদ্যা।

৩৪. ওয়া (এবং) কানা (ছিল) লাহ (তাহার, তাহার জন্য) সাম্মারুন (ফলসমূহ, অনেক ফল [ভাবার্থে কেহ লেখেন : প্রচুর উৎপাদন, কেহ লেখেন : প্রচুর ধনসম্পদ])।

পট এবং ছিল তাহার জন্য ফলসমূহ।

+ ফাকাল (সুতরাং বলিল) লিসাহাবিহি (তাহার সাথীকে, তাহার সঙ্গীকে, তাহার সহচরকে, তাহার সহযোগীকে) ওয়া (এবং) হয়া (সে, তিনি) ইউহাওয়িরুহ (আলাপ করিতেছিল, জবাব দিতেছিল, আলোচনা করিতেছিল, পারস্পরিক প্রমাণ, পরস্পর যুক্তি, পারস্পরিক তর্ক, পরস্পর বিচার, ফিরাইয়া দেওয়া, কম হওয়া, কাপড় ধুইয়া সাফ করা) আনা (আমি) আকসারু (অধিক, অধিকতর, বেশি, অনেক বেশি, অত্যধিক, অত্যন্ত বেশি, প্রয়োজনের চাইতে বেশি) মিনকা (তোমা হইতে) মালান (সম্পদ, অগাধ সম্পদ, ধন-সম্পদ, সমৃদ্ধি, ধনদৌলত) ওয়া (এবং) আআজ্জু (বেশি শক্তিমান, বেশি ইজ্জতওয়ালা, অধিক শক্তিশালী) নাকারান (অনেক মানুষ, জনবল, জনশক্তি, বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন জামাত, জিনদের জামাত)।

পট সুতরাং বলিল তাহার সাথীকে এবং সে আলাপ করিতেছিল (এই বলিয়া যে), আমি তোমা হইতে বেশি সম্পদের (মালিক) এবং জনবলে বেশি শক্তিশালী।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে প্রথমেই দেখতে পাই, দুই বন্ধুর মধ্যে কী অপূর্ব মিলনের বন্ধন। কিন্তু, যখনই এক বন্ধু অপর বন্ধু হতে ধনজনের শক্তিতে অধিক শক্তিশালী হয়ে গেল তখনই প্রিয় বন্ধুটিকে ধন-সম্পদের মিষ্টি অহংকারটি ছুঁড়ে মারতে একটুও লজ্জা পায় নাই। এখানে বোঝানো হয়েছে যে ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতা মানুষকে কতখানি অহংকারী করে তোলে। মহানবি (সা.) বলেছেন, আগুন যে-রকম কাঠ খেয়ে ফেলে অহংকার তেমনি মানবীয় গুণগুলোকে খেয়ে ফেলে। ইহারই একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ অথবা দলিল আমরা এই আয়াতে জানতে পারলাম। আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই ধন-সম্পদের কারণেই দুই বন্ধুর মাঝে মতবিরোধের অবতারণাটি পরিষ্কার দেখতে পাই। সুতরাং, ধন-সম্পদ প্রথমে মতবিরোধ তৈরি করে, তারপর অহংকারের আফালন ছুঁড়ে মারে, তারপর আরও অনেক কিছু বলা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ যদি আপন পবিত্র নফস হতে খান্নাস-রূপী শয়তানকে মুসলমান বানাতে পারত তা হলে দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদের মালিক (আমানতদার বলাই ভালো ছিল, কারণ সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ) হলেও একটি মাছির একটি ডানার সমান বলেও তার কাছে মনে হতো না। ইহা যে মহানবিরই (সা.) কথা।

কিন্তু মহানবির (সা.) কথা হলে কী হবে, নিজের নফসের সঙ্গে যে খান্নাস-রূপী শয়তানটি সব সময় কুমন্ত্রণা দিয়ে চলছে! এই কুমন্ত্রণার খপ্পরে পড়েই মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যা-তা বলতেও পিছপা হয় না। এই আয়াত হতে আমরা এই শিক্ষাটি পেলাম।

৩৫. ওয়া (এবং) দাখালা (প্রবেশ করিল, ভিতরে গমন করিল, ঢুকিল) জান্নাতাহ (তাহার জান্নাতে, তাহার বাগানে, তাহার উদ্যানে, তাহার উপবনে)

ওয়া (এবং) হয় (সে, তিনি) জালিমুন (জুলুমকারী, জালেম, অত্যাচারী, নিপীড়ক, অন্যায়কারী) লিনাফসিহি (তাহার নফসের জন্য, তাহার নিজের জন্য [এখানে 'লিফসিহি' বলা হয় নি। কারণ, রুহ প্রাণ নয়, বরং আল্লাহর আদেশ; প্রাণ এবং আদেশের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। এই পার্থক্যটি সব সময় মনে রাখতে হবে। অন্যথায় ভুল হবার সম্ভাবনাটি থেকে যায়])।

প্ট এবং প্রবেশ করিল তাহার জান্নাতে এবং সে তাহার নফসের জন্য জালেম।

+ কালা (বলিল) মা (না) আজুনু (আমি মনে করি, আমি ধারণা করি) আন (যে) তাবিদা (ধ্বংস হইবে, বিনষ্ট হইবে, ক্ষয় হইবে, বরবাদ হইবে, খারাপ হইবে) হাজ্জিহি (এই, ইহা) আবাদান (সব সময়, চিরকাল, সর্বদা, অসীম ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত হয়, কখনো নয়)।

প্ট বলিল, আমি মনে করি না যে ধ্বংস হইবে ইহা কখনো।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বিশেষভাবে দু'টি বিষয় লক্ষ্য করার মতো। প্রথমটি হলো, জান্নাত বলতে যে বাগান অথবা উদ্যানও হতে পারে ইহাই প্রমাণিত হলো। এই 'জান্নাত' শব্দটি দিয়ে বেহেশত বোঝানো হয় নাই, কারণ বেহেশত নামক জান্নাতে অহংকার করার প্রশ্নটি অবান্তর। আবার, জালেম হবার কথাটিতে ইহাও পরিষ্কার প্রমাণিত হলো যে একটি বাহিরের জুলুম, অপরটি ভেতরের জুলুম। বাহিরের জুলুম করাটি দেখা যায়, কিন্তু ভেতরের জুলুমটি দেখা যায় না। বাহিরের জুলুমটি মৃত এবং ভেতরের জুলুমটি বিমূর্ত।

ওয়াজিয়া নামাজ দেখা যায়, কারণ ইহা মৃত, কিন্তু দায়েমি নামাজ দেখা যায় না, সুতরাং ইহা বিমূর্ত। বাহিরের তিনটি শয়তানকে দেখা যায় এবং কঙ্কর হুড়ে মারা যায় - কারণ ইহা মৃত, কিন্তু আপন নফসের সঙ্গে যে-খান্নাস-রূপী শয়তানটি আছে উহাকে দেখা যায় না, কারণ উহা বিমূর্ত। বাহিরের কাবাঘরটি দেখা যায়, কারণ ইহা মৃত কাবা, কিন্তু খান্নাসমুজ্জ নফসটিও যে আল্লাহর কাবাঘর উহা বিমূর্ত। যে-রোজা রাখাটি দেখা যায় এবং যে-ইফতার করাটিও দেখা যায় উহা মৃত। আর যে-রোজা রাখাটি দেখা যায় না এবং ইফতার করাটিও দেখা যায় না উহা বিমূর্ত। পশু কোরবানি করাটি মৃত এবং আপন নফসের সঙ্গে খান্নাস-রূপী পশুটি কোরবানি করা বিমূর্ত। সুতরাং, দুটিরই প্রয়োজন আছে। একটার অভাবে আরেকটা বোঝা যায় না এবং বুঝবার উদাহরণও টানা যায় না। সুতরাং, জ্ঞানের স্বল্পতাতেই হোক অথবা জ্ঞানের দাঙ্কিতাতেই হোক - অনেক সময় আমরা দুটোকে একসঙ্গে মনে নিতে পারি না। একটা না একটাকে ফেলে দিয়ে আমাদের জীবন-দর্শনটিকে সমাজ-জীবনে দাঁড় করিয়ে রাখি। এই আয়াতে আপন নফসের উপর জুলুম করার কথাটি বলা হয়েছে এবং বলা হয় নি বাহিরের মানুষের সঙ্গে জুলুম করার কথাটি। অথচ, জুলুম করার কথাটি বললেই আমরা ধারণা করে নিই, মানুষের উপর জুলুম করার কথাটি। কারণ, আমরা বাহিরের জুলুমটি দেখতে পাই, কিন্তু নিজের নফসের সঙ্গে তথা নিজের সঙ্গে যে-জুলুমটি করা হয় ইহা চোখে দেখা যায় না। কারণ, এই জুলুম একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। এই জুলুম একান্ত আভ্যন্তরীণ বিষয়। আগেই বলেছি যে, আরবি ভাষাটি খুবই গরিব ভাষা। তাই জান্নাত বলতে আমরা বেহেশত বলেই বুঝে থাকি, কিন্তু এই জান্নাত শব্দটি দিয়ে যে বাগান তথা উদ্যানও হতে পারে ইহা অনেকেরই জানা থাকার কথা নয়। এই নফসের উপর জুলুম করে যে জালেম হতে হয় উহা কেবলই ধন-ঐশ্বর্যের শক্তি এবং জনবলের সমর্থনের উপর অহংকার করার বিষয়ে বলা হয়। তা হলে প্রশ্ন আসে, এই ধনবল আর জনবলের মাধ্যমে যে-অহংকারটির আগমন হয় সেই অহংকারটি কোথা হতে আসে? এই অহংকার আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে অপবিত্র খান্নাস-রূপী শয়তানের ওয়াসওয়াসা তথা কুমন্ত্রণা হতে আসে। তা হলে ইহাই প্রমাণিত হলো যে, যত রকম স্থূল এবং সূক্ষ্ম আকাম-

কুকামের গুরু ঠাকুরই হলো আপন নফসের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে থাকা খান্নাস-রূপী শয়তান।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, অহংকার করার অধিকারটি কেবলমাত্র আল্লাহর। তবে আল্লাহর গুণে গুণাঙ্কিত হয়ে যদি অহংকার করা হয় তবে সেই অহংকারে কোনো দোষ থাকে না। কারণ, আল্লাহর খাস বান্দা যখন হাত দিয়ে কঙ্কর ছুঁড়ে মারে তখন আল্লাহ বলে ফেলেন যে ওই কঙ্কর তিনিই ছুঁড়ে মেরেছেন, ওই খাস বান্দার হাতটি আল্লাহরই হাত বলে কোরান-হাদিসে ঘোষণা করা হয়েছে। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির। সুতরাং, সর্বোচ্চ পর্যায়ে সৃষ্টির মাঝে বিদ্যুৎমাত্র ভুলের অবকাশ নাই। আপন নফসের সঙ্গে খান্নাসকে বহাল তবিয়ে রেখে ধনগর্বে গর্ব করাটি নফসের জন্য জুলুম বলে এই আয়াতে বলা হয়েছে। এই আয়াতে যে-ব্যক্তিটি আত্ম-অহংকারের মাধ্যমে জুলুমসহকারে তার উদ্যানে প্রবেশ করল এবং বলে ফেলল যে, আমি মনে করি না যে এই বাগানটি কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে, সে বন্ধুটি ধনৈশ্বর্যের গর্বে গর্বিত হয়ে জাগতিক জীবনটিকে অধিক মূল্যবান মনে করে অন্য বন্ধু হতে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় মর্যাদাবান বলে মনে করছে।

৩৬. ওয়া (এবং) মা (না) আজুনু (আমি মনে করি, আমি ধারণা করি) 'জুনু' অর্থ হলো বিশ্বাস। ইহার বিপরীত হবারও সম্ভাবনা থাকে। আবার কখনো সন্ধেহ এবং কখনো বিশ্বাস অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, বিচার করা, বিবেচনা করা, গণ্য করা, মনে করা, স্থির করা, বোধ করা) সাআতা (ঘড়ি, ঘণ্টা, সময়, রাত বা দিনের কোনো অংশ, যুগ। সময়ের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেশি। পবিত্র কোরান-এ একে কেয়ামত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে) কায়মাতানু (দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান, নিজের জায়গায় শক্তভাবে অবস্থান গ্রহণকারিণী, প্রতিষ্ঠিত হওয়া)।

প্ট এবং আমি মনে করি না, সাআত দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান।

+ ওয়া (এবং) লায়িন্ (নিশ্চয়ই যদি) কুদ্বিতু (আমাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আমাকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে) ইলা (দিকে) রাব্বি (আমার রবের, আমার প্রতিপালকের, আমার সদাপ্রভুর) লাআজিদান্না (অবশ্যই আমি পাইব, নিশ্চয়ই আমি পাইব) খাইরান্ (উত্তম, ভালো, নেক কাজ, যা সকলে পছন্দ করে, অতিশয় ভালো, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, প্রকৃষ্ট, উন্নত) মিন্হা (তাহা হইতে, ইহা অপেক্ষা, তাহার নিকট হইতে, তাহার পক্ষ হইতে, তাহার মধ্য হইতে) মুনকালাবান্ (প্রত্যাবর্তন করা, ফিরিয়া যাইবার স্থান, পরিণতি, অবস্থান্তরপ্রাপ্তি)।

প্ট এবং নিশ্চয়ই যদি আমাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় আমার রবের দিকে, অবশ্যই আমি পাইব তাহা হইতে উত্তম অবস্থান্তর।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে পুনর্জন্মবাদের গন্ধটি একবার পাই, আবার মনে হয় পাই না। এই দোটারায় পড়ে অধম লেখক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলান্ন না। অনেক কোরান-এর তফসির হতে অনেক রকম ব্যাখ্যা তুলে ধরতে পারতাম। কেয়ামতটি যে নিঃসন্দেহে পুনর্জন্মবাদ ইহাতে বিদ্যুৎমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ, কেয়ামত দুই প্রকার : প্রথমটি কেয়ামতে কবিরাত্থা সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো কেয়ামতে সগিরাত্থা একাটি নফসের উপর মৃত্যু-নামক ঘটনাটি ঘটে যাবার পরের জীবনটি। সুতরাং, ব্যক্তি-মৃত্যুই হলো ব্যক্তির কেয়ামত। সুতরাং, কেয়ামতের সঙ্গে-সঙ্গে ওঠানো হবে বলতে পুনর্জন্মবাদ ছাড়া আর কোনো অর্থ হয় না বলে মনে করি। অনেকেই পুনর্জন্মবাদ ইসলামে নাই বলে ধারণা করে এবং

পুনর্জন্মবাদ কথাটিকে হিন্দু-ধর্মের উপরে চাপিয়ে দেন। আজ হতে আনুমানিক সাতো পাঁচ হাজার হতে ছয় হাজার বছর আগে মুনি-ঋষিদের বাকসিদ্ধির সংকলনের নাম যে বেদ সেই বেদ গ্রন্থের অনেক স্থানে অনেকবার আকার-ইঙ্গিতে মহানবি মুহম্মদ (সা.)-এর আগমনের বার্তাটি বলে দেওয়া হয়েছে। একবার চিন্তা করুন তো, ফেরাউনদের জামানার চেয়েও দুই-আড়াই হাজার বছর আগের কথা। যখন ধান-চাউলও আবিষ্কার হয় নাই। ধান-চাউলের গবেষকরা ধান-চাউলের আগমনের কথাটি চার হাজার বছর আগে হয়েছে বলে বলেছেন। সুতরাং, যেখানে ধান-চাউলেরই আবিষ্কার হয় নি সেই সময়, সেই দিনে মুনি-ঋষিরা কী করে এবং কেমন করে এবং কোন জ্ঞানের বলে মহানবি মুহম্মদ (সা.)-এর আগমনের কথা ঘোষণা করে গেছেন? আমাদের কাঁধের উপর যে ধর্মের সাইনবোর্ডটি আছে উহা হিমালয় পর্বত হতেও দৃঢ় এবং কঠিন। তাই মুনি-ঋষিদের বাণীগুলো যাহা মহানবি হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর আগমন সম্পর্কে উহা সানন্দে গ্রহণ করে নেই এবং পক্ষান্তরে সেই মুনি-ঋষিদেরকে, ধর্মীয় সাইনবোর্ডটি কাঁধের উপর প্রচণ্ডভাবে ভর করার দরুন, অস্বীকার করি। এই মুনি-ঋষিরাই বারবার বলে গেছেন যে, পুনর্জন্মবাদ একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। পবিত্র গীতা গ্রন্থেও পুনর্জন্মবাদের কথাগুলো আমরা পাই। আবার গৌতম বুদ্ধের বাণীগুলোতেও পাই। আবার, মহাবীরের জৈন-ধর্মতেও পাই। সুতরাং, এতগুলো ধর্মে যেখানে পুনর্জন্মবাদের কথাটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে মেনে নেওয়া হয়েছে সেখানে আমরা কেমন করে অস্বীকার করি? আমরা বুঝতে পারি না যে কেয়ামতে সগিরা তথা ছোট কেয়ামত তথা মানুষের মৃত্যু-ঘটনা ঘটান পর আবার যে আসতে হবে তার পরিষ্কার ইঙ্গিতটি এভাবেই পাওয়া যায় যে, কেয়ামতের সঙ্গে-সঙ্গে ওঠানো হবে। জন্মাত যেমন বেহেশত, আবার একই বানানে একই শব্দে জন্মাত হয়ে যায় বাগান তথা উদ্যান। তেমনি ওহি নাজেলের বিষয়েই দেখতে পাই, নবি-রসুলদের কাছে ওহি নাজেল হচ্ছে, আবার নবি-রসুলদের মায়ের কাছে ওহি নাজেল হচ্ছে, আবার মোমাহির নিকটও ওহি নাজেল হচ্ছে। পরিশেষে বলতে চাই যে এই আয়াতের মর্মার্থ আমরা জানা নাই।

৩৭. কালা (বলিল) লাহ (তাহাকে) সাহিবুহ (তাহার সাথী, তাহার বন্ধু) ওয়া (এবং) হওয়া (সে, তিনি) ইউহাওইকুহ (আলাপ করিতেছিল, জবাব দিতেছিল, আলোচনা করিতেছিল, [কামালাইন রচয়িতা বলেছেন শব্দটি 'হারাইয়াহরু' হতে গঠিত। 'মহাওয়ারাতান' অর্থ হলো আলাপ-আলোচনা, কিছু ইঙ্গিত রয়েছে তার অহঙ্কারের কথা বলার দিক]) আকাফারতা (তুমি কি অস্বীকার করিতেছ?, তুমি কি কুফরি করিতেছ?, তুমি কি মিথ্যারোপ করিতেছ?, তুমি কি অননুমোদন করিতেছ?, তুমি কি অগ্রাহ্য করিতেছ?, তুমি কি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিতেছ?) খালাকাকা (তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন) মিন (হইতে, থেকে) তুরাবিন (মাটি, মৃত্তিকা) সুম্মা (তারপর) মিন (হইতে, থেকে) নুফাতিন (শুকন, বীষ, রেতঃ, ধাতু) সুম্মা (তারপর) সাওয়াকা (তোমাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন, তোমাকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, তোমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, তিনি তোমাকে যেমন দরকার তেমনভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন) রাজুলান (পুরুষ, মানুষ)।

প্ট বলিল তাহাকে তাহার বন্ধু এবং সে আলোচনা করিতেছিল, তুমি কি অস্বীকার করিতেছ তাহাকে (যিনি) তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন মাটি হইতে তারপর শুকন হইতে তারপর তোমাকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন পুরুষে।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে, যখন কোনো মানুষ প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক (আমানতদার) হয়ে যায় এবং এক কথায় ধনবল ও জনবলে

প্রচুর শক্তির অধিকারী হয়ে যায় তখন অনেকের মাঝেই ফুটে ওঠে অহংকার এবং দস্তুর আশ্ফালন। এই দস্তুর আশ্ফালনটি দেখে অপর বন্ধুটি তথা সাথীটি এই বলে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তুমি কি তোমার রবকে অস্বীকার করছ? তুমি কি জানো না যে তোমাকে মাটি হতে তৈরি করা হয়েছে? তারপর ধারাবাহিকভাবে তুমি এখন একজন পরিপূর্ণ পুরুষ! এই সামান্য মাটির বিবর্তনের ধারায় একজন পুরুষে পরিণত হবার পরও এই অহংকার, এই দস্তুর আশ্ফালন করাটি কি মানায়? এই অহংকার, এই দস্তুরি তো একমাত্র আল্লাহর জন্য। এই বিষয়টি জানার পরেও মানুষ যখন ধন-সম্পদ এবং জনবলে বলীয়ান হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং অহংকারের মদমত্ততায় নিজেকে ভরিয়ে তোলে তখনই তো একটি মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করে তথা কুফরি করে। এখানে মুখের স্বীকৃতিটি গোণি, বরং চলন-বলনের ধারা-বিবরণীটি দেখে বিচার করাটাই মূল্য। একটি মানুষের চলন-বলনেই ফুটে ওঠে অহংকার আছে কি না। তাই একজন অহংকারী মানুষ যে প্রকারান্তরে আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করেছে তারই জ্বলন্ত উদাহরণটি এই আয়াত হতে শিক্ষা লাভ করা যায়।

৩৮. লাকিননা (কিন্তু আমি বলি, অথচ আমি বলি, পরন্তু আমি বলি, পক্ষান্তরে আমি বলি) হওয়া (তিনি, সে) -লাহ (আল্লাহ) রাববি (আমার রব, আমার প্রতিপালক, আমার সদাপ্রভু) ওয়া (এবং) লা (না) উশরিকু (আমি শরিক করি, আমি অংশীদার করি, আমি ভাগীদার করি) বিরাববি (আমার রবের সহিত, আমার প্রতিপালকের সাথে, আমার সদাপ্রভুর সঙ্গে) আহাদান (কাহাকেও, কোনো জনকেও)।

পঁ কিন্তু আমি বলি, তিনি আল্লাহ আমার রব এবং না আমি শরিক করি আমার রবের সহিত কাহাকেও।

৩৯. ওয়া (এবং) লাও (যদি, হয়, কী ভালোই না হইত [শর্ত এবং আকাঙ্ক্ষা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত অব্যয়], কেন) লা (না) ইজ্ (যখন) দাখালতা (প্রবেশ, ভিতরে গমন, ঢোকা) জান্নাতাকা (তোমার জান্নাতে, তোমার বাগানে, তোমার উদ্যানে) কুলতা (তুমি বলিয়াছিলে) মা (যাহা) শাতা (চাওয়া, ইচ্ছা করা) আল্লাহ (আল্লাহ)।

পঁ এবং কেন না যখন তুমি প্রবেশ করো তোমার জান্নাতে, তুমি বলিয়াছিলে, আল্লাহ যাহা চাহেন।

+ লা (নাই) কুওয়াতা (শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত, ছাড়া) বিল্লাহি (আল্লাহর)।

পঁ নাই শক্তি আল্লাহ ছাড়া।

+ ইন্ (যদি, যদি না, অবশ্যই না) তারানি (আমাকে দেখ) আনা (আমি) আকাল্লা (অনেক কম, খুব কম, কম, স্বল্পতর, অল্প, ন্যূন) মিনকা (তোমা হইতে, তোমার চেয়ে, তোমা অপেক্ষা) মালান (সম্পদ, ঐশ্বর্য, ধন, প্রাচুর্য, অর্থ, কাম্যসামগ্রী) ওয়া (এবং) ওয়ালাদান (সন্তান, পুত্র বা কন্যা, অর্পিত্য, বংশধর, অবিচ্ছেদ্য ধারা)।

পঁ যদি আমাকে দেখ, আমি তোমার চাইতে সম্পদে এবং সন্তানে অনেক কম।

৪০. ফাতাসা (সুতরাং হয়তো) রাববি (আমার রব, আমার প্রতিপালক, আমার সদাপ্রভু) আনইউতিনা (আমাকে দান করিবেন) খাইরান (উত্তম, অতিশয় ভালো, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) মিন (হইতে, চেয়ে, থেকে) জান্নাতিকা (তোমার জান্নাত, তোমার বাগান, তোমার উদ্যান) ওয়া (এবং) ইউরসিলা (পাঠাইয়া দেওয়া, প্রেরণ করা) আলাইহা (তাহার উপর) ইস্বানান (আজাব, আশ্চর্য, বিপর্যয়, ওলটপালট, বিশ্জ্বল অবস্থা, ধ্বংস) মিনাস্ (হইতে, চেয়ে,

থেকে) সাম্রাণি (আকাশ) ফাতুস্বিহা (সুতরাং তাহা) সোইদান (মাটি, মৃত্তিকা, ভূমি, ধূলিবালি) জালাকান (পরিষ্কার সমতল ভূমি, পিচ্ছিল বালু, উদ্ভিদশূন্য)।

ঈ সূতরাং হয়তো আমার রব আমাকে দান করিবেন উৎকৃষ্ট - তোমার জ্ঞানাত হইতে এবং পাঠাইয়া দিবেন তাহার উপর আজাব আকাশ হইতে সুতরাং তাহা পিচ্ছিল বালুর ভূমি (মরুভূমি)।

৪১. আও (অথবা) ইউস্বিহা (হইয়া যাইবে) মাইউহা (উহার [জ্ঞানাতের] পানি) গাওরান (মাটির নিচে প্রবেশ করা, কোনো বস্তুর মধ্যে চলিয়া যাওয়া, ভূগর্ভে ঢুকিয়া যাওয়া, গর্ত, খোলা ময়দান) ফালান (সুতরাং কখনোই না) তাস্তাতিয়া (তুমি সক্ষম হইবে, তুমি সমর্থ হইবে, তুমি শক্তিয়ুক্ত হইবে) লাহ (তাহার, তাহারি জন্য) তালাবান (তিলব করা, খোঁজ করা, তালিশ করা, সন্ধান করা)।

ঈ অথবা হইয়া যাইবে উহার পানি মাটির নিচে প্রবিষ্ট, সুতরাং কখনোই তুমি সক্ষম হইবে না তাহার খোঁজ করিতে।

১ ব্যাখ্যা : এই চারটি আয়াতের একসঙ্গে কিছুটা ব্যাখ্যা লিখতে যেয়ে প্রথমে বলতে হচ্ছে যে, অপর বন্ধুটি তথা সাথীটি, যিনি ধনবল এবং জনবলে দুর্বল, তিনি বলছেন, আমার প্রতিপালক হলেন আল্লাহ এবং এই প্রতিপালকরূপী আল্লাহর সঙ্গে আমি কাহাকেও শরিক করি না। এখন প্রশ্ন হলো, শরিক বলতে কী বোঝায়? কী কী করলে শরিক করা হয়? এই কথাগুলোর যদিও এখানে উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু মানুষ যখন ধনবল, জনবল এবং আপন খান্নাস-রূপী প্রবৃত্তির উপর নির্ভরতার কথাটি বলতে চায় তখনই শেরেকের আওতায় এসে পড়ে। আবার অনেকে ভুল করে আল্লাহর ওলিদের উপর নির্ভরতাকেও শেরেকের

অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। অথচ, শেরেক হতে মুক্ত হতে না পারলে তথা আপন প্রবৃত্তির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত খান্নাস হতে মুক্ত হতে না পারলে ওলিই হওয়া যায় না। সুতরাং, একজন শেরেকমুক্ত মানুষই আল্লাহর ওলি এবং আল্লাহ নিজেই বলছেন যে, সেই ওলির হাত তাঁরই হাত হয়ে যায়, সেই ওলির কথা তাঁরই কথায় পরিণত হয়ে যায়। এই জলজ্যন্ত সত্য কথাটি প্রমাণ করার জন্য দলিলের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় নিরপেক্ষ বিবেকের। একটি নফসের সঙ্গে থাকা খান্নাস-রূপী প্রবৃত্তিটি যে-কোনো কর্মই করুক না কেন, সেই কর্মটি কলুষিত হয়ে যায় তথা শেরেকের পর্যায়ে নেমে আসে এবং এই কলুষিত শেরেকি কর্মটি হয় বন্ধন। নতুবা কর্ম মোটেও বন্ধন নয়, বরং ইহাও একটি বন্ধুগি। এই কথাগুলো কেবলই মুখের স্বীকৃতি হলেই চলবে না, বরং নফস হতে কেমন করে খান্নাসমুক্ত হওয়া যায় সেই ধ্যানসাধনার প্রয়োজন হয়। এবং এই প্রয়োজনীয় শিক্ষাটি তাঁরই কাছে পাবার আশা করা যায় যিনি আপন নফস হতে খান্নাস-রূপী শেরেকি পর্দাটিকে উন্মোচন করতে পেরেছেন। এদেরকেই বিভিন্ন নামে ডাকা হয়, যেমন - মুনি, খাযি, সাধু, সন্ত, যোগী, সন্ন্যাসী, পীর, ফকির, মুরশিদ, ওলি, গাউস, কুতুব, আবদাল, আরিফ ইত্যাদি। আসল পুলিশের সঙ্গে নকল পুলিশ, আসল সৈনিকের সঙ্গে নকল সৈনিক, আসল র‍্যাব সদস্যের সঙ্গে নকল র‍্যাব সদস্য - এ-রকমভাবে অনেক নকলের সমাহারই তো অহরহ দেখতে পাই। তেমনি আল্লাহর ওলিদের নাম ভাঙিয়ে নকল ওলি পাওয়াটাও তো একান্ত একটি স্বাভাবিক বিষয় বলেই মনে করতে চাই। প্রথম বন্ধুটি কি জানেন না, আল্লাহর ইচ্ছা এবং শক্তি অতুলনীয়? কিন্তু এই মৌখিক স্বীকৃতির পাশেই আমরা দেখতে পাই ধনবল-জনবলের প্রাচুর্যতার অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা একটি অহংকার। সেই অহংকারের চাল-চলনটি শেরেকের গন্ধে ভরপুর। ইহা অপর বন্ধুটি বুঝতে পেরেই প্রথম বন্ধুটিকে মনে করিয়ে দিলেন যে আল্লাহ

যাহা ইচ্ছা করেন, আল্লাহ ব্যতীত কারো কোনো শক্তি নাই। তারপর আরও বললেন, আমার রব আমাকে তোমার এই প্রাচুর্যময় বাগানের চাইতেও আরও অনেক উত্তম কিছু দান করতে পারেন। তারপর প্রথম বকুটিকে আরও মনে করিয়ে দিলেন যে, আকাশ হতে বজ্রপাত হয়েও তো তোমাদের প্রাচুর্যময় বাগানটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে অথবা মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যেতে পারে। আরও মনে করিয়ে দিলেন এই বলে যে, তোমার বাগানের পানি তলদেশ হতে শুকিয়েও তো যেতে পারে এবং এমনও তো হতে পারে যে অনেক তালাশ করেও সেই পানি আনতে সক্ষম নাও হতে পার। সুতরাং, ইহকালের জ্ঞানাত নামক বাগানটি তুমি বেঁচে থাকতেও ধ্বংস হয়ে যাবার ঘটনাটি দেখতে পারো। তারপরেও মোটা কথায় বলতে হয়, দুনিয়ার জীবনের কোনো ধন-সম্পদই চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং, তৌহিদি জীবন লাভ করতে চাইলে আপন নফস হতে প্রবৃত্তির খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দিতে হয়। ইহাই ছিল দ্বিতীয় বকুটির অহংকারের আফসোসগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তৌহিদি দর্শনের দীক্ষায় দীক্ষিত হবার একটি সার্বজনীন আহ্বান।

৪২. ওয়া (এবং, আর, ও, অধিকন্তু) উহিতা (তাহাকে ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহাকে বেষ্টিত করা হইয়াছে, ঘেরাও, জড়ানো, ঘেরা, প্রদক্ষিণ, বেড়া, প্রাচীর, বেড়, পরিধি, সে পরিবেষ্টিত হইল) বিসাম্মারিহি (তাহার ফলপুষ্পের দ্বারা, তাহার ফলগুলির দ্বারা) ফাআস্বাহা (সুতরাং সে শুরু করিল) ইউকীল্লিবু (হাত মোচড়ানো, হাত কচলানো [এখানে অর্থ নিজ হাত আক্কেপে এবং অনুতাপে মোচড়ানো], ওলট-পালট করে, অদল-বদল করিতে থাকে) কাফফাইহি (তাহার দুই হাত, হাতে হাত মিলানো [লঙ্ঘিত হওয়ার আলামত। এখানে আভিধানিক অর্থ নয়, এখানে অর্থ লঙ্ঘিত হওয়া]) আলা (উপর) মা (যাহা) আনফাকা (সে খরচ করিয়াছে) ফিহা (উহার মধ্যে) ওয়া (এবং) হিয়া (সে, তিনি) খাওয়াইয়াতুন (পতিত, পতনপ্রাপ্ত, খোলা [‘খাওয়াউন’ শব্দ হইতে, উহার অর্থ ঘর খালি হওয়া, পতিত হওয়া, খালি হওয়া]) আলা (উপর) উরুশিহা (তার ছাদ, তার মাচানসমূহ) ওয়া (এবং) ইয়াকুলু (সে বলিল) ইয়ালাইতানি (হায়, আফসোস) লাম্ব (না) উশরিক (আমি শেরেক করিতাম, আমি শরিক করিতাম) বিরাব্বি (আমার রবের সাথে, আমার প্রতিপালকের সাথে) আহাদান্ (অন্য কাহাকেও, আহাদ)।

প্ট এবং তাহাকে ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে তাহার ফলসমূহের দ্বারা, সুতরাং সে তাহার দুই হাত কচলাইতে শুরু করিল যাহার উপর সে খরচ করিয়াছে উহার মধ্যে এবং সে পতিত হইল তাহার মাচাগুলির উপর এবং সে বলিল, হায় আমি শেরেক করিতাম না আমার আহাদ রবের সহিত।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জ্ঞানাতের তথা বাগানের মালিককে বাগানের ফলগুলো দিয়ে ঢেকে ফেলা হয় নি, বরং নিজের কর্মফলের দ্বারা নিজেকেই ঘিরে রেখেছে তথা পরিবেষ্টিত করে অথবা বন্দি করে রাখা হয়েছে। জ্ঞানাতের মালিক নিজের কর্মফলের মাধ্যমে নিজেকেই নিজের গুনাহের মধ্যে ঘিরে রেখেছে। তার দুটি হাত, তার কর্মফলের উপর ফিরে আসল – যার উপর দেহ-মনের সব রকম কর্মের পরিশ্রম ব্যয় করছিল। যেদিকে যার মনের এবং আমলের গতি তার হাশর তো সেদিকেই বাধ্য থাকে, ইহাই বিধির বিধান। তার জীবনের এই সমস্ত আমল ছিল ছারখার হয়ে যাবার একটি আমল। তার এই আমলজনিত ধ্বংস দুনিয়ার জ্ঞানাতকে তথা বাগানটিকে ধ্বংস করার কথাটি হলো রূপক, বরং আসল কথাটি হলো ধ্বংস হয়েছিল বাগানের ছাদের উপর। ইহাও একটি রূপক কথা, কারণ, কোনো বাগানেরই কোনো ছাদ থাকে না এবং থাকার কথাও নয়, বরং অহংকারের আফসোসরূপী

জীবনের ছাদটি ভেঙে গেল। তাই দেখা যায়, বিদায়কালে সে আফসোসের ভাষায় বিলাপ করে বলতে লাগল, হায়! আমি যদি আমার আহাদ রবের সঙ্গে শেরেক না করতাম তা হলে এই বিপদসমূহ হতে মুক্ত হতে পারতাম। সুতরাং, মৃত্যু নামক ঘটনাটি দিয়ে ইহ-পরকালের সব রকম প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। দৃষ্টি হতে আপন নফসের সঙ্গে যে-খান্নাসটি এতকাল জড়িয়ে ছিল সেই খান্নাস সরে যাবার কারণে অপরাধীরাও তখন আহাদরূপী আল্লাহর পরিচয়টি দেখতে পায়।

এখানে একটি কথা না বললে অনেকেরই ভুলের মধ্যে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায় আর সেটি হলো, আল্লাহর সঙ্গে শেরেক করলেই ফলের বাগানের বারটা বেজে যাবে ইহা নিছক একটি রূপক কথা। আসল কথাটি বুঝাবার জন্যই আল্লাহ রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নতুবা শেরেক করলেই যদি ফলবাগানের অবস্থানটি শোচনীয় হয়ে পড়ে তা হলে শেরেক করা তো দূরের কথা, বরং যারা অহংকার করে বলে থাকে যে সৃষ্টি বলে কিছু নাই তথা আল্লাহই নাই তথা যারা নাস্তিক, সেই সব নাস্তিকদের ফলবাগানগুলো দুনিয়াজুড়ে প্রচুর ফলদান করে যাচ্ছে। এখন, এ-রকম ফলদানের প্রশ্নে বিচারের মানদণ্ডটি দাঁড় করাতে গেলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

৪৩. ওয়া (এবং) লাম্ (না) তাকুন (ছিল) লাহ (তাহার জন্য) ফিআতুন (দল, এমন দল যাহারা পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা করে, লোকজন) ইয়ানসুরুনাহ (তাহারা তাহাকে সাহায্য করিবে, তাহারা তাহাকে সহায়তা করিবে, তাহারা তাহাকে উপকার করিবে, তাহারা তাহাকে আনুকূল্য করিবে) মিনদুনি (ব্যতীত, ছাড়া, ব্যতিরেকে, বাদে, বিনা, ভিন্ন) -ল্লাহি (আল্লাহ) ওয়া (এবং) মা (না) কানা (ছিল, সৃষ্টি হয়, ঘটে, হয়) মুনতাসিরা (প্রতিশোধ গ্রহণকারী, বিজয়ী, প্রতিকারকারী, প্রতিরোধকারী, মুক্তকারী, উদ্ধারকারী, রক্ষাকারী)।

প্ট এবং ছিল না তাহার জন্য এমন দল (যাহারা) তাহাকে সাহায্য করিবে আল্লাহ ছাড়া, এবং ছিল না উদ্ধারকারী।

৪৪. ইনালিকা (ওইখানে, ওই সময়, ওইভাবে, ওই ক্ষেত্রে, ওই স্থলে, ওই রূপে) ওয়ালাইয়াত (সাহায্য, মদদ, শ্রেষ্ঠ অভিভাবকত্ব, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, অধিকার, প্রতিরক্ষা, নিরাপদকরণ, রক্ষা করা) লিল্লাহি (আল্লাহর জন্য) আল্লাহাকি (হক, একমাত্র সত্য, সঠিক, প্রকৃত, যথার্থ, ঠিক, নিখুঁত)।

প্ট ওইখানে আল্লাহরই কর্তৃত্ব (যিনি) একমাত্র সত্য।

+ হওয়া (তিনি) খায়রুন (উত্তম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, অতিশয় ভালো) সাওয়াবান (সওয়াবদাতা, পুরস্কারদাতা, প্রতিদান, বদলা, পারিতোষিক) ওয়া (এবং) খায়রুন (উত্তম) উক্বান (পরিণাম, পরিণতি)।

প্ট তিনি শ্রেষ্ঠ সওয়াবদাতা এবং শ্রেষ্ঠ পরিণামদাতা।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াত দুটিতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে অধ্যাত্মবাদই একমাত্র সত্য। কিন্তু যেহেতু অধ্যাত্মবাদ বিষয়টি একদম বিমূর্ত, তথা চোখে দেখা যায় না, সেই হেতু মূর্তেরও (যাহা চোখে দেখা যায়) প্রয়োজন হয়। কিন্তু, অধ্যাত্মবাদের প্রশ্নে তথা বিমূর্তের প্রশ্নে মূর্ত রূপস্থায়ী একটি শিক্ষা এবং সাময়িক একটি উপদেশ মাত্র তথা অনেকটা ঊটো জগন্নাথের মতো। কারণ, ওই লোকটির বাগানে ঠাটা পড়ার দরুন নষ্ট হয়ে যাবার পর কোনো দলই সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। এই দুনিয়াতে এই রকম তুচ্ছ একটি বাগান বিপর্যয়ের মুখে পড়াটি তো একটি মামুলি ব্যাপার, বরং একটি দেশে যখন ভূমিকম্প, বন্যা, বড়-বাক্সা ইত্যাদি বিপর্যয় নেমে আসে তখনও সাহায্য করার জন্য অনেক দেশই এগিয়ে আসে। এমন দেশও এগিয়ে আসে যার অধিকাংশ

অধিবাসী নাস্তিক তথা আল্লাহ্ মানে না - বলে যে আল্লাহই নাই। সেই জাতীয় নাস্তিকদের দেশগুলোকেও সাহায্য করার তরে এগিয়ে আসতে দেখি। মাত্র কয়েক বছর আগে আজাদ কাশ্মীরে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বহু লোক মারা যায় এবং সেই লোকেরা অধিকাংশই মুসলমান। ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ধাক্কা, তার উপর এমন শীত যে বরফ পড়ছে, মাথা গোজার তাঁবু নাই, খাবার নামেমাত্র, ঔষধ নাই - ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেবার পর সাহায্য করার তরে জাতিসংঘ এগিয়ে এলো। সেই জাতিসংঘের মধ্যে থাকা নাস্তিক, সন্ধেহবাদী, মূর্তিপূজারক ইত্যাদি অপবাদে যারা ভূষিত তারা কি এই মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে নাই?

এই আয়াতের আসল অর্থটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তির অধিক ক্রমতা প্রদর্শন, সম্মান পাবার মোহ একটি ব্যক্তিকে অহংকারী করে তোলে। এই অহংকারের জন্মদাতা হলো আপন নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাস। এই খান্নাসকে তাড়িয়ে দিতে পারলে অথবা মুসলমান বানাতে পারলে সকল কর্তৃত্ব তথা 'আল-হক' আল্লাহরই জন্য বোঝা যায়। খান্নাসমুক্ত নফসটি বুঝতে পারি যে, এখানে একক অধিকার একমাত্র আল্লাহর। সওয়াব অর্থ পুরস্কার। নিজেকে খান্নাসমুক্ত করেই এই পুরস্কার অর্জন করতে হয়। 'উক্ৰা' তথা পরিণতিটি হয়ে পড়ে আল্লাহর গুণের দ্বারা গুণায়িত হয়ে যাওয়া। ইহাই চিরস্থায়ী উপার্জন অথবা লাভ করা। সুতরাং, পরিশেষে ঘুরেফিরে ওই একটি কথাই, আর সেই কথাটি হলো আপন নফস হতে খান্নাসকে তাড়িয়ে দাও অথবা খান্নাসটিকে মুসলমান বানিয়ে ফেল। ইহাই ইসলামের একমাত্র শিক্ষা। ইহাই ইসলামের একমাত্র দর্শন। ইহাই ইসলামের একমাত্র মূলমন্ত্র। এই বিমূর্ত বাক্যটিকে মূর্ত করার জন্য এত ভাষার এত অলংকার, এত সুন্দর-সুন্দর শাব্দিক চয়নের শৈলী, এত সুন্দর-সুন্দর আদেশ-উপদেশ, ভয়-ভীতিগুলো। কোনো এক অজানা অদৃশ্য কণ্টকুনিকায় বিধূত সূরের মূর্ছনার বিলাপ।

৪৫. ওয়া (এবং) ইদ্রিব (পেশ করা, সম্মুখে স্থাপন করা, দাখিল করা, নিবেদন করা, আঘাত করা, বানানো, বর্ণনা করা, ভ্রমণ করা, মারা, চালিয়া দেওয়া, চলা, বিবরণ দেওয়া) লাহমু (তাহাদের জন্য) মাসালান (উপমা, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, প্রমাণস্বরূপ, নজির, উপমান, সাদৃশ্য, তুলনা, আনুরূপ্য, সাম্য, গল্পছলে নীতিপূর্ণ উদাহরণ) হাইয়াতিদ (জীবন, প্রাণ, আয়ু) দুনিয়া (দুনিয়া, পৃথিবী, জগৎ) কামায়িন (পানির মতো, যেমন পানি, পানির ন্যায়) আনজালনাহ (আমরা নাজিল করি) মিনাস (হইতে) সাম্মায়ি (আকাশ) ফাখতালাতা (সুতরাং উদগত হয়, সুতরাং নির্গত হয়, সুতরাং উৎপন্ন হয়, উদ্ভূত হয়, বহির্গত হয়, উর্ধ্বগত হয়, উথিত হয়, সুতরাং মিশ্রিত হয়, মিলিত হয়) বিহি (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহা দিয়া) নাবাতু (সবুজ ঘাস, সবুজ উদ্ভিদ) আরদি (জমিন, পৃথিবী, দেহ, মাটি) ফাআসবাহা (সুতরাং হইয়া যায়, সুতরাং লাগিয়া যায়, সুতরাং তাহার ভোর হইল) হাশিমান (শুকনা ঘাস, তৃণলতা, ভাঙা টুকরা-টুকরা ভূমি, গাছের শুকনা পাতা বাতাসের দ্বারা ঝারিয়া ফেলা, শুকনা রুটি, হাড়িড) তাজরুহ (তাহাকে, উড়াইয়া দেয় [জারুন' হইতে তাজরুহ। 'জারুন' অর্থ উপরে উঠাইয়া উড়াইয়া দেওয়া বা ওড়া]) রিইয়াহ (হাওয়া, বায়ু, বাতাস)।

স্ট এবং পেশ করো তাহাদের জন্য একটি মেসাল দুনিয়ার জীবনে, যেমন পানি আমরা নাজিল করি আকাশ হইতে, সুতরাং নির্গত হয় তাহার দ্বারা সবুজ উদ্ভিদ মাটিতে, সুতরাং হইয়া যায় শুকনা ঘাস, (যাহা) উড়িয়া যায় বাতাসে।

+ ওয়া (এবং) কানা (হয়, হইয়াছিল, হইত) - লাহ (আল্লাহ) আলা (উপর) কুল্লি (সমস্ত, সব, সকল, সমূহ) শাইয়িন (কিছুর, বস্তু, জিনিস) মুকতাদিরিন (ক্লমতাশীল, শক্তিমান, ক্লমতাবান)।

প্ট এবং আল্লাহ হয় সব কিছুর উপর ক্লমতাবান।

৪৬. আলমালু (মাল, সম্পদ, ধনদৌলত, সমৃদ্ধি, ধন, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য, সম্পত্তি বৈভব) ওয়াল (এবং) বানুনা (পুত্রগণ [‘ইবনুন’-এর বহুবচন তথা পুত্রসন্তান-এর বহুবচন]) জিনাতু (সৌন্দর্য, সাজ, গয়না, সাজানো, শোভা, রূপ, মনোহারিতা) হাইয়াতিদু (জীবন) দুনিয়া (দুনিয়া)।

প্ট ঐশ্বর্য এবং পুত্রসন্তানেরা দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য।

+ ওয়াল (এবং) বাকিইয়াতুস্ (স্থায়ী, প্রতিষ্ঠিত, পাকাপোক্ত, স্থির, অচঞ্চল) সালিহাতু (সৎকর্মসমূহ, পুণ্যকর্মসমূহ, ভালো কাজগুলো, নেক কাজসমূহ, মহৎ কার্যাবলি) খাইরুন (উত্তম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, অতিশয় ভালো, সর্বপ্রধান) ইন্দা (নিকট, কাছে) রাব্বিকা (তোমার রব, তোমার প্রতিপালক, তোমার সদাপ্রভু) সাওয়াবান (সওয়াব, পুরস্কার, প্রতিদান, বদলা) ওয়া (এবং) খাইরুন (উত্তম) আম্মালান (আমল, আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা, কামনা, ইচ্ছা, বাসনা, প্রাপ্তির সম্ভাবনা, অভিলাষ, মনোরথ, স্পৃহা)।

প্ট এবং প্রতিষ্ঠিত পুণ্যকর্মসমূহ তোমার রবের নিকটে উত্তম সওয়াব এবং উত্তম আমল।

৪৭. ওয়া (এবং) ইয়াওম্মা (দিন, ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়) নুসাইয়্যিরুল (আমরা [আল্লাহ] ভ্রমণ করাই, আমরা সঞ্চালন করিব) জিবাল (পর্বতসমূহ, পাহাড়গুলো) ওয়া (এবং) তারাল (তুমি দেখিয়াছ, তুমি দেখিতেছ, তুমি দেখিতে পাইবে, তুমি দেখিবে) আরদা (পৃথিবী, মাটি, জমিন, দেহ) বারিজাতান (যাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে [‘বারজুন’ হইতে ‘বারিজাতান’] ‘বারজুন’ অর্থ প্রকাশিত হওয়া) খোলা, বন্ধনহীন, অনীবৃত, উদার, উন্মুক্ত)।

প্ট এবং সেই দিন আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] ভ্রমণ করাইব পর্বতসমূহকে এবং তুমি দেখিতে পাইবে প্রকাশিত পৃথিবী।

+ ওয়া (এবং) ইশারুনাহম্ (আমরা তাহাদেরকে একত্রিত করিব, আমরা তাহাদিগকে সমবেত করিব) ফালাম্ (সূতরাং না) নুগাদির্ (আমরা অব্যাহতি দিই, আমরা ছাড়িব, আমরা বিদ্যমান থাকিতে দিব, আমরা নিস্তার দিব, আমরা রেহাই দিব, আমরা পরিব্রাণ দিব, আমরা নিষ্কৃতি দিব, আমরা ক্লমা করিব) মিনহম্ (তাহাদের মধ্য হইতে) আহাদান (কাহাকেও)।

প্ট এবং আমরা তাহাদের সমবেত করিব সুতরাং আমরা অব্যাহতি দিব না তাহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াত তিনটির সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে মানুষ সহজেই লোভ ও মোহের খান্নাস-রূপী মায়ার জালের মধ্যে আটকিয়ে যায়। এবং ইহার ফলে নফস হতে খান্নাসমুক্ত আধ্যাত্মিক জীবনের উপর বিশ্বাসটি মোখিক হয়ে পড়ে। আন্তরিকতার আস্থাটি হারিয়ে যায়, যদিও উপর হতে এই আস্থাহীনতাটি কল্পই ধরা পড়ে। লোভ-মোহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লোভী জীবনের নিকৃষ্ট পরিণতির বিষয়গুলো মোহ-মায়ার খান্নাস-মিশ্রিত দুনিয়ার নয়ন জুড়ানো একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই পয়তাল্লিশ নম্বর আয়াত হতে সাতটাল্লিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত। আল্লাহ কী অপূর্বভাবে এই লোভ-মোহের মায়ার জীবনটির বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, এ যেন আকাশ হতে নাজেল হওয়া বৃষ্টির পানির মতো। বৃষ্টির পানিকে যেমন তরুলতা, বৃক্ষরাজি এবং তৃণ শস্যগুলো মাটি হতে গ্রহণ করে বেড়ে ওঠে এবং সুন্দর ও সুসজ্জিত হয়ে ওঠে এবং অবশেষে এমন একটি সময় আসে যখন উহা শুষ্ক টুকরো-টুকরো হয়ে

যায়। এ যেন একটি ঘূর্ণায়মান বৃত্তের আবর্তন। বৃষ্টির জল, সবুজ উদ্ভিদের সমাহার, পরে শুষ্ক - এই পরিণতির তকদিরই বেধে দেওয়া হয়েছে। এই মোহময় জীবনে ধন-সম্পদ এবং ছেলে-পেলে ওই শস্যসামগ্রীর মতো সাময়িক চোখ-ধাধানো রূপ আর শোভায় মগ্নিত। স্থায়ী রহমতটি তখনই লক্ষ করা যায় যখন আপন নফস হতে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তা লাভ করা যায়।

মহৎ চিন্তা আর মহৎ আমল দ্বারা মানুষের মধ্য হতে খাল্লাসমুক্ত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করাটাই মানুষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সওয়াব এবং উত্তম একটি আশ্রয়স্থল। মহৎ চিন্তা আর মহৎ আমলগুলোর দ্বারা মোহ-মায়ার বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে রহিম-রূপী আল্লাহর ক্রমার মাধ্যমে জ্ঞানাতবাসী হওয়া যায়। এইরূপ ক্রমাপ্রাপ্ত হতে না পারলে 'সায়াত' নামক একটি ভয়াবহ সময় আসবে যখন পর্বতগুলো ভ্রমণে চলে যাবে এবং এই পৃথিবীও দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে যাবে। দুনিয়ার লোভনীয় ধন-সম্পদের চাকচিক্যটি যে মাত্র কিছুদিনের জন্য, ইহা সবাই কমবেশি বুঝতে পারি। তারপরেও বুঝি না। কেন বুঝি না? আপন-আপন নফসের সঙ্গে খাল্লাস-রূপী মায়ার বন্ধনটি দিবানিশি কুমন্ত্রণার পর কুমন্ত্রণা দিয়ে চলছে আর সেই কুমন্ত্রণাটিকেই সত্য বলে ধরে নিয়ে অগ্রসর হই। কিছু মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এই কুমন্ত্রণাগুলো পরিষ্কার ধরা পড়ে এবং অসহায় এতিমের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি এবং তখন আর কিছুই করার থাকে না। মনেই হতে চায় না যে, এই আয়াত তিনটিতে ভাষার শব্দ চয়নে যে একই কথা, একই বিষয়, একই দর্শন বলা হচ্ছে। খাল্লাস-রূপী মোহ-মায়ার বন্ধন হতে মুক্তির সাধনাটি যারা করতে চায় এই চাওয়াটাই তাদের তকদির। আর যারা চায় না, ওটাও তাদের তকদির। এই তকদির আল্লাহ রহিম-রূপে বদল করে দেন, নতুবা বারবার দুনিয়ার লোভ-মোহের ঘূর্ণায়মান চক্রে আবর্তিত হতে হয়। সুতরাং, চরম পর্যায়ে কোনো গাল-মন্দের অবকাশটি থাকে না।

পাঠকদের আরেকটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, কোরান-এর একমাত্র দর্শনটি হলো আপন নফস হতে খাল্লাস-রূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলা তথা মোহ-মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে আপন নফসের সহিত রব-রূপী আল্লাহকে তথা রহকে পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত করে তোলা। এই ইসলামি দর্শনটিকে সুন্দর মনে করতে চাই। কারণ, এক ইসলাম তিন কুড়ি তের টুকরা তথা তেহাজ্জের ফেরকায় ভাগ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু ফেরকা সুফিবাদের নামটুকুও শুনতে চায় না, বরং সুফিবাদের অনুসারী গাউসুল আজম গাউসে পার্কি, মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি, মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি, হজরত শামসে তাবরিজ, আহমদ কবির রেফায়ি, হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি -

এ-রকমভাবে বহু সুফিবাদের ধারক-বাহকদেরকে কাকের ফতোয়া দিতেও সামান্য লজ্জা শ্রমটি হারিয়ে ফেলেছে। এইসব ফেরকাওয়ালাদের নৈতিক অধঃপতন এত নিচে নেমে গেছে যে সুফিবাদের ভক্তরা কমবেশি সবাই বুঝতে পারে। খাল্লাস-রূপী মায়ার কুমন্ত্রণায় দুনিয়ার চাকচিক্যময় বৈভবের প্রতি প্রতিনিয়ত যে-কুমন্ত্রণা দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত কোরান-এর অনেক সূরাতেই দেখতে পাই। দেখতে পাই সূরা ইউনুস-এ, দেখতে পাই সূরা জুমার-এ, দেখতে পাই সূরা হাদিদ-এ এবং দেখতে পাই জলিল কদেরের সাহাবা হজরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.)-এর বর্ণিত হাদিসে।

৪৮. ওয়া (এবং) উরিদু (তাহাদেরকে সামনে আনা হইল, তাহাদেরকে সামনা-সামনি করা হইল, তাহা প্রকাশ করা হইল, তাহাদেরকে উপস্থিত করা হইবে, তাহাদেরকে আনা হইবে [মূল শব্দ 'আরাদা' হইতে উরিদু], তাহারা

হাজির হইবে, তাহাদেরকে সম্মুখবর্তী করা হইল, তাহাদেরকে মুখোমুখি করা হইল, তাহাদেরকে সম্মুখে আনা হইল, তাহাদেরকে হাজির করা হইল, তাহাদেরকে সমাগত করা হইল) আলা (উপর) রাব্বিকা (তোমার রবের, তোমার প্রতিপালকের, তোমার সদাপ্রভুর) সাফ্ফান (কাতার, সফ, সারি, শ্রেণী, লাইন)।

প্ট এবং তাহাদেরকে সামনে আনা হইল তোমার রবের উপর সারিবদ্ধভাবে।

+ লাকাদ্ (নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে, অবশ্যই) জিতুম্না (তোমরা আমাদের কাছে আসিয়াছ, তোমরা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছ, তোমরা আমাদের কাছে হাজির হইয়াছ, তোমরা আমাদের নিকট সমাগত হইয়াছ) কাম্মা (যেমন) খালাকুনাকুম্ (তোমাদেরকে আমরা সৃষ্টি করিয়াছিলাম) আওওয়ালা (প্রথম) মাররাতিন্ (একবার)।

প্ট নিশ্চয়ই তোমরা আমাদের কাছে আসিয়াছ যেমন প্রথমবার তোমাদেরকে আমরা সৃষ্টি করিয়াছিলাম।

+ বাল্ (বরং) জাআমতুম্ (তোমরা বলিয়াছিলে, তোমরা বুঝিয়াছিলে, তোমরা দাবি করিয়াছিলে, তোমরা ভাবিয়াছিলে, তোমরা ধারণা করিয়াছিলে, তোমরা মনে করিয়াছিলে) আললান্ (যে কখনোই না) নাজ্আলা (আমরা করিব, আমরা বানাইব, আমরা উপস্থিত করিব, আমরা সম্পাদন করিব, আমরা হাজির করিব, আমরা সমাগত করিব) লাকুম্ (তোমাদের জন্য) মাওইদান্ (ওয়াদার সময়, প্রতিশ্রুত সময়, অঙ্গীকারের সময়, প্রতিজ্ঞার সময়)।

প্ট বরং তোমরা ভাবিয়াছিলে যে কখনোই আমরা হাজির করিব না তোমাদের জন্য ওয়াদার সময়।

৪৯. ওয়া (এবং) উদ্দিয়া (উপস্থিত করা হইবে, দেওয়া হইবে, পেশ করা হইবে, নির্মাণ করা হইয়াছিল) কিতাবু (কিতাব, আমলনামা [এখানে 'কেতাব' বলতে আমলনামাকেই বোঝানো হইয়াছে। যেমন জ্ঞানাত অর্থ বেহেশত, কিন্তু এই জ্ঞানাতই কোথাও-কোথাও বাগান তথা উদ্যান বুঝিয়েছে। অবশ্য ইহা অধম লেখকের ধারণা এবং এই ধারণাটি ভুল হলেও বলার কিছু থাকবে না]) ফাতারাল্ (সূতরাং তুমি দেখিবে) মুজ্জরিম্বিনা (পাপী, অপরাধীদেরকে, পাপাচারীদের, দোষীরা) মুশফিকিনা (ভয়কারীগণ, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কগ্রস্ত, ভীত, শঙ্কিত) মিম্বমা (তাহা হইতে) ফিহি (ইহার মধ্যে) ওয়া (এবং) ইয়াকুলুনা (তাহারা বলিবে) ইয়াওয়াইলাতানা (হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, হায় সর্বনাশ আমাদের, হায় আমাদের দুঃখ, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের) মালি (কেমন) হাজ্জাল্ (এই) কিতাবি (কেতাব, আমলনামা) লা (না) ইয়ুগাদিরু (ছাড়ে, বাদ দেয়) সাগিরাতান্ (ছোট) ওয়া (এবং) লা (না) কাবিরাতান্ (বড়) ইল্লা (কিন্তু, একমাত্র, ব্যতীত) আহসাহা (তাহা গুনিয়া রাখা, তাহা গণনা করিয়া রাখা, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা)।

প্ট এবং উপস্থিত করা হইবে কেতাব (আমলনামা) সূতরাং তুমি দেখিবে দোষীদেরকে ভীত তাহা হইতে ইহার মধ্যে এবং তাহারা বলিবে হায় সর্বনাশ আমাদের, কেমন এই কেতাব (আমলনামা), ছাড়ে না ছোট এবং না বড় (-কে) গণনা করিয়া রাখা ব্যতীত।

+ ওয়া (এবং) ওয়াজ্জাদু (তাহারা পাইবে) ম্মা (যাহা) আমিলু (আমল করিয়াছে) হাদিরান্ (উপস্থিত, সামনে, সামনাসামনি)।

প্ট এবং তাহারা পাইবে যাহা আমল করিয়াছে (উহাকে) সামনাসামনি।

+ ওয়া (এবং) লা (না) ইয়াজ্জলিমু (জুলুম করা) রাব্বুকা (তোমার রব) আহাদান্ (কাহাকেও)।

প্ট এবং জুলুম করিবেন না তোমার রব কাহাকেও।

১ ব্যাখ্যা : এই দুটি আয়াতের প্রথমটিতেই বলা হয়েছে যে, তোমার প্রতিপালক সারিবদ্ধ অবস্থায় তাদের সবাইকে হাজির করবেন। মৃত্যু নামক ঘটনাটি ঘটবার পর প্রতিটি নফস তথা মানুষের দুনিয়ার জাগতিক জীবনের সর্বপ্রকার কর্মগুলো পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে। মৃত্যু-ঘটনা ঘটবার আগের জীবনটিকে এখানে প্রথমবারের জীবন বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বলে দেওয়া হলো যে, তোমার রবের নিকট তোমাদেরকে আবার হাজির করা হবে। মানুষ মনে করতে চায় যে, মৃত্যু নামক ঘটনাটি ঘটে যাবার পর আবার তাদেরকে কেমন করে আনয়ন করা হবে। প্রতিটি মানুষের মূল দেহটির মূলে যে সূক্ষ্ম দেহটি অবস্থান করে সেই সূক্ষ্ম দেহটি শুক্রকীটের মধ্যে দিয়ে আনা হয়ে থাকে। শুক্রকীটের মধ্যে যে-দেহটি অবস্থান করে উহা এতই সূক্ষ্ম দেহ যে চর্মচক্রে দেখা যায় না। কিন্তু এই অতীব সূক্ষ্ম দেহটিকে মূল দেহে রূপান্তর করার পর আপন-আপন রবের নিকট দাঁড় করানো হয়। শুক্রকীটে অবস্থান করা সূক্ষ্ম দেহটি ধারণ করার পর হতে নফসের ভালো-মন্দ বুঝবার জাগরণটি না আসা পর্যন্ত পুনরায় রবের নিকট দাঁড় করানো হয় না। তাই বলা হয়েছে, প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পর যেভাবে তোমাদেরকে রবের নিকট আনয়ন করা হয়েছিল পুনরায় তোমাদেরকে সেইভাবেই তোমাদের রবের নিকট আনবার ব্যবস্থাটি করা হচ্ছে। কিন্তু মৃত্যু-ঘটনাটি ঘটবার আগে তোমরা মনে করেছিলে যে মরে যাবার পর পুনরায় আর আসতে হবে না। কাঁঠালের বীজ, আমের আঁটি এবং বটবুকের বীজগুলো দেখলে কেমন করে মনে হতে পারে যে কাঁঠাল গাছটি এই ক্ষুদ্র বিটির ভেতর অতীব সূক্ষ্মরূপে কাঁঠাল গাছের সব রকম গুণাগুণ নিয়ে লুকিয়ে আছে? আমের আঁটিটি দেখে কেমন করে মনে হতে পারে যে এই ছোট্ট আঁটিটির ভেতরে বড় আম গাছটির সব রকম গুণাগুণ নিয়ে লুকিয়ে আছে? তারপর সূক্ষ্ম একটি বটবুকের বীজের ভেতর কেমন করে বিরাট বিশাল একটি বটবুকের সব রকম গুণাগুণ নিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে? ইহা সহজে বিশ্বাসের আওতায় আসতে চায় না। চোখে দেখা যায় না যে, শুক্রকীটের অভ্যন্তরে একটি বিরাট মানবদেহ লুকিয়ে আছে। ইহাও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় বৈকি! মৃত্যু একটি ঘটনা মাত্র, কিন্তু ধ্বংস নয়। সুতরাং, মৃত্যু-ঘটনার দ্বারা একটি নফস তথা একটি প্রাণ ধ্বংস হয়ে যায় না, বরং কর্মফল অনুযায়ী রূপান্তর ঘটে। তাই বলা হয়েছে, পরবর্তী জীবনের আমলনামাগুলো (এখানে আমলনামাকেও কেতাব বলা হয়েছে) প্রতিটি মানুষের তথা প্রতিটি নফসের নিকট পরিষ্কাররূপে তুলে ধরা হবে এবং পরবর্তী জীবনটি কেমন হতে যাচ্ছে তা পূর্ববর্তী জীবনের আমলনামার উপরেই ভিত্তি করে দেহ-ধারণ করে দাঁড় করানো হবে এবং এই আমলনামাগুলোর মধ্যে এমন সব ছোট-ছোট এবং বড়-বড় বিষয় তুলে ধরা হবে যা দেখে প্রতিটি নফস আতঙ্কিত হয়ে পড়বে, ভয়-ভীতিতে অবাক বিস্ময়ে বিস্মিত হয়ে পড়বে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেই নফসগুলো তথা মানুষগুলো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বে যখন দেখতে পাবে যে তাদের ছোট-বড় সব রকম আমলগুলো মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে আপন রবের নিকট গৃহীত হয় নাই। পূর্ববর্তী জীবনের আমলনামাগুলোর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী জীবনটি দাঁড় করানো হবে। ইহাই পূর্ববর্তী জীবনের সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিগুলোর কর্মফল তথা আমলনামা। এই বিষয়ে আপন রব সামান্য এদিক-সেদিকও করেন না তথা জুলুম করা হয় না। আপন রবের কখনোই কোনো অবস্থাতেই কারো সঙ্গে জুলুম করার প্রস্তুতিই অবান্তর, বরং আপন-আপন কর্মফল তথা আমলনামার উপরেই ভিত্তি করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানোর কথাটি বলা হয়েছে। কেউ-কেউ আবার নফসকে

দাঁড় করানোর পরিবর্তে রুহকে দাঁড় করিয়ে ফেলেন। রুহকে যেখানে দাঁড় করানো হয় সেখানে ফেরেশতাদেরকেও ওই একই সারিতে দাঁড় করানোর কথাটি বলা হয়েছে। রুহ যেখানে নাজেল করা হয় সেখানে ফেরেশতাদেরকেও নাজেল করার কথাটি অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু এই আয়াত দুইটিতে রুহ এবং ফেরেশতার কথাটি বলা হয় নি তথা উল্লেখ করা হয় নাই এবং উল্লেখ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ, ভালো-মন্দের আমলনামাগুলো নফসের উপর বর্তায়, রুহের উপর নহে। নফসের উপর এই আমলনামাগুলো বর্তায় বলে রুহ আর ফেরেশতার কথাটি আসা অবান্তর। সুতরাং, যে যাহা সীমিত স্বাধীনতার জীবনে উপার্জন করে সে তাহাই আপনি-আপন রব হতে পেয়ে থাকে।

পরিশেষে, সবচেয়ে বেশি অবাক হই তখনই যখন দেখি বাংলার বাউল সম্রাট বাবা লালন শাহ তাঁর গানের মধ্যে এই গভীর রহস্যের কথাগুলো কী সুন্দর ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

৫০. ওয়া (এবং) ইজ্ (যখন) কুলনা (আমরা বলিয়াছিলাম) লিল্মলাইকাতি (ফেরেশতাদেরকে) উসজ্জুদ (তোমরা সেজদা করো) লিআদাম্মা (আদমকে) ফাসাজাদু (সুতরাং তাহারা [ফেরেশতারা] সেজদা করিয়াছিল) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) ইবলিসা (ইবলিস)।

প্ট এবং যখন আমরা বলিয়াছিলাম ফেরেশতাদেরকে, তোমরা সেজদা করো আদমকে, সুতরাং তাহারা সেজদা করিয়াছিল ইবলিস ব্যতীত।

+ কানা (ছিল) মিনাল্ (হইতে) জিননি (জিনদের) ফাফাসাকা (সুতরাং সে নাফরমানি করিল, সুতরাং সে আনুগত্যের সীমা হইতে বাহির হইয়া গেল, সুতরাং সে ফাসেক হইল [মূল শব্দ 'ফিসকুন' হইতে ফাসাকা শব্দটি আসিয়াছে], সুতরাং সে আদেশ অমান্য করিল) আন্ (হইতে, থেকে) আম্মরি (নির্দেশ, আদেশ, কাজ, অবস্থা, ব্যাপার) রাববিহি (তাহার রবের, তাহার প্রতিপালকের, তাহার সদাপ্রভুর)।

প্ট (সে) ছিল জিনদের হইতে সুতরাং সে ফাসেক হইল তাহার রবের নির্দেশ হইতে।

+ আফাতাত্‌তাখিজুনাহ (তবুও কি তোমরা তাহাকে ধরো, তবুও কি তোমরা তাহাকে পছন্দ করো, তবুও কি তোমরা তাহাকে বলো, তবুও কি তোমরা গ্রহণ করিবে) ওয়া (এবং) জুররিইয়াতাহ (তাহার বংশধরকে, তাহার সন্তানদেরকে, তাহার আওলাদদেরকে [ছোট-ছোট বান্দাদেরকে 'জুরইয়া' বলা হয়, কিন্তু সচরাচর বড়-ছোট সমস্ত সন্তানকে 'জুরইয়া' বলা হয়]) আউলিয়াআ (অভিভাবক, বন্ধু, সঙ্গী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, তত্ত্বাবধায়ক, আশ্রয়দাতা) মিন্দুনি (আম্মাকে ছাড়া, আম্মাকে ব্যতীত) ওয়া (এবং) হম্ম (তাহারা) লাকুন্ম (তোমাদের জন্য) আদুওউন্ (দুশমন, শত্রু [আদা হইতে আদুওউন্])।

প্ট তবু কি তোমরা তাহাকে গ্রহণ করিবে এবং তাহার বংশধরকে অভিভাবকরূপে আম্মাকে ব্যতীত এবং তাহারা তোমাদের জন্য দুশমন।

+ বিসা (মন্দ, একেবারেই নিকৃষ্ট, খারাপ, অপকৃষ্ট, কু, অসৎ, দুর্ঘট, অশুভ, অননুকূল) লিজ্জালিমিনা (জালেমদের জন্য, অপরাধী, অন্যায়কারী, নীতিলঙ্ঘনকারী, জুলুমকারী, উৎপীড়ক) বাদালান্ (বদলা, বিনিময়, প্রতিদান, দানের বদলে দান, পরিশোধ, প্রত্যর্পণ, ফেরত)।

প্ট জালেমদের জন্য খারাপ (এই) বিনিময়।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের ব্যাখ্যাটি লিখতে গেলে অনেক রকম কথা এসে পড়ে এবং এই কথাগুলোকে বিস্তারিতভাবে সাজিয়ে লিখতে গেলে অনেক কিছু লিখতে হয়। কিন্তু সংক্ষেপে লিখাটাই ভালো মনে করছি। প্রথমেই আল্লাহ

ফেরেশতাদেরকে আদমকে সেজদা করার হুকুমটি দিলেন। যেহেতু ফেরেশতাদের ইমাম আজাজিল তাই আজাজিলের উপরও এই সেজদাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। আদমকে সেজদা করার হুকুমটি ফেরেশতারা মেনে নিল – তথা মানতেই হবে – কারণ, ফেরেশতাদেরকে ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাটি দেওয়া হয় নাই তথা ফেরেশতাদেরকে নফসও দেওয়া হয় নাই এবং রুহও দেওয়া হয় নাই। ফেরেশতারা আল্লাহর গুণবাচক নুরের তথা সেফাতি নুরের তৈরি। সুতরাং, ফেরেশতাদের আদমকে সেজদা করার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকার কথাই ওঠে না। নির্বাচন করার ক্ষমতাটি দেওয়া হলে তথা ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাটি দেওয়া হলে সেজদা দেবে কি দেবে না সেই প্রশ্নটি উঠে আসে। এখানে ফেরেশতাদের বেলায় এই প্রশ্ন উঠতেই পারে না, কারণ ফেরেশতাদেরকে নফসও দেওয়া হয় নাই এবং রুহও দেওয়া হয় নাই। সুতরাং, আদমকে ফেরেশতাদের সেজদা দেবার বিষয়টিতে অবাক কিছুই নাই। কিন্তু অপরপক্ষে, আজাজিল যদিও ফেরেশতাদের ইমাম, কিন্তু আজাজিল জিনজাতি হতে আগত। মানুষের মতো জিনজাতিতেও নফস এবং রুহ দেওয়া হয়েছে। তাই কোনটা ভালো হবে আর কোনটা মন্দ হবে এই নির্বাচন করার বিচার-বিশ্লেষণটি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু আজাজিল জিনজাতি হতে আগত সেই হেতু আজাজিলের মধ্যে নির্বাচন করার শক্তি ও ক্ষমতাটি দেবার কারণে আজাজিল বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আদমকে সেজদা দেবার প্রশ্নে অক্ষমতা প্রকাশ করল তথা আজাজিল এক কথায় আদমকে সেজদা দিতে অস্বীকার করল তথা সেজদা দিল না। আরেকটু পরিষ্কার করে আগেই বলে রাখি যে, এই এবাদত করার বিষয়টিতে কেবলমাত্র জিন এবং মানুষকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সৃষ্টিরাজ্যের আর কাহাকেও এই আদেশটি দেওয়া হয় নাই (অবশ্য অধম লেখকের জানা মতে। কারণ, পৃথিবী নামক গ্রহের মতো অন্য কোনো গ্রহে জীব আছে কি না জানা নাই।) কেন দেওয়া হয় নি? কারণ, আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য তোহিদে বাস করে এবং যারা তোহিদে বাস করে তাদের জন্য আর এবাদত করার উপদেশটি প্রযোজ্য নয়। সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য আল্লাহর তসবিহ পাঠ করেছে তথা আল্লাহর গুণগানে সব সময় রত আছে তথা ‘ইউসাব্বিহ লিল্লাহি’ বলা হয়েছে। সুতরাং, তোহিদের মোকামে প্রবেশ করতে পারলে আর এবাদত-বন্ধেগি করার উপদেশটি থাকে না।

যেহেতু আজাজিল ফেরেশতাদের সরদার হলেও জিনজাতি হতে আগত তাই ভালো-মন্দ নির্বাচন করার ক্ষমতাটি আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে এবং সেই হেতু আদমকে সেজদা করতে অস্বীকার করল এবং বলে ফেলল, আমি আদম হতে উত্তম। আদম হতে উত্তম হবার আজাজিল কর্তৃক ঘোষণা দেওয়াটিকে আল্লাহ অহংকার করা হলো বলে গণ্য করলেন। এখন ‘অহংকার’ শব্দটি হলো ‘বালাসা’। যদিও বালাসা শব্দটি আরবি ভাষায় প্রচলিত আছে, কিন্তু বালাসা শব্দটি হিব্রু ভাষা হতে আগত। যেমন চেয়ার শব্দটি বাংলা নয়, কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে। আসলে চেয়ার শব্দটি ইংরেজি ভাষা হতে আগত। তেমনি ‘বালাসা’ তথা অহংকার শব্দটি নাউন তথা বিশেষ্য এবং অ্যাডজেকটিভ তথা বিশেষণ হলো ইবলিস। এখানে আজাজিলকে আদমের নিকট আনুগত্য তথা আত্মসমর্পণ তথা সেজদা দিতে অস্বীকার করার দরুন অহংকারী তথা ইবলিস বলা হয়েছে। আদমকে কেন সেজদা দিতে আদেশ করা হলো? – যেহেতু আদমের মধ্যে আল্লাহ রুহ ফুৎকার করে দিয়েছেন তথা আল্লাহ নুরে মুহাম্মদি-রূপে আদমের ভিতর নিজেই অবস্থান করছেন। (যেহেতু অধম লেখক মুসলমান সেই হেতু নুরে মুহাম্মদি লিখলাম এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তাদের নবি-রসূল এবং মহাপুরুষদের নামে এই নুরের নামকরণ করতে পারেন।) এখানে

কিছু নফস ফুৎকার করার কথাটি বলা হয় নি। এবং কোরান-এর কোথাও আল্লাহ নফস ফুৎকার করেছেন এমন একটি কথাও নাই। কারণ, নফস হলো প্রাণ তথা জীবিতা আর রুহ হলো পরমাত্মা তথা উলঙ্গ করে বলতে গেলে – স্বয়ং আল্লাহ। আরও অনেক অনেক কথা, অনেক-অনেক উপমা তুলে ধরতে পারতাম, কিছু ইচ্ছা করেই আর তুলে না ধরে এক কথায় বলতে হলো যে আদমকে ইবলিস সেজদা দিতে অস্বীকার করল। কারণ, সে ছিল জিন এবং রবের আদেশ পালন না করার দরুন ফাসেক হয়ে গেল এবং মানবজাতিকে এই ইবলিস তথা অহংকারী এবং যারা অহংকারের অনুসরণ-অনুকরণ করে চলে সেই বংশধরদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ গ্রহণ করতে আল্লাহ মানা করে দিলেন। এবং আল্লাহ আরও পরিস্কার ভাষায় বলে দিলেন যে, এই ইবলিস এবং এই ইবলিসের বংশধরেরা মানবজাতির জন্য দুশমন তথা শত্রু এবং এরাই প্রকাশ্য শত্রু এবং এই অহংকারীদেরকে জালেম বলা হয়েছে এবং এর বিনিময়টি হলো একটি মন্দ, একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ।

৫১. মা (না) আশ্বাদুহম (আমি তাহাদেরকে সাক্ষী করিয়াছি, তাহাদেরকে দেখাইয়া দিয়াছি [মূল শব্দ ‘ইশ্বাদ’ হইতে আগত], আমি তাহাদের সাক্ষী রাখি, আমি তাহাদেরকে ডাকি, আমি তাহাদেরকে আহ্বান করি, আমি তাহাদেরকে আমন্ত্রণ জানাই [পাঠক, এখানে লক্ষ করুন, আল্লাহ ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার না করে ‘আমি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কারণ, আল্লাহ কোনো দেশের রাজা বা রানি নহেন। কারণ, রাজা-রানিরা সব সময় ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার করেন। এই কথাটুকু পাঠকদেরকে জানানোর প্রয়োজন মনে করতাম না যদি অনেক তফসিরকারিক দুনিয়ার রাজা-রানির মতো আল্লাহরও ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার করার উপমা তুলে না ধরতেন। আল্লাহ কখনো কোরান-এ নিজে ‘আমি’-রূপে আবার কখনো ‘আমরা’-রূপে যে উল্লেখ করেছেন এই গোপন রহস্যটি যিনি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নাম শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি এবং তাঁর রচিত কোরানি দর্শন নামক কোরান-এর তিন খণ্ডে রচিত তফসিরটি পড়লে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।) খালকাস (জন্ম, সৃষ্টি, সৃষ্টি করা, বানানো) সাম্মাওয়াতি (আকাশসমূহ) ওয়া (এবং) আরদি (পৃথিবী) ওয়া (এবং) লা (না) খালকা (সৃষ্টি) আনফুসিহিম (তাহাদের নফসসমূহকে, তাহাদের নফসগুলিকে, তাহাদের নিজেদেরকে)।

পষ্ট আমি তাহাদেরকে সাক্ষী করি না পৃথিবী এবং আসমানগুলির সৃষ্টিতে এবং তাহাদের নফসগুলির সৃষ্টিতেও না।

[পাঠক, এখানে একটু লক্ষ করুন যে, নফসগুলিকে সৃষ্টি করার কথাটি বলা হয়েছে। কিছু কোরানি-এ রুহ বিষয়ে ২১ বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং একবারের তরেও রুহকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভুলেও (?) বলা হয় নি। কারণ, রুহ সৃষ্টি নহে, বরং রুহ আল্লাহর আদেশ এবং উলঙ্গ করে বলতে গেলে আল্লাহ নিজে স্বয়ং। এই নফস আর রুহের পার্থক্যটুকু যারা বুঝতে পারেন নাই তারা কেমন করে কোরান তফসির করার ঔদ্ধত্যটি প্রকাশ করেন উহা অধম লিখকের জানা নাই। এখানে বলা হয়েছে ‘আনফুসিহিম’ তথা তাহাদের নফসগুলি, অথচ রুহ একবচন। রুহ কখনোই বহুবচনে বলা হয় নাই। সুতরাং, ‘আনফুসিহিম’-এর বদলে ‘আনরুহিহিম’ বলার প্রশ্নই ওঠে না। রশিদ নোমানি-র লোগাতুল কোরান-এ বলা হয়েছে যে নফসের বহুবচনটি হলো ‘আনফুস’ অথবা ‘নুফস’।

+ ওয়া (এবং) মা (না) কুনতু (‘কুনতু’ অর্থ আমি ছিলাম। এখানেও লক্ষ করবার বিষয়টি হলো, আল্লাহ ‘আমরা’ ছিলাম না বলে ‘আমি ছিলাম’ বলেছেন। সুতরাং, ‘আমি’ এবং ‘আমরা’ এই দুটো শব্দ অকের হিসাবের মতো

পাবেন। সুতরাং, কোরান-এর অনুবাদে ‘আমরা’-কে ‘আমি’ লেখার মধ্যে কোনো বীহাদরি আছে বলে মনে হয় না। আমি ছিলাম, আমি হই) মৃতত্যাখিজাল (প্রস্তুতকারক, গ্রহণকারী, অবলম্বনকারী, বরণকারী, ধারণকারী [‘ইন্তেখাজ’ হতে আগত]) মুদিললিনা (পথহারাদের, বিভ্রান্তকারীদের, বিভ্রান্তদের, পথভ্রষ্টদের, বিপথগামীদের) আদদান (সাহায্যকারী, ব্রাণকারী, বাহুশক্তি, বাহু, কনুই হইতে কাঁধ পর্যন্ত [জ্জ.জ্জ. হাভা])।

প্ট এবং আমি ছিলাম না পথহারাদেরকে গ্রহণকারী, সাহায্যকারী।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে প্রথমেই একটি বিরাট প্রশ্ন দাঁড়িয়ে যায় আর সেই প্রশ্নটি হলো, আকাশসমূহ এবং পৃথিবী এবং মানুষদেরকে সৃষ্টি করার সময় কেমন করে এবং কাদেরকে সাক্ষী রাখার কথাটি বলা হলো ইহা অধম লিখক বুঝতে পারলাম না। যারা পথহারা তথা যারা বিভ্রান্তকারী তাদের সাহায্যকারী না থাকাটাই একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আসমান, জমিন এবং মানুষদেরকে সৃষ্টি করার সময় যে সাক্ষী রাখার কথা বলা হয়েছে ইহার মাঝে নিশ্চয়ই কোনো মারোফতের গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে। সৃষ্টি করার সময় আল্লাহর সাক্ষী রাখার কথাটি এই আয়াতে যে বলা হয়েছে, সেই সাক্ষী কাদেরকে রাখা হয়েছিল – কোনো পাঠক যদি অধম লিখককে প্রশ্ন করেই বসেন, তা হলে উত্তরটি হবে, ইহার মর্মার্থ জানা নাই। তবে কেন জানি মনে হয়, এই আকাশ বলতে মন এবং পৃথিবী বলতে দেহ যদি অর্থটি করা হয় তা হলে ইহার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু এত জটিলতার মাঝে হাত বাড়িয়ে কিছু একটা লিখতে চাই না।

৫২. ওয়া (এবং) ইয়াওমা (দিন, ভোর হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় [‘ইয়াওমা’র বহুবচন ‘আইয়াম’ তথা দিনগুলি]) ইয়াকুলু (তিনি বলিবেন) নাদউ (তোমরা ডাক) শুরাকায়ি (আমার শরিকগণকে, আমার শরিকদেরকে, আমার অংশীদারদেরকে, আমার ভাগীদারদেরকে) আল্লাজিনা (যাহারা) জাআমতুম (তোমরা মনে করিয়াছিলে, তোমরা বলিয়াছ, তোমরা বুঝিয়াছ, তোমরা দাবি করিয়াছ, তোমরা ধারণা করিয়াছ, তোমরা ভাবিয়াছ) ফাদাআওহম (সুতরাং তাহাদেরকে তাহারা ডাকিবে) ফালাম (সুতরাং না, অতএব না, এই জন্য না, কাজে-কাজেই না) ইয়াস্তাজিবু (তাহারা ডাকে সাড়া দিবে, তাহারা আস্তানে সাড়া দিবে, তাহারা জবাব দিবে, তাহাদেরকে জবাব দিতে হইবে, তাহাদেরকে হুকুম কবুল করিতে হইবে) লাহম (তাহাদের জন্য) ওয়া (এবং) জাআলনা (আমরা [আল্লাহ] রাখিয়া দিব। [পাঠক, এখানে লক্ষ্য করুন আল্লাহ ‘আমি’ না বলে ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অথচ একটু আগেই ‘আমি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।) বাইনাহম (তোমাদের মধ্যে, তাহাদের মাঝে, তাহাদের মধ্যস্থলে) মাওবিকান (ধ্বংসের স্থান, জেলখানা, জাহান্নাম, সর্বনাশের জায়গা, নরক)।

প্ট এবং যেইদিন তিনি (আল্লাহ) বলিবেন, তোমরা ডাক আমার শরিকদের – যাহাদেরকে তোমরা মনে করিয়াছিলে, সুতরাং তাহাদেরকে তাহারা ডাকিবে, সুতরাং তাহারা ডাকে সাড়া দিবে না তাহাদের জন্য, এবং আমরা রাখিয়া দিব তাহাদের মধ্যে সর্বনাশের জায়গা।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা লিখার আগে প্রথমেই বলে রাখতে চাই যে, মুখে-মুখে শেরেকের কথাটি বললেই শেরেক হতে মুক্তি পাওয়া যায় না। যেমন, পাখিরের আঘাত খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় অথবা খাল্লাসের কুমন্ত্রণার অপকারিতা হতে মুক্তি পেতে হলে বাস্তব পদক্ষেপটি অবশ্যই নিতে হইবে। কাহাফের মতো, তুর পর্বতের মতো, হেরা গুহার মতো নির্জন স্থানে একাকী খাল্লাসমুক্ত একজন আল্লাহর ওলির আদেশ-উপদেশটিকে বরণ করে

নিম্নে ধ্যানসাধনায় তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে মুক্তিলাভ করার চেষ্টায় রত থাকতে হবে। অন্যথায় কতগুলো সুন্দর-সুন্দর কথার বস্তা বহন করে যেতে হবে। এখানে বস্তাপচা কথাটি খাটে নী। কারিণ, আল্লাহর কালামের কথাগুলো পাকাপাকি। এই পবিত্র বস্তাভরা পবিত্র উপদেশগুলো মুখে-মুখে অন্যকে বলা যাবে, উপদেশ দেওয়া যাবে এবং নাগরআলি সাগরআলির মতো অনেক কথার আনু উপদেশদাতা হওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবে ফলটি দাঁড়ায় শূন্য। সুফি কবি আল্লামা ইকবাল দুঃখ করে বলেছিলেন, তুর পাহাড় তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মুসা কোথায়? পবিত্র কথার বস্তাগুলো তো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আল্লাহর ওলিরা কোথায়?

যে-নফস খান্নাসমুজ্জ সেই নফসের মন ও কর্ম পবিত্র। যে-নফসের সঙ্গে খান্নাস মিশে আছে সেই নফস অপবিত্র এবং খান্নাসমিশ্রিত নফসটি শেরেকের ফাদে পড়ে যায় তথা মনটিও অংশীবাদের দিকে ধাবিত হয় এবং এই অংশীবাদী মনটি দুর্বল, অসুস্থ এবং লোভ-মোহের নানা রকম মূর্তির পূজারি হয়ে যায়। মৃত্যু-ঘটনা দিয়ে যখন লোভ-মোহের সব রকম মায়ারি বন্ধন হতে ছিন্ন হয়ে পড়ে তখনই সেই হতভাগ্য নফসটি পরিষ্কার বুঝতে পারে যে যাদের উপর জীবনভর নির্ভর করেছে তারা আর কোনো কাজে আসবে না। ‘বাইনাহম মাওবিকান’- অর্থাৎ, তাহাদের মধ্যে যে সর্বনাশের কর্মফলটি অপেক্ষা করছে সেই পর্দা, সেই দেয়াল, সেই প্রাচীর আর অবশিষ্ট থাকে না এবং সব কিছু তখন নিজেই দেখতে পায় এবং আর কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না। এই বৈষয়িক জীবনের আফালন, প্রতিযোগিতা, ধন-সম্পদের বড়াই, আত্মগুরিতা সব কিছু তখন কর্পুরের মতো উড়ে যায় আর অসহায় বোকার মতো আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কী বিচিত্র এই দুনিয়ার লীলাখেলা! কী বিচিত্র এই লোভ-মায়ার ফাদগুলো! সুতরাং, সর্বোচ্চ পর্যায়ে কোনো গালিও থাকে না, ভাষাও থাকে না, বিশেষণও থাকে না, ব্যাখ্যাও থাকে না। এবং ওই পর্যায়ে উপনীত হয়ে হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি আর একটি বাক্যও লিখে যেতে পারেন নি। কেবলই বোবার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকতেন। হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালির সমস্ত রচনা তো দেয়ালের এই পিঠে দাঁড়িয়ে রচিত হয়েছিল; হোক না সেই দেয়াল যতই সুক্ষ্ম, যতই পাতলা – তবু তো দেয়াল! কিন্তু ওই সুক্ষ্ম, ওই পাতলা দেয়ালটিও যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং সমস্ত রহস্য ধরা পড়ে গেল তখনই ইমাম গাজ্জালির কলমটি আর চলতে পারল না, আর লিখতে পারলেন না। সুতরাং, পবিত্র নফসের উপর আল্লাহ যখন জাগ্রত হয়ে ওঠেন তখনই পবিত্র নফসের হাত দুটো আল্লাহর হাতে পরিণত হয়ে যায়, জিহ্বা-কান-নাক-চোখ সবই তখন আল্লাহর হয়ে যায় এবং এই আল্লাহর ধারণ করা পাত্রটি তথা নফসটিকেই আল্লাহর ওলি বলা হয় এবং এই ওলির শিষ্যত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত তথা মুরিদ না হওয়া পর্যন্ত মনের অজানায় জ্ঞানের অবহেলায় শয়তানেরই শিষ্যত্ব বরণ করে নিতে হয়। তাই তো আমরা দেখতে পাই, মহানবি বলেন, আল এলমুল হেজ্জাবুল আকবর তথা এই জ্ঞানই অনেক সময় আল্লাহর পরিচয়, আল্লাহর নৈকট্য পাবার পথে সবচেয়ে বড় দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমির দর্শন লেখা যায়, লেখা যায় লালনের দর্শন, বেদম ওয়ারসির দর্শন, বুললে শাহের দর্শন, শাহ আবদুল লতিফ ভিটাইর দর্শন, আমির খসরুর দর্শন, শাকিল বদাউনির দর্শন, আরজু শাহারানপুরির দর্শন, সানজার গাজিপুরির দর্শন – কিন্তু বাবা শামসে তাবরিজের দর্শনের কথাগুলো এতই উলঙ্গ, এতই দিগম্বর, এতই নেংটা, এতই খোলা যে লিখতে গেলে মনে হয় সবই আল্লাহ বাবুল আলামিনের মহা বিচিত্র মহা লীলাখেলায় জুলজালালের রূপ ধারণ করে, অসীম রূপ ধারণ করে ছুটে চলা।

৫৩. ওয়া (এবং) রাআল (দেখা, দর্শন করা, প্রত্যক্ষ করা) মুজরিমুনা (অপরাধীরা, পাপীরা, গুনাহগারেরা) নারা (আপ্তন, অগ্নি) ফাজান্ন (সূতরাং তাহারা মনে করিল, সূতরাং তাহারা ভাবিল, সূতরাং তাহারা বুঝিতে পারিল, সূতরাং তাহারা বিশ্বাস করিল, সূতরাং তাহারা ধারণা করিল) আননাহম্ম (যে তাহারা, নিশ্চয়ই তাহারা, অবশ্যই তাহারা, নিঃসন্দেহে তাহারা) মুওয়াকিউহা (তাহাতে পড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে পতিত হইবে, তাহাতে নিপতিত হইবে) ওয়া (এবং) লাম্ম (না) ইয়াজিদু (তাহারা পাইবে, তাহাদেরকে পাইতে হইবে) আনহা (তাহার নিকট হইতে, তাহা হইতে, তাহার উপর) মাসুরিফান্ (ফিরিয়া যাইবার স্থান, ফিরিবার জায়গা, বাঁচিবার উপায়, পরিগ্রাণের উপায়)।

প্ট এবং দেখিবে অপরাধীরা আপ্তন, সূতরাং তাহারা বুঝিতে পারিবে যে তাহারা তাহাতে পতিত হইবে এবং তাহারা পাইবে না তাহা হইতে ফিরিয়া যাইবার স্থান।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে মৃত্যু-নামক ঘটনাটি ঘটে যাবার পর অপরাধীরা দেখতে পাবে যে তারা আপ্তনের মধ্যে নিপতিত হচ্ছে এবং সেই আপ্তন হতে পালাবার পথ অথবা পরিগ্রাণ পাবার কোনো রকম স্থান বা উপায় পাবে না। একটু লক্ষ করুন, এখানে ‘নারা’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘নারা’ অর্থ আপ্তন। যদিও আমরা এই আপ্তনকে জাহান্নামের আপ্তন বলেই জানি, কিন্তু এখানে জাহান্নাম শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। এই আপ্তন মানুষের খান্নাস-মিশ্রিত মনটিকে জ্বালাতে সবচাইতে বেশি ভালোবাসে। এই আয়াতের প্রকাশ্য ব্যাখ্যাটি দেওয়া হলো, কিন্তু ভেতরের ব্যাখ্যাটি দেওয়া হলো না। ইহা পাঠক আপন-আপন জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিবেকের দ্বারা আশা করি বুঝে নিতে পারবেন।

৫৪. ওয়া (এবং) লাকাদ্ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে) সাররাফনা (আমরা [আল্লাহ্] বারবার বুঝাইয়াছি, আমরা বিভিন্ন ধরনের বয়ান করিয়াছি, আমরা নানাভাবে বুঝাইয়াছি, আমরা বিশদভাবে বুঝাইয়াছি, আমরা অনেক প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছি) ফি (মধ্যে) হাজ্জাল্ (এই) কুরআনি (কোরান-এ) লিন্নাসি (মানুষদের জন্য) মিন্ (হইতে, থেকে) কুল্লি (প্রত্যেক, সব, সমস্ত, সকল) মাসালিন্ (উদাহরণ, প্রমাণস্বরূপ নিদর্শন, দৃষ্টান্ত, উপমা, নজির, তুলনা, সাদৃশ্য)।

প্ট এবং অবশ্যই আমরা [(আল্লাহ্) – পাঠক, লক্ষ করুন, এখানে আল্লাহ্ ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন] বিভিন্ন ধরনের বয়ান করিয়াছি এই কোরান-এর মধ্যে মানুষদের জন্য প্রতিটি উপমা (উদাহরণ) দিয়া।

+ ওয়া (এবং) কীনা (হয়, ছিল, ঘটে) ইনসান্ (মানুষ) আক্সারা (অধিকাংশ, বেশিরভাগ) শাইয়িন্ (বিষয়ে, ব্যাপারে, কিছুতে) জাদালান্ (খুব বেশি ঝগড়া, কঠিন ঝগড়া, তর্কপ্রিয়, বিতর্কপ্রিয়, বিরোধপ্রিয়, ঝগড়াটে, বিবাদপ্রিয়, কলহপরায়ণ, অ্যাঙ্কিমনি ইন ডিসপুট [লোগাতুল কোরান : হজরত রশিদ নোমানি, জে. জি. হাবা, হ্যাম ওয়ের : জে. এম. কাওয়ান]।

প্ট এবং মানুষ হয় বেশিরভাগ বিষয়ে কলহপরায়ণ।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে কোরানুল হাকিম-এ মানুষদের জন্য সব রকম উদাহরণ বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। তবুও এত কিছু জানবার পরেও অধিকাংশ মানুষ তর্ক-বিতর্কে মেতে ওঠে এবং কলহপরায়ণ হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হলো, কোরান-এ এত ব্যাখ্যা, এত বিশ্লেষণ, এত আদেশ-উপদেশ দেবার পরেও কেন কলহপরায়ণ হয়ে ওঠে? কেন তর্ক-বিতর্কে নিজেদেরকে লিপ্ত করে? উত্তরটি তো ওই একই কথা আর সেই কথাটি হলো, প্রতিটি পবিত্র নফসের সঙ্গে অপবিত্র খান্নাসটিকে মিশিয়ে দেবার কারণে। কারণ, এই খান্নাসই হলো সব রকম কুমন্ত্রণা দেবার একমাত্র গুরুত্বকর তথ্য

হোতা। সুতরাং, বারবার ওই একটি কথাই বলা হচ্ছে এবং অধম লিখকও বারবার বোঝাতে চেষ্টা করছে।

৫৫. ওয়া (এবং) মা (না, কি, যে, যাহা, যতক্ষণ পর্যন্ত, যদি [লোগাতুল কোরান : রশিদ মোম্বানি, আল মাওরিদ : রহি বাল বাকি, জে. জি. হাভী, হ্যাস ওয়ের : কাউয়ান, আল কাম্বুস, আল মেরুবাহ]) মানাতান (নিষেধ করিল, ফিরাইয়া রাখিল, বিরত রাখিয়াছে, সে বাধা দিয়াছে) নাসা (মানুষেরা, লোকদের, মানুষকে) আন (যে) ইউম্বিনু (ইমান আনে) ইজ (যখন) জাআ (আসিয়াছে) হম্বল (তাহাদের কাছে, তাহাদের নিকট) হদা (হেদায়েত, পথনির্দেশ, দিকনির্দেশনা) ওয়া (এবং) ইয়াস্তাগফিরু (ক্ষমা চাহিবার) রাব্বাহম্ব (তাহাদের রবের কাছে, তাহাদের প্রতিপালকের নিকট) ইল্লা (ব্যতীত, ছাড়া, একমাত্র, কিছু) আন (যে) তাতিয়াহম্ব (তাহাদের নিকট আসে) সুন্নাত্ (সুন্নত, অনুসৃত নীতি, যে-নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, যে-আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে, যে-রীতি অনুসরণ করা হইয়াছে) আউয়ালিনা (পূর্ববর্তী, আগের, অতীতের, প্রাথমিক, পূর্বকালের) আও (অথবা, ইচ্ছামাত্রিক, কিছু, যখন, যদিও, কি) ইয়াতিইয়াহম্বল (তাহাদের কাছে আসিবে, তাহাদের নিকট আসিবে, তাহাদের কাছে লইয়া আসিবে, তাহাদের নিকট আসে) আজাবু (আজাব, শাস্তি, নিগ্রহ, দণ্ড, সাজা) কুবলান (সম্মুখীন, চোখের সম্মুখে, আগে, সামনাসামনি, সরাসরি, সামনে, নারীর যোনাঙ্গ, মেয়েদের লজ্জাস্থান)।

স্ট এবং মানুষদেরকে কীসে ফিরাইয়া রাখিল ইমান আনিত্তে যখন তাহাদের নিকট হেদায়েত আসিয়াছিল এবং তাহাদের রবের কাছে ক্ষমা চাহিতে, একমাত্র যে তাহাদের কাছে আসিবে সুন্নত আগের অথবা তাহাদের নিকট আসিবে আজাব সামনাসামনি।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে প্রথমেই এই বলে প্রশ্ন করা হয়েছে যে কী কারণে অথবা কীসে তাদের রবের নিকট ক্ষমা চাইতে বারণ করা হলো। ‘কীসে অথবা কী কারণে’ বারণ করার কথাটি এ-জন্যই এখানে বলা হলো যে, মানুষের নিকট হেদায়েতের বাণী আসবার পরেও যারা ইমান আনছে না, বরং তাদের পূর্ববর্তীদের নিয়ম তথা বিধান অথবা তাদের নিকট যে আজাব দেওয়া হবে সেই বিষয়টি জানবার পরেও এবং কিছুটা বুঝবার পরেও রবের উপর ইমান আনার প্রশ্নে বিরত থাকাটি একটি অবাক বিষয়ের বিষয়ে পরিণত হওয়া তো স্বাভাবিক। মহানবির এই আজাবের বাণী তথা শাস্তির কথাগুলো জানবার পরেও তাদের পূর্ববর্তী তথা বাপ-দাদাদের নিয়ম-নীতির প্রতি অবিচল থাকায় ‘কি’ শব্দটি ব্যবহার করে কে নিষেধ করল বলে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তবে সেই নিষেধকারীর নামটি কিছু এখানে উল্লেখ করা হয় নি। এই নিষেধ সেই করে যাকে নিষেধ করার ডিউটি তথা দায়িত্বটি দেওয়া হয়েছে। এই ডিউটি তথা এই দায়িত্বটি যাকে দেওয়া হয়েছে তাকে তো সবাই কিছু না কিছু বুঝতে পারে আর সে হলো আপন-আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে অপবিত্র খান্নাসি – যে সব সময় কুমন্ত্রণা দিয়ে চলছে। এই কুমন্ত্রণার ফাঁদে পূর্ববর্তীরা তথা বাপ-দাদারা আটকিয়ে ছিল, তাই মহানবির দেওয়া হেদায়েতের বাণী এবং রবের নিকট ক্ষমা চাইবার কথাটিকেও তারা উপেক্ষা করছে। আজাব তথা শাস্তির ভয়টি যে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ইহা জানা সত্ত্বেও তারা মহানবির পবিত্র বাণীগুলো মেনে নিতে পারছে না।

এই আধুনিক যুগেও আমরা দেখতে পাই যে, বান্ধার হক মেরে দিলে, অথবা খণ পরিশোধ না করলে, অথবা এতিমের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করে না দিতে পারলে, অথবা আধা হাত জমি মেরে দিলে কী সব ভয়ঙ্কর আজাবের কথা তথা শাস্তির কথা জানিয়ে দেবার পরও এবং এই শাস্তি যে ক্ষমা করে

দেবার বিধানটি আল্লাহ রাখেন নি – সেই কথা, সেই বাণীগুলো জানবার এবং বুঝবার পরেও আমাদের মাঝে অনেকেই তো সামান্যসামান্য অমান্য করে চলছে। ভয়ঙ্কর আজাবের এবং আল্লাহ কর্তৃক ক্রমার অযোগ্য কথাটি জানবার পরেও এই জাতীয় অপরাধগুলো বেশিরভাগ মুসলমানেরা কি করেছে না? তবে কি মৌখিক স্বীকৃতি এবং বাস্তব স্বীকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্যটি আমরা দেখতে পাই না? দৈনিক খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলোতে এই জাতীয় আকাম-কুকামের কথাগুলো কি প্রতিদিন ছাপার অঙ্করে দেখতে পাই না? তা হলে ইহার কী উত্তর হবে, কী সমাধান হবে ইহা অধম লিখকের জানা নাই।

৫৬. ওয়া (এবং) মা (না) নুরসিলুল (আমরা পাঠাই, আমরা প্রেরণ করি [পাঠক, একটু খেয়াল করুন, এখানে আল্লাহ 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করেন নি, বরং 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং যেখানেই নাজেল করার কথাটি পাবেন সেখানেই আল্লাহ 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেন। ইহা অনেকটা দুইয়ে দুইয়ে চার-এর মতো।) নুরসালিনা (রসুলদেরকে, রসুলেরা [পাঠক, লক্ষ্য করুন, রসুলের বহুবচন 'নুরসালিন' তথা রসুলদেরকে পাঠবার কথাটি এখানে বলা হয়েছে এবং 'নবি' অথবা 'নবীইন' অথবা 'আন্বিয়া' তথা নবির বহুবচনটি অথবা একবচনের 'নবি' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি]) ইল্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত, ছাড়া) মুবাশশিরিনা (শুভ সংবাদদাতা, সুসংবাদদাতা) ওয়া (এবং) মুনজিরিনা (ভয় প্রদর্শনকারীগণ, সতর্ককারীগণ, সাবধানকারীগণ)।

প্ট এবং আমরা পাঠাই না রসুলদেরকে সুসংবাদদাতা এবং সাবধানকারী ছাড়া।

+ ওয়া (এবং) ইউজাদিলুল (তাহারা ঝগড়া করে, তাহারা বিতর্ক করে, তাহারা তর্ক করে, তাহারা যুক্তি দেখায়) লাজিনা (যাহারা) কাফারু (কুফরি করিয়াছে) বিল্বাতিলি (মিথ্যার দ্বারা, অসত্যের সহিত, অন্যত দ্বারা, কল্পনা দিয়া, অমূলকভাবে, ভুলের সঙ্গে, বিভ্রান্তির সহিত) লিয়ুদহিঁদু (ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য) বিহিল (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা) হাক্কা (সত্য) ওয়া (এবং) ইউতাখাজু (তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বানাইয়াছে) আয়াতি (আম্মার আয়াতগুলি, আম্মার নিদর্শনসমূহ [পাঠক, লক্ষ্য করুন, এখানে আল্লাহ 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার না করে 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন তথা 'আম্মার আয়াতসমূহ বলা হয়েছে]) ওয়া (এবং) মা (যা, না, কি, যে, যাহা, যতক্ষণ পর্যন্ত, যদি) উনজিরু (সতর্ক করা হইয়াছে, সাবধান করা হইয়াছে) হজুওয়ান (ঠাট্টা করা, বিদ্রূপের বিষয়, বিদ্রূপরূপে, খেলোরূপে, মঞ্চুরা হিসাবে, তামাশারূপে, উপহাসের সহিত, পরিহাস করিয়া, রঙ্গ করিয়া, রগড় হিসাবে, কটাক্ষ করিয়া, কোতুকরূপে, শ্রেষের সহিত, ব্যঙ্গ করিয়া [লোগাতুল কোরান : রশিদ নোমানি, কোরআনের অভিধান : মাওলানা মো. আবদুল আজিজ, লুগাতুল কোরআন : সেকান্দার আলী তালুকদার, আল মাওরিদ, আল কামুস, আল মেজবাহ, জে. জি. হাভা, হ্যাস ওয়ের : কাওয়ান, স্টেইন গাস, মিলটন])।

প্ট এবং ঝগড়া করে যাহারা কুফরি করিয়াছে মিথ্যার দ্বারা, ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য ইহার দ্বারা সত্যকে, এবং তাহারা গ্রহণ করিয়াছে আম্মার আয়াতগুলিকে এবং যাহা (দ্বারা) সাবধান করা হইয়াছে (উহাকে) ঠাট্টা-বিদ্রূপ (রূপে)।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে রসুলগণকে সুসংবাদদাতা এবং সাবধানকারীরূপে পাঠানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তথা রসুলগণকে পাঠানো হয় খান্নাসমুহ জীবনপথের দিকনির্দেশকরূপে। আল্লাহর রসুলেরা হলেন সমগ্র

মানবজাতির জন্য ভালো-মন্দের পার্থক্যটি করে চলবার আলোকিত মানদণ্ড। কিছু পরক্ষণে আমরা দেখতে পাই, নবিদের নাজেল করা ওহির সত্যটিকে কেমন করে চাপা দেওয়া যায় তার ফন্দি-ফিকিরে ব্যস্ত থাকা। কারণ, আল্লাহর আয়াতসমূহ তথা নিদর্শনগুলি যাহা নবি-রসুলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় উহাকে খেলো বিষয়রূপে গ্রহণ করে নেয়। এই সুসংবাদ এবং এই ভয় প্রদর্শন করাটি নবি-রসুলেরা যে করে থাকেন সেই সুসংবাদটি বলতে কী বোঝায় এবং ভয় প্রদর্শন বলতে কী বোঝানো হয়েছে? কাফেরদের অনেকেই তো সম্মান এবং বৈষয়িক ধন-সম্পদের মালিক হয়ে আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করছে। তা হলে তাদের জন্য যে সুসংবাদটির কথা বলা হয়েছে উহা কীসের সুসংবাদ? আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে মোহ-মায়ার কুমন্ত্রণাদাতা খান্নাসটিকে মিশিয়ে যে একাকার করে দেওয়া হয়েছে সেই খান্নাস হতে মুক্তির বারতা শোনাবার এবং শিক্ষা দেবার জন্যই নবি-রসুলদের আগমন। কাফিরেরা এই খান্নাসটিকে আলাদা করে দেখতে পায় না, তাই এত তর্ক, এত বিতর্ক এবং ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ভাবতে অবাক লাগে যে এত বড় কোরানুল করিম-এর তিরিশটি পারা কত রকম উপমা-উদাহরণে এবং কত রকম ভাষার শৈলীতে মাত্র একটি দর্শনই, একটি কথাই তুলে ধরেছে আর সেই কথাটি হলো : হে মানুষ, তুমি কখনোই একা নও, বরং তোমার সঙ্গে যে মোহ-মায়ার কুমন্ত্রণা দেওয়া খান্নাসটিকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে উহা তোমার জানা নাই। ওই খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দাও নতুবা মুসলমান বানাও। যারা ওই খান্নাসটিকে তাড়াবার মহড়ায় রত আছে তারাই আমানু তথা ইমান আনয়ন করেছে। এই আমানুরাই যখন ধ্যানসাধনা এবং মোরাকীবা-মোশাহেদার মাধ্যমে খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছে অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলতে পেরেছে তারাই মোমিন এবং এই মোমিনদের সঙ্গেই আল্লাহ আছেন বলে কোরান-এ ঘোষণা করা হয়েছে। অধম লিখক অবাক বিষ্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি যখন দেখতে পাই একটিমাত্র দর্শনকে কত রূপ-মাধুর্যের ভাষা দিয়ে আল্লাহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। আজ হতে বায়ান্ন বছর আগে ঢাকার স্টেডিয়ামে আমার সঙ্গীতপ্রিয় মামার সঙ্গে গিয়েছিলাম ওস্তাদ নাজাকাত আলি এবং ওস্তাদ সালামত আলির ঠুমরি রাগে সঙ্গীত পরিবেশন করার জলসায়। মাত্র একটি বাক্য, তাও মাত্র চারটি শব্দ : ‘দেখো রিনা মানে সামা’- আড়াই হাজার ভিন্ন-ভিন্ন সুরের রঙ-চঙে সঙ্গীত পরিবেশন করার জাদুকরী শৈলীটিকে বিষ্ময়ে সবাই উপভোগ করেছেন। সেদিন মনে-মনে ডেবোঁছি, মাত্র চারটি শব্দের একটি বাক্যকে আড়াই হাজার নব-নব সুর ও ঝঙ্কারে কেমন করে ফুটিয়ে তোলে!

৫৭. ওয়া (এবং) মান্ (কে) আজ্লাম (বেশি জ্বালেম, অত্যাচারী, অধিক নিপীড়ক, অধিক উৎপীড়ক, অধিক নিগ্রহকারী, বড়ই অবিচারক) মিমমান (মধ্য হইতে) জুক্কিরা (জিকির দেওয়া হইয়াছে, উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে স্মরণ করানো হইয়াছে) বিআয়াতি (আয়াত দ্বারা, নিদর্শন দ্বারা, উদাহরণ দ্বারা, দৃষ্টান্ত দ্বারা, চিত্রের দ্বারা, প্রমাণ দ্বারা, নিশান দ্বারা) রাববিহি (তাহার রবের, তাহার প্রতিপালকের, তাহার সদাপ্রভুর) ফাআরাদা (সূতরাং সে মুখ ফিরাইয়া নেয়) আনহা (তাহা হইতে) ওয়া (এবং) নাসিয়া (ভুলিয়া গিয়াছে) মা (যাহা) কাদ্দামাত্ (আগে পাঠাইয়াছে, আগে করিয়াছে, পূর্বে প্রেরণ করিয়াছে) ইয়াদাহ (তাহার দুই হাত, তাহার হস্তদ্বয়)।

প্ট এবং কে বেশি জ্বালেম (তাহাদের) মধ্য হইতে তাহার রবের আয়াত দ্বারা জিকির দেওয়া হইয়াছে, সূতরাং সে মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইতে, এবং ভুলিয়া গিয়াছে যাহা আগে করিয়াছে তাহার দুই হাতে।

+ ইননা (নিশ্চয়ই আমরা) জ্ঞাতানা (আমরা করিয়াছি, আমরা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, আমরা দিয়াছি) আলা (উপরে) কুলুবিহিম্ (তাহাদের কলবগুলি, তাহাদের অন্তরগুলি, তাহাদের হৃদয়গুলি) আকিন্নাতান্ (পর্দা, ঢাকনা, আবরণ, যবনিকা, অবগুণ্ঠন, ঘোমটা, বোরখা) আন্ (যে, এই যে, হইতে) ইয়াফকাহহ (তাহারা বুঝিতে পারে) ওয়া (এবং) ফি (মধ্যে) আজানিহিম্ (তাহাদের কর্ণসমূহ) ঔয়াক্রান্ (বধির হওয়া, কানে কন্ম শোনা, বধিরতা, ভার, কাল)।

প্ট নিশ্চয়ই আমরা তাহাদের কলবগুলির উপর পর্দা আমরা দিয়াছি [এখানে লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো, 'ইন্নি' তথা নিশ্চয়ই আমি না বলে 'ইননা' তথা নিশ্চয়ই আমরা বলা হয়েছে। আল্লাহ্ 'আমি'-র পরিবর্তে এখানেও 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারপর 'জ্ঞাতান্নি' তথা 'আমি দিয়াছি' না বলে 'জ্ঞাতানা' তথা আমরা দিয়াছি বলেছেন তথা 'আমি' না বলে আল্লাহ্ 'আমরা' বলেছেন এবং এই আমরা বলার গোপন রহস্যটি একদম খোলামেলাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দিয়ে যিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তাঁর কোরান দর্শন নামক কোরান-এর তফসিরে তিনি হলেন শীহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি] যেন তাহারা বোঝে এবং তাহাদের কানগুলির মধ্যে (দিয়াছি) বধিরতা।

+ ওয়া (এবং) ইন্ (যদি, যদি না, অবশ্যই, না) তাদুউহম্ (তুমি তাহাদেরকে ডাকিয়াছ, ডাকিবে, তাহাদেরকে আশ্বাস করে) ইলা (দিকে) হদা (হেদায়েত, পথনির্দেশ, পরিচালনা, দিকনির্দেশনা) ফালান্ (সূতরাং না, অতএব না, এই জন্য না, কাজে-কাজেই না) ইয়াহতাদু (তাহারা হেদায়েত পাইবে, তাহারা সঠিক পথ পাইবে) ইজানু (তখন, ওই সময়, তাহা হইলে) আবাদান (সর্বদা, সব সময়, চিরকাল [অসীম ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহৃত হয়], কখনো নয়)।

প্ট এবং যদি তাহাদেরকে ডাকো হেদায়েতের দিকে সূতরাং তাহা হইলে কখনোই তাহারা সঠিক পথ পাইবে না।

১ ব্যাখ্যা : আল্লাহর আয়াত তথা দৃষ্টান্তগুলো নবি-রসুলেরা সুন্দর করে এবং বিরাট ধৈর্যধারণ করে বুঝিয়ে দেবার পরও বুঝতে চায় না যারা এবং যারা আল্লাহর এই উপদেশবাণীগুলো হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদেরকে কাকের বলা হয়ে থাকে। যারা ধর্মটিকে বুঝবার পরেও ত্যাগ করে তথা মানতে চায় না তাদেরকে কাকের বলা হয়ে থাকে। এই জাতীয় ধর্মীয় উপদেশগুলো শুনবার এবং জানবার পরেও যারা পূর্বের ধারণায় বন্দি হয়ে বেশি অন্ধকারে ডুবে ছিল তারা এই কথাগুলো ভুলে যায় তথা তাদের মনে থাকে না। এরূপ কাকেরদের কলব খাল্লাসের কুমন্ত্রণায় মোহ-মায়াব আবরণে এমনভাবে ঢেকে যায় যে তার ফলে আল্লাহর দেওয়া সত্য তথা সঠিক পথে অগ্রসর হবার কথাটি বুঝতে পারে না। এবং তাদের কর্ণকূহরে আল্লাহর বাণীগুলো আর ধাক্কা দিতে পারে না, তথা শিহরিত করে বিবেকের অন্ধ দূরজাটিকে কিছুটা হলেও ফাঁক করে দিতে পারে না। এ-জাতীয় মনোভাবের পরিবর্তন না করিতে পারলে তো কাকেরই থেকে যেতে হয়, এটাই আল্লাহর দেওয়া আইনের বিধি-বিধান। এই জাতীয় কাকের লোকদেরকে হেদায়েতের দিকে হাজারবার ডাকলেও তারা এই জীবনে হেদায়েত গ্রহণ করে না তথা আল্লাহর দেওয়া সঠিক পথে অগ্রসর হয় না। 'ইজা আবাদান' তথা একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থানকাল পর্যন্ত তথা এই জীবনের মৃত্যু-নামক ঘটনাটি ঘটে যাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এরা কাকেরই থেকে যায়। তাই এ-আয়াতে পরিশেষে বলা হয়েছে যে, তুমি যতই তাদেরকে হেদায়েতের বাণী শোনাও না কেন, যতই সঠিক পথের দিকে আশ্বাস করো না কেন, তারা কখনোই হেদায়েত লাভ করবে না, তথা আল্লাহর দেওয়া সঠিক পথে পা বাড়াতে চাইবে না। মহানবি (সা.)-এর জামানাতেও মহানবি (সা.)-এর মহা

উপদেশ শুনবার পরেও তাঁর আপন চাচা আবু লাহাব, আবু জাহেল এবং ওকবার মতো আরও অনেকেই হেদায়েত গ্রহণ করতে পারে নাই। হেদায়েতের বাণীগুলো শোনার পরেও তারা হেদায়েত গ্রহণ করতে পারল না। কেন পারল না? তাদের আপন-আপন নফসটিকে খান্নাস-রূপী শয়তান এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করা হয়। পূর্ণ চন্দ্রগ্রাসের সময় জোছনার বদলে ঘোর অন্ধকারটি যেমন দেখা যায় তেমনি এদের নফসগুলোকে খান্নাস-রূপী শয়তান পরিপূর্ণরূপে গ্রাস করার দরুন হেদায়েতের সামান্য একটি আলোর কণাও কলবে প্রবেশ করতে পারে না।

৫৮. ওয়া (এবং) রাব্বুকাল্ (তোমার রব, তোমার প্রতিপালক, তোমার সদাপ্রভু) গাফুর (ক্লামাশীল, মার্জনাকারী) জুর্রাহমাতি (রহমতের অধিকারী, রহমতওয়ালা, করুণাময়, দয়াময়, দয়াল)।

প্ট এবং তোমার রব ক্লামাশীল করুণাময়।

+ লাও (যদি, হয়, কী ভালোই না হইত) ইউআখিজ্জ (পাকড়াও করিতেন, সবলে ধরিতেন, গ্রেফতার করিতেন, দায়ী করা হইবে, গৃহীত হইবে না, গ্রহণ করা হইবে না) হম্ম (তাহাদের) বিম্মা (যাহা, ওই বস্তু হইতে) কাসাবু (তাহারা খারাপ কাজ করিয়াছে, তাহারা অর্জন করিল) লাআজ্জালা (তিনি অবশ্যই তাড়াতাড়ি করিলেন, অবশ্যই তিনি জলদি করিলেন, তিনি অবশ্যই ত্বরান্বিত করিলেন, অবশ্যই তিনি দ্রুত করিলেন, অবশ্যই তিনি ক্ষিপ্ৰভাবে করিলেন) লাহম্ম (তাহাদের জন্য) আজাবা (আজাব, শাস্তি, দণ্ড, নিগ্রহ, সাজা)।

প্ট যদি তাহাদের গ্রেফতার করিতেন যাহা তাহারা অর্জন করিয়াছে, অবশ্যই তাড়াতাড়ি করিতেন, তাহাদের জন্য শাস্তি।

+ বাল্ (বরং, পক্ষান্তরে, কিন্তু, এমন নহে) লাহম্ম (তাহাদের জন্য) মাওইদুন (একটি মেয়াদ, ওয়াদার সময়) লান্ (কখনোই না) ইয়াজ্জিদু (তাহারা পাইবে) মিন্দুনিহি (তিনি ব্যতীত, তিনি ছাড়া, তাঁহাকে ছাড়া) মাওয়িলান্ (ফিরিয়া যাইবার স্থান, আশ্রয়স্থল, পলায়নের জায়গা)।

প্ট পক্ষান্তরে তাহাদের জন্য একটি মেয়াদ (আছে), তাঁহাকে ছাড়া পলায়নের স্থান কখনোই তাহারা পাইবে না।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে করুণাময় রবরূপে অবস্থান করছেন। তিনি চাইলে পাপের দণ্ড সাথে-সাথে প্রদান করবার আইনটি রচনা করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে করুণার বশবর্তী হয়ে নির্দিষ্ট একটি সময়ের মেয়াদ দান করে পাপ হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মানুষকে সুযোগ দান করেছেন, যেন অনুশোচনায় তার প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসতে পারে এবং তাঁর করুণায় উদ্ধার লাভ করার সুযোগটি রেখে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তিনি ছাড়া এই দুনিয়াতে সব রকম দণ্ড হতে আর কোনো আশ্রয়দাতা নাই।

৫৯. ওয়া (এবং) তিল্কা (ওই, ওইটি [দূরের কোনো বস্তুর দিকে ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য এর ব্যবহার হয়। যথা, ওই বৃক্ষটি, ওই বইটি ইত্যাদি। অনেকেই 'এই', 'এইটা', 'এই সমস্ত' লিখে থাকেন, কিন্তু শাস্তিক অর্থে ইহা না লেখাই ভালো। তবে লিখলেও বলার কিছু নাই]) কুরা (অধিবাসী, বস্তিসমূহ, সম্পদগুলি, লোকালয়গুলি, গ্রামসমূহ, শহরগুলি) আহ্লাক্নাহম্ম (আমরা তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়াছি) লাম্মা (যখন, কিন্তু, অনেক জম্মা করিয়া, সংকীর্ণ করিয়া, এখনও, লওয়া, সংগ্রহ করা [জ্. জি. হাভা]) জালাম্ম (তাহারা জ্বলম করিয়াছিল, তাহারা অন্যায় করিয়াছিল, তাহারা অত্যাচার করিয়াছিল [এই 'জ্বলম' শব্দটি দিয়ে আপন নফসের উপর জ্বলম করাটিও বোঝায় আবার মানুষের উপর অত্যাচার করার প্রক্ষেপ জ্বলম বোঝানো হয়। সুতরাং, ইহা উভয়

ক্রেত্রেই ব্যবহৃত হয়।) ওয়া (এবং) জাআলনা (আমরা করিয়াছি, আমরা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, আমরা দিয়াছি, আমরা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি) লিমাহলিকিহিম্ (তাহাদের ধ্বংসের জন্য, তাহাদের বিনাশের জন্য, তাহাদের সংহারের উদ্দেশ্যে, তাহাদেরকে বিলোপ করিবার জন্য) মাওইদান্ (ওয়াদার সময়, ওয়াদার স্থান, প্রতিশ্রুতির সময়)।

প্ট এবং ওইসব লোকালয়গুলি আমরা [এখানে আল্লাহ 'আমি'র পরিবর্তে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন] ধ্বংস করিয়াছি যখন তাহারা জুলুম করিয়াছিল এবং আমরা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি তাহাদের ধ্বংসের জন্য ওয়াদার সময়।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা তথা আপন খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে চলা এবং জুলুম-অত্যাচারের কারণে ওইসব লোকালয় তথা জনপদ যুগে-যুগে, কালে-কালে ধ্বংস করে দেবার দৃশ্যগুলো দেখে আসছি। তাদের সবাইকে আত্মশুদ্ধি তথা সংশোধনের সুযোগ এবং নির্দিষ্ট একটি সময়ের মেয়াদ তথা অবকাশ তথা সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যখন এই সংশোধন হবার সুযোগটিকেও তুচ্ছ মনে করে অমান্য করতে থাকে এবং এই স্বেচ্ছাচারিতা, এই জুলুমের ধারাটি এমন একটি পর্যায়ে এসে পড়ে যে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবার মতো এবং এই দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাবার সময়টিকেই নির্দিষ্ট একটি সময়ের মেয়াদ বলা হয়েছে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদেও যখন মানুষ সংশোধন হবার সুযোগটি গ্রহণ করে না তখনই ধ্বংস করে দেবার কথাটি আসে। এখানে বলা হয়েছে যে, নবি-রসুলদের নির্দেশমতো তারা অনুতপ্ত হয় নি এবং অনুসরণও করে নাই, তাই তাদের ধ্বংস তারাই ডেকে এনেছে। এই আয়াতের ইহাই সার সংক্ষেপ।

৬০. ওয়া (এবং) ইজ্ (যখন, যে সময়, যেহেতু) কালা (বলিলেন) মুসা (মুসা) লিফাতাহ্ (তাহার খাদেমকে, তাহার সঙ্গীকে, তাহার গোলামকে, তাহার যুবককে, তাহার পরিচারককে, তাহার সহচরকে, তাহার সাথীকে) লা (না) আব্বাহ্ (আমি ছাড়িয়া দিব, আমি ছাড়িয়া দিতেছি, আমি পরিত্যাগ করিব, আমি বর্জন করিব, আমি পরিত্যক্ত করিব, আমি থাকিব, আমি নিবৃত্ত হইব, আমি বিরত হইব) হাত্তা (যতক্ষণ পর্যন্ত, যে পর্যন্ত, যখন) আব্বলুগা (আমি পৌছাইয়া যাইব, আমি উপস্থিত হইব, উদ্দিষ্টস্থানে আসা বা যাইয়া উপস্থিত হওয়া) মাজমাআ (মিলিত হইবার স্থান, সঙ্গমস্থল, মিলনস্থল, মোহনা) বাহরাইনি (দুই সমুদ্রের, দুইটি সাগরের) আও (অথবা, ইচ্ছামাফিক, কিন্তু যখন, যদিও, কি) আম্মদিয়া (আমি চলিয়া যাইব, আমি চলিতে থাকিব) হকুবান্ (দীর্ঘ সময়, বহু বছর, যুগ-যুগ, আশি বছরের সমান সময়, হাজারত আলির মতে সত্তর হাজার বছরের সমান সময়, বছর, লং স্পেস অব টাইম [জ্যে. জি. হাভা, হ্যাস ওয়ের : কাউয়ান, রশিদ নোমানি, সেকান্দার আলী তালুকদার, মো. আবদুল আজিজ])।

প্ট এবং যখন মুসা বলিলেন তাহার যুবককে, আমি থাকিব না যতক্ষণ না আমি পৌছাইব দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে অথবা আমি বহুকাল চলিতে থাকিব।

৬১. ফালাম্মা (সুতরাং যখন) বালাগা (তাহারা দুজনে পৌছাইল) মাজমাআ (মিলিত হইবার স্থান, সঙ্গমস্থল, মিলনস্থল, মোহনা) বাইনিহিমা (দুইজনের মধ্যে, দুইজনের মাঝে) নাসিইয়া (যাহা ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে, যাহাকে কেউ জানেও না স্মরণও করে না, ভুলিয়া যাওয়া) হতাহমা (তাহাদের দুইজনের মাঝে) ফাত্তাখাজা (সুতরাং ধরিল) সাবিলাহ্ (তাহার রাস্তা, তাহার পথ) ফিল্ (মধ্যে) বাহরি (সমুদ্র, সাগর) সারাবান (সুরঙ্গ)।

প্ট সুতরাং যখন তাহারা দুইজনে পৌঁছাইলেন দুইয়ের মিলনস্থলে, ভুলিয়া গেলেন তাহাদের মাছ (বিষয়ে), সুতরাং মাছটি ধরিল তাহার পথ সমুদ্রের সুরঙ্গের মধ্যে।

৬২. ফালামমা (সুতরাং যখন) জাওয়াজা (দুইজন অগ্রসর হইল, অতিক্রম করিল) কালা (বলিলেন) লিফাতাহ (তাহার যুবককে, তাহার খাদেমকে, তাহার সঙ্গীকে, তাহার গোলামকে, তাহার পরিচারককে, তাহার সহচরকে, তাহার সাথীকে) আতিনা (আমাদেরকে দাও) গাদাআনা (আমাদের সকালের খাওয়া, দিনের প্রথম ভাগের খাওয়া, সেহরি) লাকাদ্ (নিশ্চয়ই) লাকিনা (আমরা পাই, আমরা সাক্ষাৎ করি) মিন্ (হইতে) সাফারিনা (আমাদের সফর) হাজ্জা (এই) নাসাবান্ (ক্লান্তি, শ্রান্তি, কষ্ট, অবসাদ)।

প্ট সুতরাং যখন দুইজনে আগাইয়া গেলেন (মুসা) বলিলেন তাহার যুবককে, আমাদেরকে দাও আমাদের সকালের খানা, নিশ্চয়ই আমরা পাইয়াছি আমাদের সফর হইতে এই অবসাদ।

৬৩. কালা (বলিলেন) আরাইতা (আপনি কি দেখেন নাই, আপনি কি লক্ষ করিয়াছেন) ইজ্জ (যখন) আওয়াইনা (আমরা অবতরণ করিলাম, আমরা অবস্থান গ্রহণ করিলাম, আমরা আশ্রয় নিলাম, আমরা বিশ্রাম করিতেছিলাম) ইলা (দিকে) সাখরাতি (পাথর, প্রস্তর, শিলাখণ্ড) ফাইন্নিন্ (সুতরাং নিশ্চয়ই আমি) নাসিতুল্ (আমি ভুলিয়া গেলাম, আমি গাফেল হইলাম) হতা (মাছ) ওয়া (এবং) মা (না) আনসানিয়াহ্ (আমাকে তাহার সম্পর্কে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাকে ভুলাইয়াছিল) ইল্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত) শাইতান্ (শয়তান) আন্ (যে, ওই যে, হইতে) আজকুরাহ্ (তাহার স্মরণ, উহার সংযোগ)।

প্ট বলিলেন, আপনি কি দেখেন নাই, যখন আমরা আশ্রয় নিয়াছিলাম পাথরের দিকে, সুতরাং নিশ্চয়ই আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম মাছ এবং শয়তান ছাড়া (কেহ) আমাকে ভুলায় নাই তাহার স্মরণ হইতে।

+ ওয়া (এবং) ইততাখাজা (ধরিয়াছিল, গ্রহণ করিয়াছিল, লইয়াছিল) সাবিলাহ্ (তাহার পথ) ফিল্ (মধ্যে) বাহরি (সমুদ্র, সাগর) আজাবান্ (বিস্ময়করভাবে, আশ্চর্যজনকভাবে, অদ্ভুতরূপে, আজবভাবে, অসাধারণরূপে)।

প্ট এবং ধরিয়াছিল তাহার পথ সমুদ্রের মধ্যে বিস্ময়করভাবে।

৬৪. কালা (বলিলেন) জালিকা (ওইটাই) মা (যাহা) কুননা (আমরা ছিলাম, আমরা হই) নাবগি (আমরা তালাশ করিতেছিলাম, আমরা খোজ করিতেছিলাম, আমরা অনুসন্ধান করিতেছিলাম, আমরা সন্ধান করিতেছিলাম)।

প্ট (মুসা) বলিলেন, ওইটাই যাহা আমরা অনুসন্ধান করিতেছিলাম।

+ ফরিতাদ্দা (সুতরাং তাহারা দুইজনে উল্টী দিকে ফিরিয়া গেল, সুতরাং তাহারা দুইজনে পিছনের দিকে চলিতে লাগিল) আলা (উপরে) আসারিহিমা (তাহাদের দুইজনের পদচিহ্ন, তাহাদের উভয়ের পায়ের ছাপ, তাহাদের নিজেদের পদচিহ্ন) কাসাসান্ (তালাশ করিতে-করিতে, খুঁজিতে-খুঁজিতে, অনুসরণ করিতে-করিতে)।

প্ট সুতরাং তাহারা দুইজনে পিছনের দিকে চলিতে লাগিলেন তাহাদের দুইজনের পদচিহ্নের উপর অনুসরণ করিতে-করিতে।

৬৫. ফাওয়াজাদা (সুতরাং তাহারা দুইজনে পাইয়াছে, সুতরাং তাহারা দুইজনে পাইল) আবদান্ (বান্দা, গোলাম, দাস) মিন্ (হইতে) ইবাদিনা (আমাদের বান্দাদের, আমাদের গোলামদের, আমাদের দাসদের) আতাইনাহ্ (তাহাকে আমরা দিয়াছিলাম [এখানেও আল্লাহ্ 'আমি'র পরিবর্তে 'আমরা']

শব্দটি ব্যবহার করেছেন]) রাহমাতান্ (রহমত, অনুগ্রহ, দয়া, মেহেরবাণি, অনুকম্পা, করুণা, ক্লমাশীলতা, দরদ, মমতা [রশিদ নোমানি, আব্দুল আজিজ, সেকান্দার আলী, মহিউদ্দীন, জে. জি. হাভা, হ্যাম ওয়ের : জে. এম. কাওয়ান, আল মাওরিদ, আল মনজ্জেদ, আল কামুস, আল মেসবাহ]) মিন্ (হইতে, থেকে) ইনদিনা (আমাদের নিকট) ওয়া (এবং) আললাম্নাহ (আমরা তাকে শিখাইয়াছি, আমরা তাকে তালিম দিয়াছি) মিল্লাদুননা (আমাদের হইতে, আমাদের পক্ষ হইতে) ইল্মান্ (জ্ঞান)।

পূঁ সুতরাং তাহারা দুইজনে পাইল বান্দাকে আমাদের [এখানেও আল্লাহ 'আমি'র পরিবর্তে 'আমরা' বলেছেন] বান্দাদের মধ্য হইতে, আমরা তাকে দিয়াছিলাম রহমত আমাদের নিকট হইতে এবং আমরা তাকে শিখাইয়াছিলাম আমাদের হইতে জ্ঞান।

১ ব্যাখ্যা : উপরের চারটি আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হচ্ছে যে, হজরত মুসা (আ.)-এর মতো জাঁদরেল নবি, যার নাম কোরান-এ সম্ভবত একশত পঁচিশ বারের উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই নবি একজন যুবক সাথীকে নিয়ে দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রের দিকে পৌঁছাবার জন্য রওনা দিলেন। নবি মুসা (আ.)-এর সাথীটির নাম হজরত ইউশা ইবনে নুন (আ.)। এই ইউশা ইবনে নুনকে মুসা নবি বললেন যে, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে তথা মোহিনায় পৌঁছাতে পারব সেই পর্যন্ত আমি চলতেই থাকব এবং যুগ-যুগ ধরেও যদি আমাকে চলতে হয় তবুও আমি চলতেই থাকব। সেই যুগের কথাটি বলতে গিয়ে কেউ বলেছেন আশি বছর এবং ইহাই সর্বনিম্ন এবং কেউ বলেছেন হাজার বছরের উপরে। এখন জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠিতে (আধ্যাত্মিক নয়) এই দুইটি সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রটি হলো পারস্য উপসাগরের পূর্বপ্রান্ত এবং রোম সাগরের পশ্চিম প্রান্তের সঙ্গমস্থল। এই দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে কেহ যদি পায়ে হেঁটে যেতে চায় তা হলে খুব বেশি হলে তিন মাস লাগে কি না সন্দেহ। তা হলে যুগ-যুগ ধরে চলবার কথাটি বলাটা জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠিতে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। ধরে নিলাম, এক যুগ সমান আশি বছর, যুগ-যুগ বলতে আশি বছর যোগ আশি বছর তথা একশত ষাট বছর চলবার কথাটিতে আমার মনে হয় জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির মাপকাঠিতে বৈসাদৃশ্যতার প্রশ্নটি এসে দাঁড়ায়। সুতরাং, ইউশা ইবনে নুনকে সঙ্গে নিয়ে হজরত মুসা নবির যে দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হবার কথাটি বলা হয়েছে উহা একটি আধ্যাত্মিক অগ্রযাত্রা বলে মনে হয়।

তারপর বলা হয়েছে যে, যখন নবি মুসা (আ.) এবং তাঁর সাথী ইউশা (আ.) দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে তথা মোহিনায় গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাঁরা তাদের সঙ্গে নিয়ে আসা মাছের কথাটি ভুলে গেলেন। নবি মুসাকে একটি মাছ সঙ্গে নেবার কথাটি আল্লাহ বলেছিলেন এবং এও বলা হয়েছিল যে, যে-স্থানে মাছটি হারিয়ে যাবে অথবা ঝোলা বা খলি থেকে মাছটি বেরিয়ে সাগরে চলে যাবে সেই স্থানটি হলো দুই সাগরের মিলনস্থান। নবি মুসার সঙ্গে যে-মাছটি নেয়া হয়েছিল উহা তার সাথী ইউশা বহন করছিলেন। অনেকে বলেন, সেই মাছটি ভাজা ছিল; আবার অনেকে বলেন, জলশূন্য খলিতে মাছটি ছিল; আবার অনেকে বলেন, মাছ বহন করার যোগ্য জলপূর্ণ খলিতে মাছটি বহন করা হয়েছিল। সুতরাং, দুই সমুদ্রের মিলনস্থানে উভয়ের আসার সঙ্গে-সঙ্গে মাছটি সমুদ্রের পথ ধরে দ্রুত চলে গেল। অনেকে আবার দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রে একটি ঝরনা ছিল বলে উল্লেখ করেছেন এবং সেই ঝরনাটির নাম ছিল 'আইনাল হায়াতি' তথা সঞ্জীবনী ঝরনা। এই আইনাল হায়াতি নামক ঝরনায় মৃত মৎস্য অথবা ভাজা মাছ, তা সে যতই মরা হোক না কেন, সেই

আইনাল হায়াতি নামক ঝরনায় পতিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে জীবিত হয়ে যেত! লোকমুখে বৃদ্ধদের কাছে শুনেছি যে, বগুড়া জেলায় অবস্থিত মহাস্থানগড়ে পরশুরাম নামক এক রাজারও একটি জীয়ৎকুণ্ড তথা জীবন্ত কুপ ছিল – উহাতে মৃতকে নিক্ষেপ করলে জীবন্ত হয়ে যেত। এই কথাগুলো কতদূর সত্য নাকি রূপকথা বলতে পারব না। কারণ, তখন আমি (অধম লেখক) বগুড়া জেলা স্কুলে লেখাপড়া করি এবং বগুড়া শহরের সেউজগাড়ি এবং সুত্রাপুর নামক দুইটি স্থানে পাঁচ বছর অবস্থান করি।

তারপর তাঁরা উভয়ে পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন নবি মুসা তাঁর সাথী ইউঁশাকে বললেন, আমাদের নাম্তা ঝোলা হতে বাহির করো। কারণ, এই সফরে তথা এই ভ্রমণে ক্লান্তির অবসাদ অনুভব করছি। তাই তাঁরা উভয়ে একটি পাথরের উপর বিশ্রাম নেবার উদ্দেশ্যে বসে পড়লেন। নবি মুসা সেই যুবক সাথী ইউঁশাকে সেই মাছটির কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু যুবক ইউঁশা নবি মুসাকে বললেন যে, সেই মাছের কথাটি বলতে বা জ্ঞানাতো শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ইউঁশা যদি নবিই হয়ে থাকেন তা হলে শয়তান তাঁকে কেমন করে ভুলিয়ে দিতে পারে? সুতরাং, অনেক গবেষকই ইউঁশা নবি ছিলেন কি না সন্দেহ পোষণ করেন। আবার অনেক গবেষক মনে করেন যে, অনেক নবির কাছে শয়তান তার নিজস্ব দেহ ধারণ করে দেখা করত। এবং শয়তানের কুমন্ত্রণাটি একেবারেই খেলো বা বাতিলযোগ্য বলে কেমন করেই বা ফেলে দেই? কারণ, প্রথম নবি, প্রথম পরিপূর্ণ মানব, আদমকে কেমন করে এই শয়তানই নিষিদ্ধ বৃক্ষের আশ্বাদন করার কুমন্ত্রণাটি দিয়েছিল? তা হলে কি ইঁহা বলতে গেলে কোনো দোষের বিষয় হবে যে, সবই আল্লাহর লীলাখেলা, সবই তাঁর রহস্যময় নিপুণ শৈলীর প্রদর্শন?

তারপর, অবশেষে নবি মুসা (আ.) ও ইউঁশা (আ.) উভয়ে যে-পথ ধরে অগ্নসর হাট্টলেন সেই পথেরই পেছন দিকে তথা উল্টা দিকে তাঁদেরই পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে অগ্নসর হতে লাগলেন। কারণ, দুই সমুদ্রের মিলনস্থানটিতে মাছটি জীবিত হয়ে যে আগেই সাগরে চলে গেছে, সেই স্থানের দিকে পুনরায় যেতে শুরু করলেন তথা ফেলে আসা পথের দিকে পুনরায় অগ্নসর হতে লাগলেন। তারপর নবি মুসা (আ.) এবং ইউঁশা (আ.) আল্লাহর বাক্যদের মধ্য হতে এমন এক আবদানি তথা বাক্যের সাক্ষাৎ লাভ করলেন যাকে আল্লাহ রহমত দান করেছেন এবং সেই বাক্যকে আল্লাহর জ্ঞানভাণ্ডার হতে জ্ঞানদান করেছেন। এখানে একটু লক্ষ করার বিষয় হলো যে, আল্লাহ 'আমি' শব্দটি ব্যবহার না করে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন, আমরা আমাদের রহমত দান করেছি এবং আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার হতে জ্ঞানদান করেছি। 'আতাইনাহ রাহমাতান' তথা আমাদের রহমত দান করার কথাটি বলা হয়েছে এবং 'আললামনাহ মিন্ রাদুননা এলমান' তথা আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার হতে জ্ঞানদান করা হয়েছে এবং সেই জ্ঞান 'ইলম্নে লাদুনি' তথা যে-জ্ঞানের বিষয়টি সাধারণ মানুষের জ্ঞান থাকে না।

পরিশেষে, এই আয়াত কয়টির এবং সঙ্গে পঁয়ষটি নব্বই আয়াতটি সঙ্গে নিয়ে কিছু বলতে চাই। বলতে চাই যে, প্রথম পরিপূর্ণ মানব আদম (আ.)-কে যাহা দেওয়া হয়েছে তার সব কিছু তার নসলদের মধ্যে তথা সন্তানদের মধ্যে বীজরূপে অবস্থান করছে, কেবলমাত্র একটি বিষয় ছাড়া আর সেই বিষয়টি হলে নবুয়ত। কারণ, নবুয়ত মহানবি (সা.)-এর মাঝেই এসে শেষ হয়ে গেছে তথা 'খাতামান নাবি'। যদিও নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বেলায়েত শেষ হয় নাই, বরং বেলায়েতের ধারাটি চলমান তথা চলতেই থাকবে।

নবি মুসা একজন জাঁদরেল নবি। তিনি আল্লাহর সঙ্গে ওহির মাধ্যমে সংযুক্তই রয়েছেন। তা হলে প্রশ্ন আসে, তিনি কী রকম জিকির সাথে নিলেন? হয়তো এই সংযোগের অনেক প্রকার ধাপ থাকতে পারে। সুতরাং, নবি মুসার এই জিকির কেমন এবং কোন মোকামের তা তিনিই ভালো জানেন। আমরা ইহার কোনোই ধারণাটি দিতে পারব না। কারণ, যে যে-রকম সাধক সে সে-রকম মোকামে অবস্থান করে থাকেন। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, লা-মোকামে প্রবেশ করতে পারলে প্রভু এবং গোলামের কোনোই পরিচয় থাকে না। তখন দোনাহিকা শেকেল এক হয়, কিসকো খোদা কাঁহ আউর কিসকো গোলাম কাঁহ - তথা, প্রভু আর গোলামের চেহারা লা-মোকামে একাকার হয়ে যায় এবং তখন প্রভু প্রভুও থাকে না আর গোলাম গোলামও থাকে না। ইহাই তৌহিদ রাজ্যের মধ্যস্থল। ইহাই তৌহিদ সাগরের কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং, বাহিরের জগতের যে-জিকির তথা যে-স্মরণ সেই জিকির তথা স্মরণটি লা-মোকামে এসে শেষ হয়ে যায়। তখন কথাও থাকে না, দর্শনও থাকে না, থাকে শুধুমাত্র একাকার হয়ে যাবার মূলমন্ত্র। মুখের জিকির, মুখের স্মরণ যেমন উধাও হয়ে যায়, তেমনি দৃষ্টির দর্শন এবং অস্ত্রের দর্শনটিও উধাও হয়ে যায়। সুতরাং, লা-মোকামে প্রবেশ করতে পারলে জিকিরও থাকে না, দিদারও থাকে না; তথা স্মরণও থাকে না, দর্শনও থাকে না। তাই আমরা দেখতে পাই, বোত্বের সাগরে অবস্থান করা হজরত হাজ্জি আলি শাহ বলেছেন : না আল্লাহ না বান্দা, না হা হ্যায় না ই হ্যায় - ইহাই লা-মোকামের কথা, যে-কথাটি আমরা সাধারণ মানুষেরা বুঝতে পারি না।

৬৬. কালা (বলিলেন) লাহ (তাহাকে [বান্দাকে]) মুসা (মুসা) হান্ (কি, নহে) আততাবিউকা (আমি আপনাকে অনুসরণ করিব, আমি আপনার আনুগত্য করিব, আমি আপনার সঙ্গে থাকিব) আলা (উপর) আন (যে, এই যে, হইতে) তুয়াল্লিম্মানি (আপনি আমাকে শিখাইবেন) মিম্মা (যাহা) উল্লিম্মতা (আপনাকে শিখানো হইয়াছে, আপনাকে তালিম দেওয়া হইয়াছে) রুশদান (ন্যায়পথের জ্ঞান, সত্যপথের জ্ঞান, সত্যজ্ঞান)।

স্ট মুসা বলিলেন তাহাকে, আমি কি আপনাকে অনুসরণ করিব যে আপনি আমাকে শিখাইবেন যাহার উপর আপনাকে শিখানো হইয়াছে, সত্যপথের জ্ঞান (রহস্যের জ্ঞান, এলমে লাদুনি)?

৬৭. কালা (তিনি [আবদান] বলিলেন) ইন্নাকা (নিশ্চয়ই আপনি) লান্ (কখনোই না) তাস্তাতিয়া (আপনি করিতে পারিবেন, পারিবে) মাইয়া (আম্মার সঙ্গে, আম্মার সাথে) সাবরান্ (ধৈর্যধারণ, সবর, সহনশীলতা, স্থির থাকা, অভাবে টিকে থাকা, সহিষ্ণুতা, সহ্য বা অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা, ধীরতা, নিষ্কৃতি, প্রশান্তি, ক্ষমাশীলতা)।

স্ট তিনি (আবদান) বলিলেন, নিশ্চয়ই আপনি কখনোই পারিবেন না আম্মার সাথে ধৈর্যধারণ করিতে।

৬৮. ওয়া (এবং) কাইফা (কেমন করিয়া, কেমনে) তাস্বিরু (ধৈর্য ধরিবেন) আলা (উপর) মা (যাহা) লান্ (না) তুহিত্ (আয়ত্ত, অধীন, অধিকৃত, অধিগত, কবলিত, অধিকার) বিহি (ইহা দিয়া, তাহার সঙ্গে, উহার দ্বারা) খুবরান্ (জ্ঞান, বুদ্ধি, খবর, খবরদারি)।

স্ট এবং কেমন করিয়া ধৈর্য ধরিবেন যাহার উপর আয়ত্ত (করেন) নাই জ্ঞান।

৬৯. কালা ([মুসা] বলিলেন) সাতাজ্জিদ (আপনি পাইবেন) নি (আম্মাকে) ইন্ (যদি) শাতা (টাহেন) লাহ (আল্লাহ) সাবিরান্ (ধৈর্যশীল, ধৈর্যধারণকারী,

সবরকারী) ওয়া (এবং) না (না) আসি (আমি অবাধ্যতা করিব, আমি অমান্য করিব) লাকা (আপনার) আমরান্ (আদেশ, নির্দেশ, হুকুম, অনুশাসন, আজ্ঞা, উপদেশ, অনুমতি)।

প্ট (মুসা) বলিলেন, আপনি পাইবেন আম্মাকে যদি আল্লাহ চাহেন ধৈর্যধারণকারীরূপে এবং আমি অমান্য করিব না আপনার আদেশ।

৭০. কালা ([আবদান] বলিলেন) ফাইনিত্ (সূতরাং যদি) তাবাতানি (সে আমার তাঁবেদারি করিয়াছে, সে আমার অনুসরণ করিয়াছে, সে আমার আনুগত্য করিয়াছে) ফালা (সূতরাং না) তাসআলিনি (আম্মাকে জিজ্ঞাসা করো, আম্মাকে সওয়াল করো, আম্মাকে প্রশ্ন করো) আন্ (যে) শাইয়িন্ (কিছুর, বস্তুর, বিষয়ের) হাত্তা (যে পর্যন্ত, যতদূর পর্যন্ত, যখন) উহ্দিসা (আমি বলি, জ্ঞাত করি, আমি বাহির করি, আমি বাহির করিব, আমি শুরু করি, আমি শুরু করিব) লাকা (আপনার) মিন্হ (উহা হইতে, তাহা হইতে) জিক্রান্ (জিকির, স্মরণ, উপদেশ, বয়ান, বিবরণ, বর্ণনা)।

প্ট (আবদান) বলিলেন, সূতরাং যদি আমার অনুসরণ করিতে চান সূতরাং আম্মাকে প্রশ্ন করিবেন না, যে-বিষয়ে যে-পর্যন্ত আমি বলি আপনাকে উহার বিবরণ।

১ ব্যাখ্যা : এই চারটি আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা দিবার আগে কিছু কথা বলে রাখলে পাঠকদের জন্য ভালো হয়। এখানে মুসা নবির সঙ্গে যার সাক্ষাৎ হয়েছিল সেই লোকটির নাম এই সমগ্র সূরাতে একটিবারের তরেও উল্লেখ করা হয় নি, যদিও আমরা তথা গবেষকরা সেই লোকটির নাম দিয়েছি খিজির। অথচ আল্লাহ সেই লোকটাকে আবদান তথা আম্মাদের একজন দাস বলে উল্লেখ করেছেন। আরেকটি কথা পাঠকদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর এই দাস যিনি খিজিররূপে সুপরিচিত সেই খিজির কিছু নবি অথবা রসুল ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন একজন অতি উচ্চ পর্যায়ের আল্লাহর ওলি। একজন জাদুরেল নবি হজরত মুসা (আ.) কী করে এবং কেমন করে আল্লাহর একজন ওলির কাছে রহস্যের জ্ঞান অথবা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করার এমনই আশ্চর্য প্রকাশ করলেন যে বলেই ফেললেন, যুগ-যুগ ধরে যদি আম্মাকে এই রহস্যের জ্ঞান লাভ করার জন্য হাটতে হয় তথা পরিশ্রম করতে হয় তবে আমি ক্লান্ত হবো না! কত বড় বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞা মুসা নবির। তারপরের প্রশ্নটি হলো, নবি মুসা কেন একজন অতি উচ্চ পর্যায়ের ওলির কাছে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে যাবেন? তা হলে কি মুসা নবির মর্যাদাটি প্রশ্নবিদ্ধ হয় না? হয়তো হয়, আবার হয়তো হয় না। কারণ, প্রত্যেক নবিকে এলম্নে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানটি জানবার উপযুক্ত করেই আল্লাহ মানুষকে হেদায়েত করার তরে এই ধরাধাম্নে পাঠিয়ে থাকেন। তারপরেও এমন-এমন কিছু অতি উচ্চ পর্যায়ের এলম্নে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যাহা আবদান তথা আল্লাহর দাস তথা খিজিরের মতো ওলির কাছে জানবার আশ্চর্যটি সত্যিই প্রশংসনীয়। এ জন্যই প্রশংসনীয় যে আল্লাহর জ্ঞান অসীম এবং আল্লাহও অসীম। এই কথাটির ব্যাখ্যা এই একবিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক মোবাইল ফোনের যুগে, ইন্টারনেটের যুগে, এই টেলিফোনের যুগে, এই ফ্যাক্সের যুগে এই কম্পিউটারের যুগে, এই চালকবিহীন রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রিত উড়োজাহাজের যুগে, দেবার প্রয়োজন মনে করছি না। হয়তো শতবর্ষ আগে অথবা মধ্যযুগে অথবা তারও আগে এই জ্ঞান অর্জনের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারত। কারণ, দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবি-রসুলদের মধ্যে আমরা দেখি, চারজন নবি জাদিরেলেরও জাদুরেল। যেমন, হজরত ইবরাহিম (আ.), হজরত মুসা (আ.), হজরত ইসা (আ.) এবং শেষ নবি হজরত মুহম্মদ (সা.)। এই রুকম একজন নবির পক্ষে আল্লাহর একজন ওলির কাছে শিক্ষা গ্রহণের তরে এত উদগ্রীব, এত উৎকর্ষা, এত যুগ-যুগ ধরে সবর

করার তথা ধৈর্যধারণ করার ওয়াদা সত্যিই একটি বিস্ময়কর ঘটনা। আমরা ভালো করেই জানি যে, নবুয়ত খতম তথা শেষ। কিন্তু বেলায়েতের দরজা তো বন্ধ হয় নি, হয় না এবং হবেও না। সুতরাং, আল্লাহর সেই বাক্যটি তথা খিজির একজন ওলি তথা বেলায়েতের অধিকারী। তা হলে আমরা এও দেখতে পাচ্ছি যে, বেলায়েতের অধিকারী একজন জাদুবেল নবি মুসা শিক্ষা গ্রহণ করার তরে এত আগ্রহ প্রকাশ করলেন আর সেই বিশেষ বাক্যটি, যার নাম কোরান-এ একটিবারও বলা হয় নি, সেই খিজির তথা চিরসবুজের কাছে অনেক এলমে গায়েবের রহস্যময় বিষয়গুলো জানবার প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়েই দুই সমুদ্রের মিলনক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। যেহেতু অধম লেখক মুসলমান, কারণ অধম লেখকের বাবাও ছিলেন মুসলমান, সুতরাং জন্মসূত্রে অধম লেখকও একজন মুসলমান। অধম লেখক ধর্ম বিষয়ে সার্বজনীনতার আদর্শে বিশ্বাস করেও সার্বজনীন কথাগুলো লিখতে পারলাম না; লিখতে পারলাম না যে আগেকার দিনের মুনি-খাম্বিয়া – যেমন, জমদগ্নি মুনি, ভৃগু মুনি, বিশ্বমিত্র মুনি, কপিল মুনি, বাতাবি মুনি, দধিচি মুনি, কাশ্যপ মুনি, অগস্ত্য মুনি, পিণাক মুনি – এরাও আল্লাহর বিশেষ বাক্যরূপে পরিচিত ছিলেন। অধম লেখকের কাঁধের উপর হিমালয় পর্বতের চেয়েও দৃঢ় এবং শক্ত তকদিরের সাইনবোর্ডটি কম-বেশি বুলছে – সুতরাং এই ধর্মীয় সাইনবোর্ডের অজুহাতে অধম লেখকের পক্ষে এইসব মুনি-খাম্বিদের কথাগুলো বিশদভাবে বর্ণনা দেওয়া তো দূরের কথা নামগুলোও উল্লেখ করতে ভূমিকাটি দিতে হলো। হিন্দুদের মহাদেব একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন এই বলে যে, যে-ধর্মে রহস্যের জ্ঞান তথা এলমে গায়েবের পরিচয়টি থাকে না উহা তো ধর্মই নহে। এই জাতীয় বহু মুনি-খাম্বির বহু অমূল্য কথা, অধম লেখকের জানা থাকা সত্ত্বেও ধর্মীয় সাইনবোর্ডটি কাঁধের উপর অবস্থান করার দরুন লিখতে পারলাম না। তাই পৃথিবীর পাঠকদের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। কারণ জন্মটাই আমার আজন্ম একটি এমন শক্ত, এমন দৃঢ় তকদির যেখানে হিমালয় পর্বতটিকেও তুলার মতো হালকা মনে হবে। সব ধর্মের সর্বগুরুকেই সার্বজনীনতার মহান সাইনবোর্ডটি সামনে রেখে গভীর বলয়ের কথা, সংকীর্ণ অবগুণ্ঠনের বাণী প্রচার করতে দেখি। এবং এই প্রচারের জন্য আমি অধম লেখক কাহাকেও গালমন্দ অথবা কটুকথা বলতে চাই না। কারণ, আমিও কমবেশি ওই একই রোগে ভুগছি।

যদি কোরানুল হাকিম এই বিশেষ বাক্যটির নাম উল্লেখ করে দিত অথবা খিজির নামটি থাকত তা হলে অনেকেই এই বিশেষ জ্ঞানটি যাহা আল্লাহ কর্তৃক বিশেষ রহস্যরূপে দান করা হয়ে থাকে উহা খিজির নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ত। তাই কোরানুল মবিন এই সীমাবদ্ধতার দেয়াল ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। কারণ, বেলায়েত অসীম তথা সীমাবদ্ধতার দেয়ালটি দাঁড় করানো যায় না। পক্ষান্তরে, নবিদের বেলায় মহানবি (সা.)-এর মাঝেই নবুয়তের বাণীটি খতম করে দেওয়া হয়েছে তথা শেষ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে যে, সিংহ জানে বাঘের শরীরে কতটুকু শক্তি আছে, ইহা খরগোশের পক্ষে বোঝা সম্ভবপর নয়। আমি আশা করি জ্ঞানী লোকেরা আমার এই কথাগুলো বুঝতে পারবেন। আর যারা অজ্ঞানী তারা তো অনেকটা গরু-মহিষের মতো। গরু-মহিষের নাকের উপর সুগন্ধযুক্ত ফুলটি ধরতে গেলে গন্ধ নেওয়া তো দূরের কথা, বরং লম্বা জিভ বের করে খেয়ে ফেলবে। সুতরাং, গরু-মহিষের নাকের উপর সুগন্ধযুক্ত ফুলটি ধরাও বোকামি কি না আমার জানা নাই। আমরা যদি প্রথমেই নফস আর রুহের বিরাট পার্থক্যটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারতাম এবং প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মনগড়া কথাগুলোর দ্বারা নফস আর রুহকে একত্র করে লাভভা পাকিয়ে না ফেলতাম তা হলে এতগুলো কথা বলতে হতো না। কারণ, একটি বিরাট ভুল অনেক ভুলের জন্ম দেয় এবং সেই ভুলের সাগরে সহজ-সরল কাঁচা-গলা মোমের মতো মানুষগুলো

অন্তর দিয়ে সত্য খুঁজেও সত্য পায় না, পায় কেবল কতগুলো আনুষ্ঠানিক উপাসনার আফালন। আর এই উন্মাদ ও আফালনের কারেন্টজালে আটকা পড়ে জীবনটির অবসান হয়।

ছেষটি নম্বর আয়াতে মুসা নবি আবদানকে বললেন যে, সত্যপথের তথা ন্যায়পথের যে-জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে সেই জ্ঞানের উপর আমি কি আপনার তাঁবেদারি করে শিক্ষার অনুমতিটি পেতে পারি? এই আয়াতে সত্যপথের জ্ঞান তথা ন্যায়পথের জ্ঞান বলতে কী বোঝানো হয়েছে? তা হলে এলম্মে লাদুনি তথা গুপ্তজ্ঞান তথা রহস্যের জ্ঞানকেই কি সত্যপথের জ্ঞান বলা হয় নি? সত্যপথের জ্ঞান অর্জন করার প্রশ্নে মুসার মতো জাদুরেল নবির শিক্ষালাভের জন্য এ-রকম ব্যাকুলতা সত্যিই আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে। ভাবিয়ে তোলে অনেক রকম প্রশ্ন আর উত্তর পাবার কথাগুলো। তা হলে মুসা নবি এত মোজেজার অধিকারী হয়েও, হাতের তালুতে নুরের চমক, যর্দি সর্পে পরিণত হওয়া ইত্যাদি মোজেজাগুলোর অধিকারী হয়েও আবদানের কাছে এমন কী রহস্যপূর্ণ গুপ্তজ্ঞান থাকতে পারে যার জন্য মুসা নবিকে বলতে হয়েছে, সত্যপথের জ্ঞান যাহা আপনাকে দান করা হয়েছে সেই জ্ঞানটি কি আমাকে শিক্ষা দিবেন? তা হলে মুসা (আ.)-এর মতো জাদুরেল নবির লাঠির আঘাতে নীলনদ যেখানে পথ করে দেয়, তুর পর্বতে নুরের জালুয়া দেখে যেখানে মুসা (আ.) বলেছিলেন, আমি তো আদিতেই মোমিন ছিলাম, এত বড়-বড় মোজেজার অধিকারী হয়েও কেন বেলায়েতের অধিকারী একজন আবদান নামক আল্লাহর ওলির কাছে সত্যপথের জ্ঞান পাবার বাসনায় এত ব্যাকুলতার প্রকাশটি দেখতে পাই? মানুষের ক্ষুদ্র মন ছোট-বড় করতে খুব ভালোবাসে সত্যগ্রহণ করার পরিবর্তে। কিন্তু আল্লাহ যে অসীম এবং তাঁর জ্ঞানও যে অসীম তাঁর নমুনা বা দৃষ্টান্তটি এই একবিংশ শতাব্দীতেও জ্ঞানীরা সামান্য কিছু হলেও বুঝতে পারে। কারণ, বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছিলেন যে, ব্যাকহোলের এক চীমচ মাটি পৃথিবী গ্রহের পালা দিয়ে মাপতে গেলে কয়েক হাজার টন হবে এবং এই ব্যাকহোলে তথা কালো গহ্বরে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগুলো ঢুকিয়ে দিলেও কালো গহ্বরটি ওই রকমই থাকবে এবং আরও অনেক নতুন-নতুন গবেষণার তথ্যগুলো বলেছেন যা এই মুহূর্তে অধম লেখকের মনে পড়ছে না।

তারপর সাতষটি ও আটষটি নম্বর আয়াতে আবদান যে-কথাগুলো এবং যে-উপদেশগুলো নবি মুসার মতো জাদুরেল নবিকে দিচ্ছেন উহা সত্যিই আমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তোলে এবং আল্লাহর বিশাল জ্ঞানরাজ্যের জ্ঞানভাণ্ডারের কথাটি শুনে ধাক্কা খেতে হয় এবং অনেক রকম প্রশ্নের জালে আটকিয়ে যেতে হয়। যেহেতু কোরান-এর কোথাও খিজিরের নামটি উল্লেখ করা হয় নি সেই হেতু খিজিরের নামটি উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি নাই। তাই খিজিরের পরিবর্তে আবদান লিখতে বাধ্য হলাম। আবদান শব্দটির মাধ্যমে বেলায়েতের ধারাটি যে চিরকাল চলতে থাকবে এবং কোনো সীমাবদ্ধতার রেখাটি টানা যাবে না এবং যায় না উহাই কোরান আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে। খিজিরের নামটি উল্লেখ করা হলে এই রকম রহস্যপূর্ণ জ্ঞানের বিষয়টি কোনো ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, কিন্তু বেলায়েত সার্বজনীন। বেলায়েত খতম তথা শেষ হবার কথাটি বলা হয় নাই, কিন্তু নবুয়ত মহানবি (সা.)-এর মাঝে এসে শেষ হয়ে গেছে। মহানবি (সা.) এ-জন্যই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবি যে মহানবি (সা.) রেসালাত, নবুয়ত, বেলায়েত এবং আবদিয়াত - এই চারটি বিষয়ের একত্রিত গুণে গুণাব্বিত। তাই মহানবির সর্ববিষয়ে বিচরণ করার কথাগুলো আমরা জানতে পারি। এই আবদান কি বেলায়েতের অধিকারী, নাকি আবদিয়াতের অধিকারী, নাকি বেলায়েত এবং আবদিয়াত উভয়টি একই গুণে গুণাব্বিত উহা অধম লেখকের জানা নাই। এই

আবদান সাতষটি এবং আটষটি নব্বুর আয়াতে মুসা নবির মতো জাঁদরেল নবিকে বলছেন যে, 'নিশ্চয়ই আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।' তথা 'কালো ইননাকা লান্ তাসুতায়িআ মাইয়া সাবরান্'। তারপরেই আবদান বলছেন যে, এ-জন্যই আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না যে সেই বিষয়ের উপর আপনার কোনো জ্ঞান নাই। তা হলে ছোট্ট এই কথাগুলোর মাঝে জ্ঞান এবং ধৈর্যধারণের কথাটি আমাদেরকে ভাবিয়ে তোলে এবং আরও অনেক বিষয়ের কথাগুলো ভাবিয়ে তোলে বটে, কিন্তু উহার ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করাটি জ্ঞানা থাকা সত্ত্বেও বলতে ও লিখতে পারলাম না এবং লেখাটা সমীচীন মনে করলাম না।

উনসত্তর এবং সত্তর নব্বুর আয়াতে নবি মুসা (আ.) আবদানকে এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ধৈর্যধারণকারী হিসেবেই পাবেন। তারপর নবি মুসা (আ.) বললেন, আপনার কোনো নির্দেশের কখনোই অবাধ্য হবো না। কিন্তু অতীত দুঃখের বিষয় হলো, নবি মুসা আবদানের তিন-তিনটি কাজ কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। আর মেনে নিতে না পারলেই ধৈর্যচ্যুতি হওয়াটা একান্ত স্বাভাবিক। কারণ, মুসা নবির জ্ঞানের বলয় যাহা আল্লাহ কর্তৃক দান করা হয়েছে উহা হতে অনেক অনেক উচ্চ স্তরের জ্ঞান হলো আবদানের জ্ঞান যাহা মুসা নবীর ধারণা ও কল্পনার বাহিরে। সুতরাং, এই জাতীয় অভূত জ্ঞানের তিন-তিনটি প্রদর্শনে কেমন করেই-বা ধৈর্যধারণ করা যায় এবং কেমন করেই-বা নির্দেশগুলোর প্রতি বাধ্য হওয়া যায় তথা মেনে নেওয়া যায়? যদিও আবদান বলেছিলেন, আপনি যদি আমার আনুগত্য গ্রহণ করে থাকেন তা হলে আপনি আমার কর্মের বিষয়ে কোনো প্রকার প্রশ্ন করতে পারবেন না, তবে এই শর্ত রইল যে, পরিশেষে আমার কর্মগুলোর ব্যাখ্যা আপনাকে বলে দেওয়া হবে। কিন্তু আবদানের তিনটি কর্ম জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির মানদণ্ডে বিচার করে মুসা নবি কোনো পার-কুল না পেয়ে অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করতে বাধ্য হলেন। এই প্রশ্ন করাটা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই ধরে নিতে চাই। যাহা জ্ঞানা নাই উহা জেনে নিতে ধৈর্যধারণ করা যায়, কিন্তু এমন কিছু ঘটনা যাহা দুনিয়ার মানদণ্ডে সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে হয় কেমন করেই বা তাতে ধৈর্যধারণ করা যায় আর কেমন করেই বা নির্দেশগুলো মেনে নেওয়া যায়? মহানবি (সা.)-এর জাঁদরেল সাহাবা হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন যে, 'আমি মহানবি (স.) হতে দুই উসআক্ তথা ভাঙ্ত তথা দুই প্রকার জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি। যে-ভাঙ্তের জ্ঞান প্রকাশের যোগ্য উহার একটিও আমি লুকিয়ে রাখি নি এবং যে-ভাঙ্তের জ্ঞানটি গোপনীয় উহার একটি জ্ঞানও দিয়ে যাই নি। যদি গোপন ভাঙ্তের একটিমাত্র জ্ঞানও প্রকাশ করতাম তা হলে আমার গলা কাটা যেত।' [হাদিসটি হবহ বর্ণিত নয়]। এই রকম গোপন জ্ঞানের বিষয়ে কেবলমাত্র হজরত আবু হুরায়রাই নন, বরং হজরত ইবনে আব্বাস (রা.), হজরত আবু জরু গিফারি (রা.), হজরত হজায়ফা (রা.) এবং আরও অনেক সাহাবার জ্ঞানা ছিল, কিন্তু তারা কেউই এই গুপ্তজ্ঞানের কথা প্রকাশ্যে বলে যান নি।

আবদানের তিনটি ঘটনার মাধ্যমে যে-আজব কর্মকাণ্ডের প্রকাশ পায় এবং আত্মবিরোধ বলে মনে হয় উহার উপর ধৈর্যধারণ করা এবং নির্দেশ মান্য করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। এই আবদান তো খতম হয়ে যায় নি তথা শেষ হয়ে যায় নাই এবং শেষ হবার কথাটি কোরান-হাদিস-এর কোথাও নাই, কিন্তু নবুয়ত তো শেষ হয়ে গেছে তথা মহানবি (সা.)-এর পর আর কোনো নবি আসবেন না। সুতরাং, আবদানেরা যুগে-যুগেই সব দেশেই কিছু না কিছু থাকবেই এবং এই আবদানদের কাজগুলোকে অনেক সময় অনেক জ্ঞানী লোকের কাছেই অভূত এবং বৈসাদৃশ্যময় বলে মনে হয়। সুতরাং, চরম সত্যে যে কোনো গালিই

থাকে না এই কথাগুলো হতে ইহাই বোঝা যায়, যদিও আমরা বিশেষ করে মুসলমানরা ব্যাখ্যা এবং দর্শনের মতভেদে তিন কুড়ি তের টুকরো হয়ে গেছি, যদিও আমাদের কোরান এক, কাবা এক।

৭১. ফানতালাকা (সূতরাং দুইজনে চলিতে লাগিলেন) হাততাতা (যতক্ষণ পর্যন্ত, যে পর্যন্ত, যখন) ইজী (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) রাকিবাতা (তাহারা দুইজন আরোহণ করিলেন, তাহারা দুইজন চড়িলেন) ফি (মধ্যে) সাফিনাত্তি (একটি নৌকায়) খারাকাতাহা (তাহা তিনি ছিদ্র করিয়াছেন, বিদীর্ণ করিয়াছেন, কাটিয়াছেন, ছিড়িয়াছেন)।

সূতরাং তাহারা উভয়ে চলিতে লাগিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত একটি নৌকার মধ্যে তাহারা দুইজন আরোহণ করিলেন, তিনি (আবদান) উহা (নৌকা) ছিদ্র করিলেন।

+ কালা ([মুসা] বলিলেন) আখারাকাতাহা (আপনি কি উহাকে ছিদ্র করিয়াছেন) লিতুগুরিকা (ডুবাঁবার জন্য) আহলাহা (উহার আরোহীদেরকে)

সূত (মুসা) বলিলেন, আপনি কি উহার আরোহীদেরকে ডুবাঁবার জন্য উহাকে ছিদ্র করিলেন?

+ লাকাদ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই) জিতা (আপনি আনিয়াছেন) শাইয়ান (কিছু, বস্তু, বিষয়) ইমুরান (অদ্ভুত, অগ্রহণযোগ্য, আজব, আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর, অসাধারণ, আকস্মিক, প্রকৃত)।

সূত অবশ্যই আপনি আনিয়াছেন আজব বিষয়।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে আবদানের শর্তসমূহে নবি মুসা (আ.) রাজি হলেন এবং তাঁর সহচর হলেন। তারপর তারা উভয়ে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর একটি নৌকায় উঠলেন এবং একটি জলপথ পার হয়ে যাঁবার পর সেই নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন তথা সামান্য অংশ ফুটো করে দিয়ে ডুবিয়ে দিলেন। এই নতুন নৌকাটির একটি অংশ ফুটো করে দেবার দৃশ্যটি দেখে মুসা নবি (আ.) অবাক বিস্ময়ে বলেই ফেললেন, উপকারীর প্রতি এ-রকম আচরণ করাদা কি বড় অন্যায় নয়? নবি মুসা (আ.) আরও বললেন যে, আপনি কি এই নৌকার যাত্রীদেরকে ডুবিয়ে মারার তরে এ-রকম অদ্ভুত কাজ করলেন না?

অভিজ্ঞতার আলোকে অধম লেখকের জানা একটি ঘটনা : ট্রেনে চড়ে বহুদূরে যাবার অভিপ্রায়ে ট্রেন ছেড়ে দেবার মাত্র দুই-তিন মিনিট পর স্টেশনে পরিবার-পরিজন নিয়ে হাজির হবার পর জানতে পারলেন যে, এইমাত্র ট্রেনটি ছেড়ে চলে গেছে। প্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে কিছুক্ষণ দুঃখ করার পর বাসায় ফিরে গেলেন। তার পরের দিন খবরের কাগজে যখন জানতে পারলেন যে, ওই ট্রেনটি ভয়ঙ্কর অ্যাকসিডেন্ট করে বেশ কিছু লোক মারা গেছে এবং আহতের সংখ্যাও অনেক, এই খবরটি পড়ার পর সেই লোকটি আল্লাহর দরবারে হাজার শুকুর করে বলে ফেললেন, আয় আল্লাহ, তুমি তো ট্রেন ফেল করাও নি, বরং বিশেষ রহমতে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছ। এই ট্রেনটি যে ভয়ঙ্কর অ্যাকসিডেন্ট করবে এবং বেশ কিছু যাত্রী নিহত ও আহত হবে, এই ঘটনাটি আবদানের মতো অতি উচ্চ স্তরের ঔলিরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন। এই বোঝাটা নবি-রসুলদের পক্ষেও সম্ভব এবং আবদানের পক্ষে আরও বেশি সহজ। এই আয়াতের বিষয়বস্তুটি অধম লেখকের কাছে এ-রকম বলেই মনে হয়। কারণ, এলম্বে গায়েব জানাটিও নবি-রসুলদের জন্য একটি শর্ত। আর আবদান এই নৌকাটি ফুটো করে কেন ডুবিয়ে দিলেন তা ইচ্ছা করেই আল্লাহ মুসা নবিকে জানতে দেন নি। আমাদেরকে রহস্যলোকের রহস্যময় লীলাখেলাটি বুঝিয়ে দেবার জন্য নবি মুসা এবং আবদানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূতরাং, আমরা নবি-রসুল এবং আবদানের মতো অতি উচ্চ স্তরের ঔলিদের বিষয়ে ছোট-বড় করতে চাই না। কারণ, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রশ্নটি জেগে ওঠে যে কে বড় আর কে ছোট। বাস্তবতার নিরিখে আমাদের খবরের

কাগজে এই বিষয়টিও প্রচার হয়েছে যে, কে গাউসুল আজম, আর কে গাউসুল আজম নয়।

প্রিয় পাঠক, নফসের তথা প্রাণের বহুবচন হয় তথা নফসের বহুবচন হলো 'আনফস', কিন্তু রুহ তথা আল্লাহর আদেশ, যাহা মোটেই প্রাণ নহে, যাহা পরমাত্মা এবং এক কথায় উল্লেখ করে বলতে গেলে স্বয়ং আল্লাহ, সেই রুহ শব্দটির বহুবচন নাই। নফস মানুষ এবং জিনের যে-রকম আছে সেই রকম প্রতিটি প্রাণীরই নফস আছে। সুতরাং, নফসের বহুবচন 'নফস' অথবা 'আনফস' হতে বাধ্য, কিন্তু রুহ একমাত্র মানুষ এবং জিনকে দেওয়া হয়েছে, তাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আরও অবাক হবার কথা এই যে, ফেরেশতারা আল্লাহর গুণবাচক নুরে তৈরি তথা সেফাতি নুরে তৈরি এবং ফেরেশতাদের নফসও নাই, রুহও নাই। মানুষ এবং জিনের নফসের উপর আল্লাহ রুহ ফুৎকার করে দিয়েছেন, কিন্তু কোরানি-এর একটি স্থানেও বলা হয় নি যে পশুকুলের কাহাকেও রুহ ফুৎকার করা হয়েছে।

৭২. কালা ([আবদান] বলিলেন) আলাম আকুল (আমি কি বলি নাই) ইনুনা কা (নিশ্চয়ই আপনি) লান (কখনোই না) তাসতাতিয়া (পারিবেন) মাইইয়া (আমার সঙ্গে, আমার সহিত) সাবরান (সবর, ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থির থাকা, অভাবে টিকে থাকা)।

প্ট (আবদান) বলিলেন, আমি কি বলি নাই, নিশ্চয়ই আপনি কখনোই পারিবেন না আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করিতে।

৭৩. কালা ([মুসা] বলিলেন) লা (না) তুআখিজ্জ (আপনি ধরেন, আপনি পাকড়াও করেন) নি (আমাকে) বিম্মা (যাহা, ওই বস্তু হইতে) নাসিতু (আমি ভুলিয়া গেলাম, আমি গাফেল হইলাম) ওয়া (এবং) লা (না) তুরহিক্‌নি (আমার উপর প্রয়োগ করিবেন, আমার উপর আরোপ করিবেন, আমার উপর অবলম্বন করিবেন) মিন্‌আম্মরি (আমার কাজের জন্য, আমার কাজে, আমার কর্ম হইতে) উসরান (কাঠিন্য, দুঃসাধ্যতা, আয়াসসাধ্যতা, বাধা, প্রতিবন্ধক, কঠোরতা)।

প্ট (মুসা) বলিলেন, ধরিবেন না আমাকে যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি এবং আমার উপর প্রয়োগ করিবেন না আমার কর্ম হইতে প্রতিবন্ধকতা।

১ ব্যাখ্যা : এই দুটি আয়াতের প্রথমটিতে মুসা নবিকে আবদান বললেন যে, আপনি আমার সঙ্গে আমার চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। যে-কোনো বিষয়ে ধৈর্যধারণের একটি সীমারেখা থাকে। কোনো কাজের উপর যখন শৃঙ্খলার প্রশ্নটি ভীষণভাবে উঠে আসে তখনই ধৈর্যের বাধ ভেঙে যায় এবং তখনই প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়। আমরা অন্য স্থানে দেখতে পাই যে নম্বরুদ যখন নবি ইব্রাহিমকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর ফেলে দিল তখন তিনি ফেরেশতার পরামর্শটিও গ্রহণ না করে আল্লাহর উপর সম্পূর্ণরূপে ধৈর্যধারণ করে নির্ভর করে রইলেন। নবি ইব্রাহিমের এই চরম মুহূর্তে নির্ভরতাটি একটি অবিস্মরণীয় বিস্ময়কর ধৈর্যধারণ করার দৃষ্টান্ত। কারণ, লেলিহান অগ্নিশিখার কুণ্ডে নিষ্কেপ করার সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবার সম্ভাবনাটি একান্ত স্বাভাবিক। এত বড় জীবন বিপন্নতার মুখে ভয়ঙ্কর আগুনের চিরন্তন তকদিরটিকে কিছুক্ষণের তরে জ্বালিয়ে দেবার পরিবর্তে শান্তির রূপ ধারণ করতে আগুনকে আল্লাহ আদেশ দিলেন এই বলে যে, হে অগ্নি, তুই ইব্রাহিমের উপর শান্তির রূপ ধারণ কর। এই জাতীয় ধৈর্যধারণটি যদিও এক বিষয় আর আবদানের কর্মকাণ্ডে চূপ করে থাকার ধৈর্যধারণটি আরেক বিষয়। জানি না ইহা কি আল্লাহরই রহস্যময় ঘটনা ঘটিয়ে যাবার লীলাখেলা কি না। জানি না, কাজির ফতোয়া আর বিখ্যাত এক ওলির 'আনাল হক' বলাটি কি আল্লাহরই লীলাখেলা? দেহভস্ম হতে 'আনাল হক' উচ্চারিত হওয়া আবার সেই ভস্ম নদীর উর্মিতে নিষ্কেপ করার পরও প্রতিটি উর্মির 'আনাল হক' শব্দ

শোনার মাঝে মহান আল্লাহরই লীলাখেলা আছে কি না অধম লিখকের জানা নাই।

অবশেষে, এই দুটো আয়াতের আর কোনো ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন অনুভব করছি না তবে লেখার জন্য আমাকে লিখতে হয় যে, নৌকা ফুটো করে দিয়ে ডুবিয়ে দেবার দৃশ্যটি দেখে মুসা নবির ধৈর্যের বাধ ভেঙে যায় এবং ধৈর্যধারণের কথাটি আবদান পুনরায় শুনিয়ে দেন। নবি মুসা (আ.) 'ভুলে গিয়েছি' বলে জানিয়ে দিলেন এবং বললেন যে, এই ভুলের অজুহাতে আমাকে ধরবেন না এবং আমার এই কর্মের জন্য শক্ত অবস্থানটি গ্রহণ করে আমাকে বিপদের মুখোমুখি করবেন না। আমার এই ভুলের জন্য আমি লজ্জিত।

হায় রে মানুষের মন আর হায় রে মানুষের মনের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসের টিকন-টিকন-মল্লণা! যাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়তে চায় না সে-রকম কুমল্লণায় মানুষের মন আবদান আর নবি মুসার মধ্যে ছোট-বড় করে কী সুন্দর আনন্দ পায়! এ যেন সুস্বাদু খাদ্য খেয়ে পেট ভরে যাবার পর খোকাকোলার বোতলে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলার মতো।

৭৪. ফানতালাকা (সূতরাং দুইজনে চলিল) হাত্তা (যতক্ষণ পর্যন্ত, যে পর্যন্ত, যখন, এমনকি) ইজা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) লাকিইয়া (তাহারা দুইজন একে-অন্যের সামনে আসিয়াছে, সামনাসামনি হইয়াছে, সম্মুখীন হওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হওয়া, মিলিত হইল, মুখোমুখি হইল, সাক্ষাৎ পাইল) গুলামান (বাচ্চা, যুবক, বালক, ক্রীতদাস, চাকর, কেনা গোলাম, হতভাগা লোক, ভৃত্য, কর্মচারী, সেবক, খেদমতকারী, অধীন, অনুগত ব্যক্তি, পরিচারক) ফাকাতালাহ (সূতরাং তাহাকে হত্যা করিল, সূতরাং তাহাকে কতল করিল, সূতরাং তাহাকে মারিয়া ফেলিল)।

সুতরাং দুইজনে (পথ) চলিলেন সেই পর্যন্ত যখন দুইজন সাক্ষাৎ পাইলেন একটি বালকের, সূতরাং, তাহাকে কতল করিলেন।

+ কালা (মুসা বলিলেন) আকাতালতা (আপনি কি হত্যা করিলেন, আপনি কি কতল করিলেন, আপনি কি মারিয়া ফেলিলেন) নাক্সান (একটি নফসকে রুহ বলা হয় নি) জাকিই ইয়াতান (পবিত্র, পাপ হতে پاک-সাক, নিশাপ) বিগাইরি (ব্যতীত, ছাড়া, কিন্তু, নহে, না) নাক্সিন (নফস, প্রাণ, জীবন রুহ বলা হয় নি)।

সুতরাং (মুসা) বলিলেন, আপনি কি কতল করিলেন একটি নফসকে [রুহ বলা হয় নি] (যাহা) নিশাপ, একটি নফস [রুহ বলা হয় নি] হত্যা করিবার অপরাধের বিনিময় ছাড়াই?

+ লাকাদ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে) জিতা (আপনি আসিয়াছেন, আপনি আনিয়াছেন) শাইয়ান (কিছুর, বস্তুর) নুকরান (অবাক্তিত, খুব কঠিন, জঘন্য, অন্যায়, অমার্জিত, অপবিত্র)।

সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি আনিয়াছেন অন্যায় কিছু।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে মুসা নবি এবং আবদান দুজনেই পুনরায় পথ চলতে লাগলেন। এমনকি এক সময় একটি বালকের সাক্ষাৎ পেলেন। কথিত আছে যে, বালকটি সেই সময় খেলছিল। আবদান সেই বালকটিকে ধরে ফেললেন। কথিত আছে, সেই বালকটি যাকে ধরে ফেলা হয়েছে সে ছিল খুবই সুন্দর, উজ্জ্বল বর্ণের এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। কেহ বলেন যে আবদান বালকটির মাথাটি কেটে ফেলেছেন। কেহ বলেছেন, বালকটির মাথা পাথরের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছেন। আবার কেহ বলেছেন যে, তিনি তার নিজের হাত দিয়ে মূটভিয়ে বালকটিকে হত্যা করেছেন। এই দৃশ্য দেখে নবি মুসা (আ.) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ধৈর্যের বাধ ভেঙে পুনরায় কঠোরভাবে এই ইত্যাকারের প্রতিবাদ করলেন এবং বললেন যে, এই বালকটি এমন কোনো পাপকর্ম করে নাই এবং কাহাকেও হত্যাও করে নাই যে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ [রুহ] বলা হয়

নাই। নিতে হবে। তাই আমি (মুসা) স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে আপনি একটি জঘন্য অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন।

আরেকটু এগিয়ে সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গেলে এই কথাটুকু বলতেই হয় যে, যে-কোনো ধর্মের যে-কোনো শরিয়তে এ-রকম হত্যাকাণ্ডের অনুমোদন পাবার প্রশ্ন তো দূরে থাক, বরং শাস্তির বিধান রাখা হয়। তা ছাড়া দুনিয়ার যে-কোনো আইনে এই রকম একটি বালককে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। যদিও আধুনিক ইউরোপে মৃত্যুদণ্ডের বিধানটি রহিত করা হয়েছে এবং তার বদলে সারাটি জীবন জেল-খাটার বিধান রাখা হয়েছে এবং এই যাবজ্জীবন জেল-খাটাটি সারা জীবনের জেল-খাটা, তথা জেলে মৃত্যুবরণ করার পর লাশটা জেল হতে বাহির করে দেওয়া হয়। ইহাও কম বড় শাস্তি নহে। কারণ, ধুকে-ধুকে তিলে-তিলে জেল খেটে-খেটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পর জেল হতে লাশ বাহির করাটিও কম বড় শাস্তি নহে। একবারে ফাসিতে অথবা তরবারির আঘাতে অথবা গুলিতে মেরে ফেলার চাইতে ইহাও একটি

শাস্তি। সুতরাং, এই রকম একটি বালককে আবদান হত্যা করার পর নবি মুসা (আ.) এত অবাক হয়েছিলেন যে, ধৈর্যধারণের তিনটি শতের দ্বিতীয় শতটিও ভঙ্গ করতে বাধ্য হলেন। আবদানের এই জাতীয় ঘটনাগুলো যতই রহস্যপূর্ণ হোক না কেন, সামাজিক জীবনের প্রশ্নে প্রতিবাদ করাটি অবধারিত। এই আধুনিক যুগে পৃথিবীতে বাস করা আনুমানিক ছয় শত কোটি মানুষ এই রকম একটি বালককে হত্যা করার তীব্র প্রতিবাদ জানাবে এবং দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ড চাইবে।

আধ্যাাত্মিক দর্শনে, এই বালকটির বড় ডাকাত আর খুনি হবার নিশ্চিত বিষয়টি জানা থাকার পরও পৃথিবীর মানুষেরা যেমন মেনে নেবে না এবং প্রচণ্ড প্রতিবাদ করবে তেমনি মুসা নবিও স্বাভাবিকভাবে প্রতিবাদটি জানাতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, কোনো রকম দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনেই এ-রকম হত্যাকাণ্ডটি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। অথচ এই সুপ্রী, উত্তম ব্যবহারের অধিকারী বালকটি যুবক হয়ে একদিন জঘন্য ডাকাত এবং খুনিতে পরিণত হবে – এই বিষয়টি আবদানের জানা থাকার কথা এবং আবদান আরও দেখতে পেলেন যে এই বালকটি যুবক হয়ে যে ভয়ঙ্কর ডাকাত ও খুনিতে পরিণত হবে তাতে সমাজের বহু নিরীহ সরল-সহজ মানুষেরা খুনের শিকার হবে এবং নিজেদের গচ্ছিত মালামাল হতে বঞ্চিত হবে। আবদানের কথাগুলো একদম ধ্রুব সত্য এবং এলম্নে গায়েব জানার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হয়তো একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে আবদান এত বড় সাম্প্রতিক এলম্নে গায়েব জানার অধিকারী যদি হয়ে থাকেন তা হলে জগতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবি সরকারে দো-আলম্ন ইমাম্মে কেবলাতাইনে সরদারে হাশিমি রহমাতুল্লিল আলাম্নিন সাইয়েদুল কাওনাইন শফিউল মুজনাবিন ইমাম্মুল মুরসালিন হাবিবুল্লাহ আবুল কাশেম মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি এলম্নে গায়েব জানতেন না? যদি কেউ বলে, অবশ্যই জানতেন, তা হলে উহা তার তকদির। যদি কেহ বলে, জানতেন না, উহাও তার তকদির। এই তকদির হিমালয় পর্বতের চেয়েও দৃঢ়, কঠিন এবং শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষ গৃহত্যাগ করতে পারে, গ্রামত্যাগ করতে পারে, এমনকি দেশও ত্যাগ করতে পারে – কিন্তু জন্মসূত্রে পাওয়া ধর্মটি পরিত্যাগ করতে পারে না। কার্ল মার্কস আল্লাহই মানত না, কিন্তু মৃত্যুর পর তাকে খ্রিস্টান ধর্মের বিধানে সমাহিত করা হয়েছে এবং কার্ল মার্কসের মূর্তিটি তার কবরের উপরেই খোদিত করে রাখা হয়েছে। কমরেড মণি সিং নাস্তিক ছিল, কিন্তু হিন্দু ধর্মের অনুশাসনে চিতায় দাহ করা হয়েছে। কমরেড ফরহাদকে ইসলাম ধর্মের অনুশাসন মেনে বনানী

কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে। সুতরাং, ধর্মের বৃত্ত হতে বেরিয়ে আসাটা মোটেও একটা হালকা বিষয় নয়।

সুতরাং, বিজ্ঞানের উপর যে অজানা বিজ্ঞান আছে এবং ধীরে-ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে, যেমন আল্লাহর এই জাতীয় অদ্ভুত রহস্যে ঘেরা ঘটনাগুলি কোনো সমাজই গ্রহণ করে নিতে পারে না এবং নেবার কথাও নয়। সুতরাং, ব্যাখ্যার জন্য অধম লিখক ব্যাখ্যাটি আরও বড় করতে পারতাম, আরও অনেক কিছু বলতে পারতাম, কিন্তু না বলে সোজা পাঠকদেরকে বলে দিলাম যে ইহার মর্মার্থটি অধম লিখকের জ্ঞান নাই এবং যদি জ্ঞান থাকেও, উহা লিখার দরকার মনে করলাম না। কারণ, এই জাতীয় হত্যাকাণ্ডটি, যেমন 'এনকাউন্টার' অথবা 'কনসফার' নামক হত্যার মাঝেও কোনো বিশেষ কারণ থাকতে পারে, কিন্তু একটি নিশ্চাপ বালককে হত্যা করে ফেলাকে পৃথিবীর কোনো মানবতাবাদী তো দূরে থাক, কেহই বৈধ হত্যা বলে মেনে নিবে না। সুতরাং, আবদানের এই জাতীয় হত্যায় নবি মুসা (আ.) কেমন করে ধৈর্যধারণ করতে পারেন? আবার পরক্ষণে আবদানের কথাগুলো ফেলে দেওয়া যায় না। কারণ, এই বালকটি যুবক হয়ে ভয়ঙ্কর একজন ডাকাতে পরিণত হবে এবং খুন, ধর্ষণ, সম্পদ লুণ্ঠন – যত রকম জঘন্য অপকর্ম আছে উহা এই বালকটি যুবক হয়ে করবে। তাই আগেই এই বালকটিকে হত্যা করে ফেললাম। এ-রকম সর্বোচ্চ এলম্নে গায়েব তুরীয় অদৃশ্য শক্তির অধিকারী আবদানের মতো কয়জনের থাকতে পারে?

এখন, জ্ঞান কী? জ্ঞান কত প্রকার? জ্ঞানের কি প্রকারভেদ আছে? জ্ঞান কি হাঁড়ি-পাতিল, মাছ-মাংস-ডিম্ম কিনে ভুরিভোজ করার জ্ঞান? জ্ঞান কি ব্যাংকের জটিল হিসাব-নিকাশ আয়ত্ত করা? জ্ঞান কি মাছ চাষের কলাকৌশল, ব্রয়লার আর

লেয়ার মুরগির ডিম্ম-মাংস খাবার বিষয়? এভাবে বয়ান দিতে গেলে অনেক বিষয়ই তো তুলে ধরা যায় যে এগুলো কি জ্ঞানের আওতায় আসে নাকি আসে না? মতভেদ থাকতে পারে, তবু মতবিরোধও দেখা দিতে পারে এবং এই অনেক রকম মতবিরোধগুলো আছে বলেই আল্লাহর বহু রূপের বহু শৈলী ফুটে ওঠে। আবার, প্রশ্ন আসে, এই সকল জ্ঞান আপেক্ষিকতায় ভাসমান কি না। পৃথিবীর সর্বোচ্চ এভারেস্ট শৃঙ্গটি যেখানে অবস্থান করছে সেই অবস্থানটি দুই কোটি বছরের একটি আপেক্ষিক সত্য। এর আগে ছিল একটি সমুদ্র এবং সেই সমুদ্রের নামটি হলো টেক্সাস ওশেন। পৃথিবীতে বাস করা মানবজাতির মতো ডাইনোসরেরাও সমুদ্ররূপে যে আনুমানিক পাঁচ কোটি বছর আগে বাস করত এটাও কি আপেক্ষিক সত্য নয়? তা হলে জ্ঞান আর সত্যের মাঝে কী কী পার্থক্য দেখতে পাই? তা হলে কি জ্ঞানই সত্য, নাকি সত্যই জ্ঞান? তা হলে জ্ঞান এবং সত্য দুটোই কি আপেক্ষিকতার বলয়ে ঘূর্ণায়মান, নাকি চিরস্থায়ী? চিরস্থায়ী কথাটিও কি আপেক্ষিকতায় ভাসমান? কোরান-এর সূরা রহমান-এ বলা হয়েছে যে, সব কিছু ফানা হয়ে যাবে, কেবলমাত্র তোমার রবের চেহারাটাই চিরস্থায়ী। সুতরাং, আল্লাহই চিরস্থায়ী। আল্লাহই সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী। আল্লাহই তার সিফাতি তথা গুণবাচক রূপ ধারণ করে ছুটে চলছেন। আল্লাহর এক সেকেন্ডের ছুটে চলার মাঝে এই সামান্য পৃথিবী নামক গ্রহের ডেতর যে কোটি-কোটি রূপ দেখিয়ে চলছেন সেই রূপটি আর কোনোদিন কোনোকালেও কখনো হয় না। তাই আল্লাহর আরেক নাম জুলজালাল এবং কারামতওয়ালা একরাম।

৭৫. কাল (আবদান) বলিলেন) আলাম আকুল (আমি কি বলি নাই) ইনুনাকা (নিশ্চয়ই আপনি) লান (কখনোই না) তাসতাতিয়া (পারিবেন) মাইইয়া (আমার সঙ্গে, আমার সহিত) সাব্রান (সবর, ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থির থাকা, অভাবে টিকিয়া থাকা)।

স্ট (আবদান) বলিলেন, আমি কি বলি নাই, নিশ্চয়ই আপনি কখনোই পারিবেন না আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করিতে।

৭৬. কালা ([মুসা] বলিলেন) ইন্ (যদি, অবশ্যই, যদি না, না) সাআলতুকা (আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার কাছে প্রশ্ন করি, আপনাকে শুধাই, আপনার কাছে জানিতে চাই) আন্ (যে, এই যে, হইতে) শাইয়িনু (কিছু, বস্তুর, জিনিস, যা জ্ঞাতব্য এবং যার বিষয়ে কিছু বলা যায় তাকে শাইয়িন বলা হয়) বাদাহা (তাহার পরে, ইহার পর) ফালা (সুতরাং না) তুসাহিবনি (আপনি আমাকে সঙ্গে রাখিবেন, আপনি আমাকে সঙ্গী হিসাবে রাখিবেন)।

স্ট (মুসা) বলিলেন, যদি (আমি) আপনাকে জিজ্ঞাসা করি (এই) বিষয় হইতে ইহার পর, সুতরাং আপনি আমাকে সঙ্গে রাখিবেন না।

+ কাদ্ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, যথেষ্ট) বালাগতা (আপনি মুক্ত হইলেন, আপনি পৌছাইয়া গেলেন, আপনি খালাস পাইলেন, আপনি নিষ্কৃতি পাইলেন, আপনি অব্যাহতি লাভ করিলেন, আপনি বন্ধনহীন হইলেন) মিন্ (হইতে, থেকে, চেয়ে) লাদুননি (আমার দিক হইতে, আমার পক্ষ হইতে, আমার তরফ হইতে) উজুরান্ (উজুর, আপত্তি, অজুহাত, অভিযোগ, বাহানা, অছিলা, ছল, ছুতা)।

স্ট নিশ্চয়ই আপনি মুক্ত হইলেন আমার পক্ষ হইতে অজুহাত হইতে।

১ ব্যাখ্যা : যদিও এই আয়াতের কলেবর ছোট এবং সহজ করে বলা হয়েছে কিছু ইহার ব্যাখ্যাটি লেখা তত ছোটও হয় না এবং সহজও হয় না। বড়-বড় কবি-সাহিত্যিকরা বলে থাকেন যে, অনেক সহজ কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। সুতরাং, এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ছে যে একজন জাদুরেল নবি এবং অপর জন আল্লাহর জাদুরেল একজন ওলি তথা আবদান। অনেকে এই আল্লাহর জাদুরেল ওলি তথা আবদানকে খিজির নামটি দিয়েছেন। খিজির কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, বরং খিজির বলতে চিরসবুজ বুঝায় তথা যাহা সব সময় সবুজ থাকে এবং বড়ো হবার ও ঝরে পড়ার কথাটি আসে না। সুতরাং, চিরসবুজ খিজির নামটি দিয়ে কোনো বিশেষ ব্যক্তির নামটি বোঝানো হয় নি। এখন একটি বিরাট অথচ ছোট প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় যে, একজন জাদুরেল নবি কেমন করে আল্লাহর একজন জাদুরেল ওলির কর্মকাণ্ডগুলো বুঝে উঠতে পারছেন না। আরেকটু লক্ষ করার বিষয় হলো, এই জাদুরেল ওলিটি কিছু মহানবির জামানার ওলি নয়। কারণ, মহানবি (সা.)-এর জামানার ওলিদের মর্যাদা ও শান পূর্ববর্তী নবি-রসুলদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। নবি মুসা (আ.)-এর জামানায় এমন অনেক ওলি ছিলেন যাদের কার্যকলাপ পূর্ববর্তী নবিরাই বুঝতে পারতেন না। তা হলে সাধারণ মানুষ অথবা জ্ঞানবিদ্যার অধিকারীরাই বা কেমন করে এই জাতীয় ওলিদের কার্যকলাপ বুঝতে পারবে এবং বুঝতে পারা তো দূরের কথা, বরং এটা-সেটা বলে সমাজের কাছে ভণ্ড বলে প্রচার করতেও দ্বিধা বোধ করে না। অনেকেই বলে থাকেন যে, এই জাতীয় জাদুরেল ওলি, যাদেরকে আবদান অথবা খিজির বলে অভিহিত করা হয়, তাদের অনেকের শরীরে কোনো কাপড় থাকে না তথা বসন থাকে না। অনেকে একদম উলঙ্গ, অনেকে অর্ধেক উলঙ্গ, অনেকে চার ভাগের তিন ভাগই উলঙ্গ থাকতে দেখি। কেন উলঙ্গ থাকেন? কারণ, যে-পোশাকটি আমরা পরি, সেই পোশাক শয়তানের দেওয়া পোশাক। যোন মিলনের বিষয়টি জানা থাকলেই পোশাকের প্রয়োজন হয়, নতুবা তাকওয়ার পোশাক পরিহিত অবস্থায় অবস্থান করেন। এখন প্রশ্ন হলো, তাকওয়ার পোশাক বলতে কী বোঝায়? একটি চার বছরের ছেলে আর একটি তিন বছরের মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে খেলা করলেও তারা যোন মিলনের ব্যবহারটি জানে না এবং এই যে জানে না - ইহাকেই বলে তাকওয়ার পোশাক।

আল্লাহ্ অসীম এবং তাঁর জ্ঞানও অসীম। সুতরাং, অসীমকে একটি পাত্রের মধ্যে ঢোকানো যায় না, তা সে পাত্র যত বড়ই হোক না কেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তোলে যে, মুসা নবি (আ.)-এর মতো একজন জাদুরেল নবি আল্লাহর ওলির রহস্যগুলোর কিছুই বুঝতে পারলেন না, এমনকি ধৈর্যটুকুও ধারণ করতে পারলেন না। সুতরাং, আল্লাহর ওলিদের কর্মকাণ্ডগুলো কেমন করে সাধারণ মানুষের কাছে বোঝাটা সম্ভবপর হতে পারে? বুঝতে না পারলে ডগু বলাটা স্বাভাবিক, কারণ বুঝবারও একটা দেয়াল আছে তথা সীমা আছে। এই দেয়াল তথা সীমাটি মানুষকে তকদিরের বৃত্তে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নীতিবান, আদর্শবান হতে চেষ্টা করে এবং সমাজের কাছে এরা নীতিবান ও আদর্শবানরূপে পরিচিতি লাভ করে এবং সমাজ এদেরকে সম্মান করে।

৭৭. ফা (সুতরাং, অতএব, কাজেই, অগত্যা) ইনতালাকা (তাহারা [দুইজন] স্থান ত্যাগি করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহারা [উভয়ে] চলিতে লাগিলেন) হাঁততা (যতক্ষণ পর্যন্ত, যে পর্যন্ত, যখন, এমনকি) ইজা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) আতাইয়া (দুইজনে আসিয়াছে) আহলা (ওয়ালা, মালিক, অধিবাসী [এক ঘর, এক শহর, এক দেশে যারা বাস করে তাদেরকে আহলা বলা হয়। কোনো বিশেষ পেশার লোকদেরকেও আহলা বলা হয়]) কারইয়াতি (বস্ত্র, বস্ত্রিবাসী, এক গ্রামের একটি জনপদ) ইস্তাতআমা (দুইজন খাবার চাহিয়াছিলেন) আহলাহা (ঐ ঘরের লোকেরা, উহার মালিক, ঐ মহিলার ঘরওয়ালা) ফাআবাও (সুতরাং তাহারা অস্বীকার করিল) আন্ (যে, এই যে, হইতে) ইয়ুদাইয়িকু (স্নেহমানদারি করিতে, অতিথিসেবা করিতে, আতিথেয়তা করিতে, আপ্যায়ন করিতে, অভ্যর্থনা করিতে) হমা (তাহাদের দুইজনকে) ফাওয়াজাদা (সুতরাং তাহারা দুইজনে পাইলেন, সুতরাং তাহারী দুইজন পাইয়াছে) ফিহী (উহার মধ্যে) জিদারান্ (প্রাচীর, দেয়াল, প্রাকার, পাঁচিল) ইঠরিদু (সে চায়, সে ইচ্ছা করে, সে অপেক্ষা করে, সে সন্ধান করে, সে আকাজ্জা করে, সে কামনা করে, সে প্রত্যাশা করে, সে বাসনা করে) আন্ (যে) ইয়ানকাদদা (ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হয়) ফাআকামাহ (সুতরাং তিনি [আবদান] তাহাকে সোজা করিলেন, সুতরাং তিনি উহাকে খাড়া করিয়া দিলেন)।

সুতরাং (তাহারা) দুইজন চলিতে লাগিলেন, এমনকি যখন দুইজনে আসিলেন এক গ্রামের অধিবাসীদের (নিকটে, কাছে) দুইজনে খাদ্য চাহিয়াছিলেন ওই ঘরের মালিক (-এর নিকট), সুতরাং তাহারা অস্বীকার করিল যে স্নেহমানদারি করিতে তাহাদের দুইজনকে, সুতরাং তাহারা দুইজনে পাইলেন উহার মধ্যে একটি প্রাচীর, যে (প্রাচীরটি) ভাঙিয়া পড়িবার অবস্থায়, সুতরাং তাহা তিনি চাহিলেন খাড়া করিতে।

+ কালা ([মুসা] বলিলেন) লাও (যদি, হয়, কী ভালোই না হইত) শিতা (আপনি চাইতেন) লাওতাখাজতা (অবশ্যই আপনি লইতে পারিতেন) আলাইহি (তাহার উপর) আজরান্ (একটি মজুরি, একটি পারিশ্রমিক, পুরস্কার, প্রতিদান, কর্মফল, শ্রমফল, পারিতোষিক, সওয়াব, মোহর, বদলা)।

সুতরাং (মুসা) বলিলেন, যদি আপনি চাইতেন অবশ্যই আপনি লইতে পারিতেন তাহার উপর পারিশ্রমিক (মজুরি)।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে দেখতে পাই, নবি মুসা (আ.) পথ চলতে চলতে ক্রোধার্ভ এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই ক্রোধার জ্বালা এবং ক্রান্তির দুর্বলতা নিয়ে উভয়ে একটি লোকালয়ে তথা বসিতে তথা এক কথায় একটি গ্রামে আসলেন এবং উভয়ে অতিথি জ্ঞানবার পরেও ওই গ্রামের অধিবাসীদের একজনেও সামান্য খাবার দিতেও রাজি হলো না। কথিত আছে, ওই গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে ছিল হাড় কিপটা তথা ভয়ঙ্কর কপণ। সুতরাং, অতিথিরূপে গ্রহণ করা তো দূরে থাক, বরং সামান্য খাদ্য দিতেও সবাই অস্বীকার করল। কথিত আছে যে, সেই

গ্রামটির নাম 'আয়লাহ'। তা সেই গ্রামের নাম যাই হোক না কেন, আসলে ওই গ্রামবাসী সবাই এতই কৃপণ ছিল যে, দুইজন অতিথি সামান্য খাবার চাইবার পরেও নিষ্ঠুরের মতো কেবল মুখই ফিরিয়ে নেয় নি, বরং খাড়া-ধারা দিতে অস্বীকার করল। এহেন গ্রামবাসীর জঘন্য আচরণে নবি মুসা (আ.) অবাক হয়ে গেলেন এবং ভাবতে লাগলেন যে, মানুষ কতটুকু নিকৃষ্ট হতে পারলে এমন আচরণটি করতে পারে। মানবিক কারণেও মানুষের কাছে তথা একটি গ্রামবাসীর কাছে সামান্য খাদ্যদ্রব্য চাইবার পরেও এমন নির্মম আচরণ নবি মুসা (আ.) আশা করতে পারেন নাই। এরা কি তবে মানুষের সুরতে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট? এমনভাবেই সেই গ্রামের একটি বাড়ির একটি পুরাতন প্রাচীর ভেঙে পড়ার মতো অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে এবং যে-কোনো মুহূর্তে প্রাচীরটি ভেঙে পড়ে যেতে পারে। তখন আবদান, যাকে খিজির বলা হয় এবং খিজির নামে কোরান-এ একবারও উল্লেখ করা হয় নি, সেই আবদান এবং মুসা একদিকে প্রচণ্ড ক্লান্ত আর অপর দিকে অনেক পরিশ্রম করে নতজানু প্রাচীরটিকে মেরামত করে দিয়ে চলে গেলেন। নবি মুসা (আ.) আর কত ধৈর্যধারণ করবেন। ধৈর্যধারণেরও তো একটা সীমারেখা অবশ্যই থাকে। কিছু ধৈর্যধারণের সীমা অতিক্রম করে যাবার পরও মুসা নবি (আ.) চূপ করেই ছিলেন, কিন্তু উভয়ে অনেক পরিশ্রম করে নতজানু দেয়ালটিকে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেবার পর আবদান মুসাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যাবার মুহূর্তে আবদানকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সামান্য একটি কথা বললেন এই বলে যে, আপনি ইচ্ছা করলে এত খাটনির পর সামান্য মজুরি নিতে পারতেন।

৭৮. কালা (আবদান) বলিলেন) হাজ্জা (ইহা, এই, এইজন, এইটি) ফিরাকু (বিদায়, বিচ্ছিন্নতা, বিচ্ছেদ, সম্পর্কচ্ছেদ, প্রস্থান, ছাড়াছাড়ি) বাইনি (আম্মার মধ্যে, আম্মার মাঝে) ওয়া (এবং) বাইনিকা (আপনার মধ্যে)।

স্ট (আবদান) বলিলেন, এইটাই ছাড়াছাড়ি আম্মার মধ্যে এবং আপনার মধ্যে।

+ সাউনাববিউকা (অচিরেই আপনাকে জানাইয়া দিব, শীঘ্রই আপনাকে অবহিত করিব) বিতাওয়িলি (ব্যখ্যা দেওয়া, বিবরণ, তাৎপর্য সম্পর্কে) ম্মা (যাহা) লাম্ম (না) তাসতাতি (আপনি করিতে পারেন, আপনি করিতে সক্ষম) আলাইহি (তাহার উপর) সাবরান (সবর, ধৈর্য, সহনশীলতা, স্থির থাকা, অভাবে টিকিয়া থাকা)।

স্ট অচিরেই আপনাকে জানাইয়া দিব বিবরণ, যাহা (আপনি) পারেন নাই তাহার উপর সবর করিতে।

১ ব্যখ্যা : মুসা নবি (আ.) এই রকম প্রশ্ন করাতে আবদান বললেন যে, আপনি আর আম্মার সাথে থাকতে পারবেন না। আম্মা হতে আলাদা হয়ে যাবার আগে আপনি যে তিন-তিনটি ঘটনায় সবর করতে পারেন নাই আম্মি উহার আসল রহস্য অথবা কারণগুলো আপনাকে বলে দেবার পর বিদায় নেব। মুসা নবির পক্ষে এই তিনটি ঘটনায় ধৈর্যধারণ করতে না পারায় মিটিমিটি মুচকি হাসার আগে একটি বারের তরে ভেবে দেখুন তো, এই পৃথিবীতে বাস করা আনুমানিক হয় শত কোটি মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করতে পারার প্রশ্নই ওঠে না, বরং হয় শত কোটি মানুষ একবাক্যে বিরূপ মন্তব্য হুড়ে বলতে চাইবে যে, এই রকম আজব জ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নাই - হোক না সেটা এলমে গায়েব অথবা আরও কিছু উপরের জ্ঞান। সুতরাং, জাদুরেল নবি মুসা (আ.)-কে খাটো করে দেখার প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং যারা খাটো করে দেখতে চান তাদেরকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব - এ-রকমটি করবেন না এবং এ-রকম মন-মানসিকতাটি অনুগ্রহপূর্বক ধুয়ে-মুছে ফেলুন। তবে নিজের নফসের সঙ্গে খান্নাস মিশে থাকার কারণে এই জাতীয় কুমন্ত্রণা হতে রেহাই পাওয়াটাও ভাগ্যের ব্যাপার।

৭৯. আম্মা (কিছু, অতএব, যাহা হইক, হে, যে-ব্যক্তি, ওই যে, বাট, অ্যাঙ্ক ট, হাউয়েভার, অ্যাঙ্ক ফর, ইয়েট, অন দ্য আদার হ্যান্ড) সাকিনাত (নৌকাটি) ফাকানাত (সুতরাং ছিল) লিমােসাকিনা (কয়েকজন মিসকিনের জন্য, কয়েকজন দুর্দশাগ্রস্তের জন্য, কয়েকজন দুঃখীর জন্য, কয়েকজন অসহায়ের জন্য, কয়েকজন ভিখারির জন্য, কয়েকজন অবনমিতের জন্য) ইয়াম্মালনা (দাঁড় টানিত, নৌকা চালাইত, বৈঠা চালাইত, পরিশ্রম করিত, অটলভাবে কাজ করিত, জীবিকা অন্বেষণ করিত) ফিল (মধ্যে) বাহারি (নদী, সাগর, সমুদ্র) ফাআরাদতু (সুতরাং আমি চাহিয়াছি, সুতরাং আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম) আন (যে, এই যে, হইতে) আইবাহা (আমি উহাকে খুঁতযুক্ত করিয়া দিয়াছি, আমি উহাকে ক্রটিযুক্ত করিয়া দিয়াছি, আমি উহাকে অকেজো করিয়া দিয়াছি) ওয়া (এবং) কানী (ছিল) ওয়ারাআহমু (তাহাদের পিছনে, তাহাদের পশ্চাতে) মালিকুন (রাজা, নপতি, ভূপতি, সম্রাট, মালিক, অধিপতি) ইয়াখুজু (লইয়া লইত, ধরিয়া ফেলিত) কুল্লা (প্রত্যেক, প্রতিটি) সাকিনাতিন (নৌকা) গাস্বান (ছিনাইয়া লওয়া, বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, জোর করা, জুলুম করা)।

শর্ত ওই যে নৌকাটি সুতরাং ছিল কয়েকজন মিসকিনের, সমুদ্রের মধ্যে দাঁড় টানিত (পরিশ্রম করিত) সুতরাং আমি চাহিয়াছি যে তাহা খুঁতযুক্ত করি, এবং তাহাদের পিছনে ছিল (এক) রাজা, প্রতিটি নৌকা ছিনাইয়া লইয়া যাউত।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে নবি মুসাকে (আ.) তিনটি ঘটনার প্রথমটির গোপন বিষয়টি আবদান ব্যাখ্যা করে বললেন যে, যে-নৌকাটি তিনি হিদ্দ করেছিলেন অথবা ফটো করে দিয়েছিলেন সেই নৌকাটি ছিল একদম হতদরিদ্র মানুষের তথা কয়েকজন মিসকিনের এবং এই হতদরিদ্রদের জীবিকার একমাত্র সন্ধানটিই ছিল এই নৌকাটি। তখন সেই দেশের রাজা ছিল অত্যাচারী এবং খুঁতযুক্ত নৌকাগুলি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ছিনিয়ে নিতেছিল। এই জালেম রাজার নৌকাগুলি বাজেয়াপ্ত করে নেবার অভিযানের খবরটি আবদানের জানা ছিল। তাই আবদান নৌকাটির সামান্য অংশ হিদ্দ করে দেবার কারণে নৌকাটি ডুবন্ত অবস্থায় পড়ে রইল, যাতে জালেম রাজার লোকেরা অথবা সৈন্যরা অকেজো নৌকা মনে করে তথা ভাঙা নৌকা মনে করে না নিয়ে চলে যায়। যে হতদরিদ্র গরিবদের তথা কয়েকজন মিসকিনের এই নৌকাটি, তারা অতি সহজেই এটা স্বেচ্ছায় করে তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারবে। নতুবা যদি ওই হতদরিদ্রদের এই নৌকাটি রাজার সৈন্যবাহিনী অথবা রাজার লোকেরা নিয়ে যেত তা হলে কোনোদিনও সেই নৌকাটি আর পাওয়া যেত না।

এখানে বলে রাখা ভালো যে, এলমে গায়েব জানাটি প্রত্যেক নবি-রসুলের জন্য শর্তযুক্ত। তা হলে নবি মুসা (আ.)-এর মতো জাদুরেল নবি এই নৌকার খবরটি কেন জানতে পারলেন না? কারণ, এলমে গায়েবের বিষয়টিতে অনেক রকম প্রকারভেদ আছে। কোনোটি হালকা, কোনোটি গভীর, কোনোটি গভীরের চেয়েও গভীর। সুতরাং, যদিও এলমে গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ তবুও যে-নফস সম্পূর্ণরূপে খান্নাসমুজ্জ সেই নফসের উপর আল্লাহ প্রয়োজন অনুসারে এলমে গায়েব দান করেন। এই এলমে গায়েব দানের প্রশ্নে কখনো দেখা যায় হালকা, কখনো গভীর, আবার কখনো গভীরের চেয়েও গভীর। আবদান যে গভীর এলমে গায়েবটি জানতেন এবং জানতেন যে জালেম রাজা প্রজাদের নৌকাগুলো একে-একে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে এই হতদরিদ্রদের নৌকাটি নিয়ে গেলে জীবিকা অর্জনের পথটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তাই তিনি নৌকার সামান্য একটু অংশ হিদ্দ করে ডুবিয়ে দিলেন, যাতে ভাঙা নৌকা মনে করে নিয়ে না যায়। এ-রকম গভীর এলমে গায়েবটি আল্লাহ মুসা নবিকে অবগত করেন নি বলেই নবি মুসা অবাক বিস্মিত হয়ে পড়লেন। আবদানের এই গভীর এলমে গায়েবটি জানা ছিল বলেই হতদরিদ্রদের

লোকের একটু অংশ ফুটো করে দিয়ে লোকটিকে বন্ধ করা হলো এবং এই লোক সেরামিত করে পুনরায় জীবিকা অর্জনের পথটির সূত্রাহ করে গেলেন। কেহ-কেহ বলে থাকেন যে, সেই জালেম রাজার নামটি ছিল হাদাদ ইবনে হাদাদ। এই রকম আজব এবং অদ্ভুত নামের মধ্যে দিয়েই রাজার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি কেমন হবে উহা কিছুটা হলেও বোঝা যায়। কারণ, চড়ই পাখির বাচ্চাটি প্রকাণ্ড বটগাছের শাখায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বাতাসে গাছের শাখাটি সামান্য নড়াতে বাচ্চাটি বলে ফেলল, 'মা, মা, আমার পায়ের ভারে বট গাছের ডালটি নড়ছে।' এবং ইহাতে বাচ্চা চড়ই পাখিটির মা বলল, 'তোমার পায়ের ভারে যে বটগাছের শাখাটি নড়ছে ওটা তোমার পা দুটো দেখলেই বোঝা যায়।' সেই রকম ওই জালেম রাজার নামটি হাদাদ ইবনে হাদাদ শুনলেই বোঝা যায় কত ভয়ঙ্কর জালেম রাজা হতে পারে। এডলফ হিটলার, বেনিটো মুসোলিনি, হালাকু খাঁ আর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নামগুলো শুনলেই বোঝা যায় এরা কত ভয়ঙ্কর, মানুষের সুরতে অত্যাচারী।

৮০. ওয়া (এবং) আম্মা (কিন্তু, অতএব, যাহা হউক, যে-ব্যক্তি, ওই যে, বাট, অ্যাজ ট, হাউয়েভার, অ্যাজ ফর, ইয়েট, অন দ্য আদার হ্যাভ) গুলামু (বালক, বাচ্চা, কিশোর) ফাকানা (সুতরাং ছিল) আবাপুয়াহ (তাহার পিতা-মাতা) মুমিনাইনি (দুইজন মোমিন) ফীখাশিনা (সুতরাং আমরা ভয় পাইলাম, সুতরাং আমরা অশঙ্কা করিলাম) আন (যে) ইউবুহিকাহমা (তাহাদের দুইজনকে বিব্রত করিবে, তাহাদের দুইজনকে বাধ্য করিবে, তাহাদের দুইজনকে লিপ্ত করিবে, তাহাদের দুইজনকে কষ্ট দিবে) তুগইয়ানান (অবাধ্যতা, দুর্ভাগ্য, পথভ্রষ্টতা) ওয়া (এবং) কুফরান (কুফরি, অস্বীকার)।

প্ট এবং ওই যে বালকটি, সুতরাং ছিল তাহার পিতা-মাতা দুইজনেই মোমিন, সুতরাং আমরা [এখানে আমরা শব্দটি কেন ব্যবহার করা হলো বুঝতে পারলাম না] আশঙ্কা করিলাম যে, তাহাদের দুইজনকে (সে) বিব্রত করিবে অবাধ্যতা এবং অস্বীকারের (মাধ্যমে)।

৮১. ফাআরাহনা (সুতরাং আমরা ইচ্ছা করিলাম, সুতরাং আমরা চাহিয়াছিলাম) আন (যে) ইউবুদিলাহমা (দুইজনকে বদল করিয়া দেন, দুইজনকে পরিবর্তন করিয়া দেন) রাববুহমা (দুইজনের রব, দুইজনের প্রতিপালক, দুইজনের সদাপ্রভু) খাইরান (উত্তম, অতিশয় ভালো, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) মিনহ (উহা হইতে) জাকাতান (পবিত্র, পরিচ্ছন্ন, মহৎ) ওয়া (এবং) আকরাবা (বেশি নিকটে) রুহমান (মহব্বত, ভালোবাসা, মেহেরবানি)।

প্ট সুতরাং আমরা [এখানে আমরা শব্দটি কেন ব্যবহার করা হলো বুঝতে পারলাম না] ইচ্ছা করিলাম যে দুইজনকে বদল করিয়া দেন দুইজনের রব উহা হইতে উত্তম পবিত্র এবং বেশি নিকট ভালোবাসার (একটি সন্তান)।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে আবদান দ্বিতীয় ঘটনাটির রহস্য বর্ণনা করছেন। তিনি বলছেন যে, যে-বালকটিকে আমি অন্যায়ভাবে মেরে ফেলেছি বলে আপনি ধারণা করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে সেই বালকটি, যার নাম ছিল হায়গুর, সে পরবর্তীকালে একজন দুর্দান্ত অত্যাচারী এবং ধর্মদ্রোহীতে পরিণত হতো। এই হায়গুর নামক পুত্রটি তার ধর্মদ্রোহিতা, অত্যাচার এবং কুফরির দ্বারা তার পিতা-মাতার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করতো যার দরুন তীরাণ্ড অসহায় এবং প্রচণ্ড বিব্রত বোধ করত। এই জ্ঞানটি যাহা আমাদের আছে (একজন বলছেন, অথচ 'আমরা', শব্দটি ব্যবহার করার বিষয়টি বুঝতে পারলাম না) উহা আপনাকে দেওয়া হয় নাই। এই হায়গুর নামক পুত্রের দ্বারা পিতা-মাতা কেবল বিব্রতবোধই করত না, বরং অত্যাচারী হবারও প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। তাই উহা দেখতে পেয়ে আমরা ইহাই ইচ্ছা করলাম যে তাদের দুইজনের রব তথা প্রতিপালক ইহা বদলিয়ে দিয়ে পবিত্র এবং দয়াগুণে গুণাবিত একটি সন্তান তাদেরকে দান করেন।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পিতা-মাতা উভয়ে মোমিন হওয়া সত্ত্বেও মোমিনের ঘরে কেমন করে এ-রকম অত্যাচারী এবং কাকের সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তা হলে কি পিতা-মাতা উভয়ের মোমিন হওয়া সত্ত্বেও শুদ্ধকীর্টে এই জাতীয় কাকের সন্তানটি হতে পারে? ইহার ব্যাখ্যা দেওয়াটি অধম লিখকের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ, আমরা জানি নিম্ন গাছের বীজ দিয়ে নিম্ন গাছই হয়। তবে মাঝে-মধ্যে যে ব্যতিক্রম হয়ে যায় ইহাও খবরের কাগজে দেখতে পাই। হয়তো পিতা-মাতা নামক মোমিনের ঘরে এই রকম কামিন সন্তানটি জন্মগ্রহণ করবে ইহাও একটি ভেবে দেখার বিষয়। আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে এ-রকম ভুরি-ভুরি জৈপুরীত্বের দৃশ্য আমরা অহরহ খবরের কাগজে দেখতে পাই। সুতরাং, এই বৈপরীত্যটি মোটেই স্বাভাবিক নয়, বরং সম্পূর্ণ একটি ব্যতিক্রমধর্মী অস্বাভাবিক বিষয়। যাহাকে দর্শনের ভাষায় অ্যাকসিডেন্ট বলা হয়।

সম্ভবত বছর পঁচিশেক আগে ঢাকা শহরে কলতা বাজারে একটি বিশাল নিম্ন গাছ ছিল (বর্তমানে নিম্নগাছটি আছে কি না জানি না)। সেই নিম্ন গাছ হতে মিষ্টি রস বের হতো এবং নিম্ন গাছের ডালের সামান্য অংশ খেজুর গাছ কাটার মতো কেটে বড়-বড় হাড়ি-পাতিল বসিয়ে রাখা হতো এবং সেই রস নাম্বানোর পর খেয়ে দেখতো যে মধুর মতো মিষ্টি এবং এই খবরটি বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় নিম্ন গাছ এবং হাড়ি-পাতিল ঝোলানো অবস্থায় ছবিসহ প্রচার করা হয়েছিল। সুতরাং, কোনো সন্দেহ নাই ইহা একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়।

৮২. ওয়া (এবং, আর, ও) আমরা (কিছু, অতএব, যাহা হইক, হে, যে-ব্যক্তি, বাট, অ্যাজ টু, হাউয়েভার, অ্যাজ ফর, ইয়েট, অন দ্য আদার হ্যান্ড, ওই যে) জিহাদ (প্রাচীর, দেওয়াল, প্রাকার) ফাকানা (সুতরাং ছিল) লিঙ্গলামাইনি (দুই বালকের জন্য, দুই কিশোরের জন্য, দুই বাদ্যের জন্য) ইয়াতিমাইনি (দুই এতিমের, দুইজন পিতৃহীনের) ফিল (মধ্যে) মাদিনাতি (শহর, নগর) ওয়া (এবং) কানী (ছিল) তাহতাহ (তাহার নিচে) কানজুল (গুপ্তধন, গোপন ধনভাণ্ডার) লাহমা (দুইজনের জন্য, উভয়ের জন্য) ওয়া (এবং) কানী (ছিল) আবুহমা (দুইজনের পিতা, দুইজনের বাবা) সালিহান (সং ব্যক্তি, ন্যায়পরায়ণ লোক, নিরপেক্ষ জন, নেককার ব্যক্তি, সংকল্পপরায়ণ লোক)।

প্ট এবং ওই যে দেওয়ালটি সুতরাং ছিল দুই এতিম বালকের জন্য শহরের মধ্যে এবং তাহার নিচে ছিল গুপ্তধনভাণ্ডার দুইজনের জন্য এবং দুইজনের পিতা ছিলেন সং ব্যক্তি।

+ ফাআরাদা (সুতরাং ইচ্ছা করিলেন) রাব্বুকা (আপনার রব, আপনার প্রতিপালক, আপনার সদাপ্রভু) আন (যে) ইয়াবলুগা (তাহারা দুইজন পৌছাইয়া যায়) আশুদদাহমা (তাহাদের দুইজনে শক্তি এবং বিচার-বিশেষণের কাল পূর্ণ হওয়া, তাহারা বড় হইয়া, তাহাদের দুইজনের যোবনে, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া) ওয়া (এবং) ইয়াস্তাখরিজা (দুইজনে বাহির করিয়া লইবে, দুইজনে উদ্ধার করিবে) কানজা (গুপ্তধন, গোপন ধনভাণ্ডার) হমা (দুইজনের)।

প্ট সুতরাং ইচ্ছা করিলেন আপনার রব যে তাহারা দুইজনে পৌছাইবে যোবনে এবং বাহির করিয়া লইবে দুইজনের গুপ্তধন।

+ রাহমাতান (রহমত, দয়া, অনুগ্রহ, মেহেরবানি) মির (হইতে) রাব্বিকা (আপনার রবের, আপনার প্রতিপালকের, আপনার সদাপ্রভুর)।

প্ট আপনার রব হইতে রহমত।

+ ওয়া (এবং) মা (না) ফাআলতুহ (সুতরাং আমি করিয়াছি) আন (হইতে, থেকে, চেয়ে) আমরি (আমার আদেশ, আমার নির্দেশ, আমার কাজ, আমার ব্যাপার)।

প্ট এবং সুতরাং আমি করি নাই আমার নির্দেশ হইতে।

+ জালিকা (ওইটা) তাওয়িলু (ব্যখ্যা দেওয়া, বিবরণ দেওয়া) মা (না, কি, যে, যাহা, নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত, যদি) লাম্ (নাই) তাসুতি (পারা, সক্ষম) আলাইহি (তাহার উপর) সাব্রান (ধৈর্য, সবর, সহনশীলতা, স্থির থাকা, অভাবে টিকে থাকা)।

প্ট ওইটা ব্যখ্যা দেওয়া যে, পারেন নাই তাহার উপর ধৈর্যধারণ করিতে।

১ ব্যখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে, আবদান যে-প্রাচীরটি নবি মুসাকে সঙ্গে নিয়ে কায়িক পরিশ্রমে মেরামত করেছিলেন সেই প্রাচীরের নিচেই দুজন এতিম বালকের ধন-সম্পদ তাদের পিতা লুকিয়ে রেখেছিলেন। অনেকের মতে এই এতিম বালক দুটোর পিতা সেই জম্বিনায় কাপড় বুনতেন তথা তাঁতি ছিলেন। তাঁতিদেরকে জোয়ালাও বলা হয়ে থাকে এবং এই জোয়ালা শব্দটির অপভ্রংশ হলো জোলা। জোয়ালা শব্দের অপভ্রংশ জোলা একটি গালিতে পরিণত হয়েছে। অথচ এই কাপড় বোনার তাঁত ব্যবসা হতেই তাঁতের বড়-বড় মিলের মালিকদেরকেও জোলা বলে গালি দিতে শুনি। কিন্তু ইহা মোটেই গালির বিষয় নয়, বরং একটি প্রাচীনতম সম্মানজনক পেশা অথবা ব্যবসা।

এই এতিম বালক দুটোর পিতা অত্যন্ত সৎলোক ছিলেন। আবদান বললেন, এ-জন্যই আপনার রব্ব ইচ্ছা করলেন যেন তারা বড় হয়ে সেই ধনভাণ্ডারটি বাহির করতে পারে। যদি সেই নতজানু প্রাচীরটি পড়ে যেত তা হলে ঐ এতিম বালক দুটোর জন্য রক্ষিত গুপ্তধন দেখা যেত এবং চুরি করে নেবার সম্ভাবনাটি থেকে যেত। সেই কারণেই আমি ওইরূপ কর্মটি করেছি আর এই বিষয়টি আপনার রব্বের রহমত দান করার একটি বিশেষ বিষয়। আপনি আরও জেনে রাখুন যে, এই কাজ আমার আপন ইচ্ছায় করি নাই, বরং আপন রব্বের ইচ্ছাতেই করা হয়েছে। আবদানের ইচ্ছা আর রব্বের ইচ্ছা একাকার হয়ে যায় এবং নিজস্ব ইচ্ছাটি আর ইচ্ছার গণ্ডিতে আবদ্ধ না হয়ে রব্বের ইচ্ছায় সম্পূর্ণরূপে মিশে যায়। পানির সঙ্গে চিনি মিশিয়ে দিলে চিনির অস্তিত্ব অবশ্যই থাকে, কিন্তু চিনিকে আর আলাদারূপে দেখবার উপায় থাকে না। কারণ, চিনি পানিতে মিশে একাকার হয়ে যায়। এখানে মূল শিক্ষাটি হলো, আপন-আপন নফস হতে খান্নাসটিকে তথা মোহ-মায়াজটিকে সম্পূর্ণরূপে তাড়িয়ে দিতে পারলে রব্বের আদেশ-নিষেধের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। কোরানুল মবিন ঘটনাপ্রবাহের কাহিনী বর্ণনা করে নি, বরং কাহিনীর উপর আঘাত করে মূল বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তবু মানুষ কোরান হতে কাহিনী খুঁজতে চায়। কেন চায়? উত্তরটি হলো, মানুষ বাচ্চা ছেলে-পেলের মতো গল্পপ্রিয়। বাচ্চারা যে-রকম গল্প পছন্দ করে সে-রকম প্রতিটি মানুষ যাবন হতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত গল্পকেই বুকে ধারণ করে রাখতে চায়। প্রকারভেদে শিশুর গল্প, কিশোরের গল্প, যুবকের গল্পের উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি এবং বুড়োকালেও বুড়োরা গল্পই পছন্দ করে, কিন্তু গল্পগুলোর ধারা অন্য রকম হয়। সুতরাং, মানুষ অত্যন্ত গল্পপ্রিয়। এই গল্পপ্রিয়তার জন্যই মানুষ আপন নফস হতে খান্নাসকে মুক্ত না করে বিভিন্ন গল্পের মাঝে ভেসে বেড়াতে ভালোবাসে। ইহাও এক ধরনের অতিসূক্ষ্ম কুমন্ত্রণা, যাহা আপন নফসের বিবেকের পাশেই চোরাগুপ্তা অবস্থায় অবস্থান করে।

৮৩. ওয়া (এবং, আর, ও) ইয়সআলুনাকা (তাহারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহারা আপনাকে প্রশ্ন করে, তাহারা আপনার কাছে প্রার্থনা করে, তাহারা আপনাকে শুধায়) আন (যে, এই যে, হইতে, বিষয়ে, সম্পর্কে, সম্বন্ধে) জিলকারনাইনি (জুলকারনাইন)।

প্ট এবং তাহারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন জুলকারনাইন সম্পর্কে।

+ কুল (বলুন) সাআতুলু (আমি তেলাওয়াতি করিব, আমি পাঠ করিব, আমি পড়িব, আমি আবৃত্তি করিব) আলাইকুম্ (তোমাদের নিকট, তোমাদের

কাছে) মিনহ (উহা হইতে, উহার মধ্যে, উহার থেকে) জিকরান (স্মরণ, উপদেশ, বয়ান, আলোচনা, যোগাযোগের বিষয়, সংযোগের বিষয়)।

প্ট বলুন আমি তেলাওয়াত করিব তোমাদের নিকট উহা হইতে জিকরি।

৮৪. ইন্ন (নিশ্চয়ই, অবশ্যই) মাক্কান্না (আমরা সম্মানিত করিয়াছি, আমরা কর্তৃত্ব দিয়াছি [এখানে 'আমি'র স্থলে আমরা ব্যবহার করা হয়েছে], আমরা প্রভুত্ব দিয়াছি, আমরা আধিপত্য দিয়াছি) লাহ (তাহাকে) ফিল (মধ্যে) আরদি (পৃথিবী, মাটি, ভূমি, দেহ) ওয়া (এবং) আতাইনাহ (আমরা তাহাকে দিয়াছি) মিন (হইতে, থেকে) কুল্লি (সমস্ত, সকল [এই শব্দটি শব্দ হিসাবে একবচন, কিন্তু অর্থের দিক হইতে বহুবচন। তাই বাক্যের ব্যবহারে ইহা উভয় বচনেই ব্যবহৃত হয়], প্রত্যেক, প্রতিটি, সর্ব, এক-এক করিয়া সমুদয়) শাইয়িন (বস্তু, কিছু, জিনিস, বিষয়) সাবাবান (উপকরণ, সামান, উপায়, রশি [ওই রশি যা উপর হইতে নিচে দেওয়া হয়। ওই শব্দ লম্বা রশি যা ধরিয়া উপরে ওঠা যায় বা নিচে নামা যায়], উপাদান, যে সকল বস্তু একত্র করিয়া অন্য বস্তু গঠিত হয়, পথ : জে জি হাভা]।

প্ট নিশ্চয়ই আমরা [এখানে 'আমি'র পরিবর্তে 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে] কর্তৃত্ব দিয়াছি তাহাকে পৃথিবীর মধ্যে এবং আমরা তাহাকে দিয়াছি প্রত্যেক বস্তু হইতে উপকরণ।

৮৫. ফাত্বা (সুতরাং তিনি এত্তেবা করিলেন, সুতরাং তিনি অনুসরণ করিলেন, অনুগমন, অনুকরণ, ['ইত্তেবা' শব্দটি হইতে এসেছে] সাবাবান (উপকরণ, সামান, উপায়, রশি [ওই রশি যা উপর হতে নিচে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই শব্দ লম্বা রশি যা ধরে উপরে ওঠা যায় বা নিচে নামা যায়], উপাদান, যে সকল বস্তু একত্র করিয়া অন্য বস্তু গঠিত হয়, পথ (জে জি হাভা)।

প্ট সুতরাং তিনি অনুসরণ করিলেন উপায়।

১ ব্যাখ্যা : এই তিনটি আয়াতে জুলকারনাইন সঙ্ক্ষে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কর্তৃত্বের বলয় এতই প্রশস্ত যে উহা পৃথিবীর সর্বস্থানে অবস্থিত। বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত ইতিহাস তন্নতন্ন করে ঘেঁটে দেখলেও জুলকারনাইনের মতো এমন শক্তিশালী বাদশাহর অস্তিত্বটি পাওয়া তো দূরে থাক, বরং বিস্ময়কর একটি ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে বলে অনেকে মনে করবে। কিন্তু কোরান-এর এই আয়াতগুলোতে যে-জুলকারনাইনের কথাটি বলা হয়েছে তিনি নিঃসন্দেহে চরম আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী বলেই মনে হয়। কারণ, তাকে দুই শিঙের অধিকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে দুই শিঙ বলতে বাস্তব জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগতের ক্ষমতা প্রদান করার কথাটি বোঝানো হয়েছে বলে মনে করতে চাই। আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করা ছাড়া এমন ক্ষমতার অধিকারী হওয়া দুনিয়ার কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। কোরান-এর বহু তফসির পড়ার পর আমি অধম লিখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। সূরা আশ্বিয়ার একাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ যেমন নবি সোলায়মানকে সমগ্র পৃথিবীর রহস্যের বাতাস নিয়ন্ত্রণ করার একক ক্ষমতাটি দিয়েছিলেন, সে-রকম জুলকারনাইনকেও সর্ববিষয়ে জ্ঞানদান করার প্রশ্নে আধ্যাত্মিক জগতের একজন মহাপুরুষ বলা হয়েছে বলে মনে করতে চাই। যদি কেহ অধম লিখকের এই কথাগুলো সঠিক নয় বলে প্রমাণ করতে চান তা হলে সোজাসুজি বলতে চাই যে, এই তিনটি আয়াতের তথ্য জুলকারনাইনের বিষয়টি অধম লিখকের জানা নাই।

অনেকে তো কাইরিস মাগদুনির পুত্র ইসকান্দারকে জুলকারনাইন বলতে চেয়েছেন। এমনকি তিনি খ্রিস্টের অধিবাসী ছিলেন এবং তার প্রধানমন্ত্রীর নামটিও বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বহুল প্রচলিত বিখ্যাত একটি ইংরেজি ভাষায় রচিত কোরান-এর তফসিরে জুলকারনাইন

বলতে আনেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে মনে করে প্রচুর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। যে যে-ভাবে বোঝে সেই বুঝবার উপর হস্তক্ষেপ করতে নাই এবং হস্তক্ষেপ করাটিকে সম্মাচীন মনে করি না। অনেক বলে থাকেন, জুলকারনাইনের মাথার দুই দিকে দুটি শিশু-সদৃশ তামার পাত ছিল এবং তিনি রুম ও পারস্যের বাদশাহ ছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো, রুম আর পারস্যই কি এই পৃথিবী? এই পৃথিবী কি এতই ছোট যে রুম ও পারস্য এবং উহার আশেপাশের স্থান জুড়েই সমগ্র পৃথিবীকে বোঝানো যায়? তা হলে উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো বিরাট তিনটি মহাদেশ, যাহা সেই দিনে সেই সময়ে আবিষ্কার হবার প্রশ্নই ওঠে না, উহাও কি পৃথিবীর একটি বিরাট অংশ নয়? তা হলে পৃথিবী বলতে কী বোঝানো হয়েছে? অধম লেখকের নানির পৃথিবীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল তের কিলোমিটার। ইহা সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ নামক চার খণ্ডে রচিত বইতে উল্লেখ করেছিলাম। তবে এই সিদ্ধান্তে আসাটি অযৌক্তিক বলে মনে করতে চাই না যে, সেই প্রাচীন যুগে পৃথিবী সম্বন্ধে যতটুকু ধারণা ছিল উহাই আন্তরিকতার সহিত বর্ণনা করেছেন এবং ইহা মোটেই কোনো দোষের বিষয় নহে।

পৃথিবীর মাগরিক ও মাগরিব তথা পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত জুলকারনাইনের কর্তৃত্ব থাকার কথাটির দ্বারা তাকে আধ্যাত্মিক জগতের মহাপুরুষ রূপেই ধরে নিতে চাই। যদি জুলকারনাইনের অধীনস্থ করা হয়ে থাকে মেঘমালাকে এবং সুরাইয়া নামক নক্ষত্র পর্যন্ত কর্তৃত্বের কথাটি বলা হয়ে থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে জুলকারনাইন অধ্যাত্মরাজ্যের একজন মহাপুরুষ। কারণ, পৃথিবীর কোনো রাজার পক্ষেই এ-রকম শক্তির অধিকারী হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয় বলেই অধম লেখক মনে করতে চায়। পরিশেষে, পুনরায় বলতে হচ্ছে যে, আমার এই ক্ষুদ্র ধারণার ক্ষুদ্র ব্যাখ্যাটি যদি কারও পছন্দ না হয় তা হলে অকপটে মনে নিয়ে বলতে চাই যে, জুলকারনাইন বিষয়টি অধম লেখকের জানা নাই।

৮৬. হাত্তা (যতক্ষণ পর্যন্ত, যে পর্যন্ত, যখন, এমনকি) ইজা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) বালাগা (সে পৌছাইয়া গিয়াছে, সে উপনীত হইয়াছে) মাগরিবা ([সূর্যাস্তের] স্থান, [সূর্যাস্তের] সময়, [সূর্যাস্তের] দিক, অস্তাচল) শামসি (সূর্য, বেদী) ওয়াজ্জাদাহ (তাহা পাইল, তাহা পাইয়াছে) তাগুরু (উহা অস্থ যায়) ফি (মধ্যে) আইনি (চক্র, প্রসবণ, বরনা) হামিআতিন (কাদায়ুক্ত স্যাতসেতে, পঙ্কিল, কর্দমাক্ত) ওয়া (এবং) ওয়াজ্জাদাহ (পাইলেন, পাওয়া) ইনিদাহা (তাহার নিকট, তাহার কাছে, উহার সঙ্গে) কাওমান (এক সম্প্রদায়, এক জাতি, একদল লোক)।

পট যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের অস্তাচলের স্থানে যখন পৌছিলেন তাহা পাইলেন (সূর্যকে) কাদার বরনার মধ্যে অস্থ যাইতেছে এবং উহার সঙ্গে (তিনি) পাইলেন একটি সম্প্রদায়।

+ কুলনা (আমরা [এখানে 'আমি' বলা হয় নি] বলিলাম) ইয়া (হে, ওহে) জালকারনাইনি (জুলকারনাইন) ইম্মা (যদি, অথবা) আন (যে, এই যে, হইতে, বিষয়ে, সম্পর্কে) তুআজ্জিবা (তুমি শাস্তি দাও, তুমি কষ্ট দাও) ওয়া (এবং) ইম্মা (যদি, অথবা) আন (যে, এই যে, হইতে, বিষয়ে, সম্পর্কে) তাত্তাখিজা (তুমি বানাও, তুমি বানাইবে, তুমি গ্রহণ করো, তুমি গ্রহণ করিবে) ফিহিম (তাহাদের মধ্যে) হসনান (উত্তম হওয়া, সুন্দর হওয়া, শোভন, মনোহর, রূপবান)।

পট আমরা বলিলাম, হে জুলকারনাইন, তুমি তাহাদের শাস্তি দিতে পারো এবং অথবা তুমি গ্রহণ করো তাহাদের মধ্যে সুন্দর (ব্যবহার)।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতটিকে দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, তবে গোজামিল আর মনগড়া কথা দিয়ে সব কিছুই করা যায়। কারণ, পৃথিবীর

কোনো ঝরনা কদমাজ্ঞ হয় না এবং কদমাজ্ঞ একটি ঝরনাও ইনশাল্লাহ সমগ্র পৃথিবীতে পাওয়া যায় কি না অধম লিখকের জ্ঞান নাই। সুতরাং, এই আয়াতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি দেওয়া যেতে পারে। আবার, বলা হচ্ছে কাদায় মিশ্রিত ঝরনার পানির কাছেই একটি কওম তথা একটি সম্প্রদায়কে পাওয়া যাবে। তারপর আল্লাহ 'আম্মি' না বলে 'আম্মরা' শব্দটি ব্যবহার করে বললেন, হে জুলকারনাইন, হয় সে কওমকে শাস্তি দাও অথবা তাদের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করো। কদমাজ্ঞ ঝরনার পাশেই যে-সম্প্রদায়টি বাস করছিল তারা এমন কী শাস্তিযোগ্য অপরাধ করল যে তাদেরকে শাস্তি দেবার কথাটি শোনানো হলো? তা ছাড়া সে কওমের কাছে কি কোনো নবি-রসুল পাঠানো হয়েছিল আল্লাহর নির্দেশনামূলক বর্ণনা করার জন্য এবং কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ ইহা কি কোনো নবি-রসুল দ্বারা বোঝানো হয়েছিল যে শাস্তি দেবার কথাটি বলা হয়েছে? শাস্তি দেবার কথাটি তখনই আসে যখন সীমালঙ্ঘন করে। তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়। সীমালঙ্ঘন বলতে কী বোঝানো হয় এবং সীমা কি ফিতা দিয়ে মাপা হবে নাকি অন্য কিছুর মানদণ্ডে মাপা হবে এ-রকমভাবে অনেক কিছু প্রশ্নই তো উকিঝুকি মারে। কিন্তু চুপ করে রইলাম। তারপরে আবার জুলকারনাইনকে বলা হচ্ছে যে, তুমি সেই অপরিচিত কদমাজ্ঞ ঝরনার পাশে বাস করা কওমটির সঙ্গে তথা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তথা সেই জাতির সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার করো। সম্পূর্ণ একটি অপরিচিত কওম বা সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে সবাই কম-বেশি সুন্দর ব্যবহারই করে থাকে। তবে রাজ্য লাভ করার আশায় অথবা একটি কওমকে আপন ইচ্ছার কাছে বশীভূত করার প্রশ্নে শাস্তি ও সুন্দর ব্যবহার উভয়টিরই প্রয়োজন হয়। অবশেষে, পাঠকদেরকে একটি কথা বলতে চাই যে, কেহ যদি এই আয়াতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি জানতে চান তা হলে শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতির কোরান দর্শন নামক কোরান তফসিরের দ্বিতীয় খণ্ডে এই আয়াতটির অপূর্ব ব্যাখ্যাটি পড়ে সম্ভবত অভিভূত হতে অথবা চমকে যেতে পারেন।

৮৭. কাল (জুলকারনাইন) বলিলেন) আম্মা (সেই বিষয়ে) মান (যে) জালাম্মা (জুলুম করিয়াছে, অন্যায় করিয়াছে, মন্দ কাজ করিয়াছে, নির্যাতন করিয়াছে, জুবুদস্তি করিয়াছে, দোষ করিয়াছে, পাপ করিয়াছে, শেরেক করিয়াছে, নিপাড়ন করিয়াছে, ক্ষতি করিয়াছে, অমঙ্গল করিয়াছে) ফা (সুতরাং, অতএব, অগত্যা, অতঃপর) সাওফা (শাম্মি, স্বল্প সময়ের মধ্যে, দ্রুত, অবশেষে, নিকটবর্তী, খুব তাড়াতাড়ি) নুআজ্জিবুহ (আম্মরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাকে শাস্তি দিব, আম্মরা তাহাকে সাজা দিব, আম্মরা তাহাকে দণ্ড দিব, আম্মরা তাহাকে নিগ্রহ দিব) সুম্মা (তাহার পর, অতঃপর, আবার) ইউরাদু (ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, রদ করা হয় না, উপনীত করা হয়, ফেরত পাঠানো হইবে, প্রত্যাবর্তিত হইবে) ইলা (দিকে, পর্যন্ত, সঙ্গে) রাবুবিহি (তাহার রবের, তাহার প্রতিপালকের, তাহার সদাপ্রভুর) ফায়ুআজ্জিবুহ (সুতরাং তিনি শাস্তি দিবেন তাহাকে) আজাবান (শাস্তি, দণ্ড, সাজা, নিগ্রহ) নুকরান (অবাস্তিত, খুব কঠিন, ভয়ানক)।

পট (জুলকারনাইন) বলিলেন, সেই বিষয়ে, যে জুলুম করিয়াছে সুতরাং, তাড়াতাড়ি আম্মরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাকে সাজা দিব, তাহার পর ফেরত পাঠানো হইবে তাহার রবের দিকে, সুতরাং তিনি [একবচনে বলা হয়েছে] তাহাকে শাস্তি দিবেন, ভয়ানক শাস্তি।

৮৮. ওয়া (এবং) আম্মা (সেই বিষয়ে) মান (যে) আম্মানা (ইমান আনিল) ওয়া (এবং) আম্মা (কাজ করে) সালিহান (ভালো, উপযুক্ত, শুভ, মঙ্গলকর, সঠিক, নির্ভুল, ন্যায়সম্মত, যথাযথ, মানানসই, সুন্দর, শেভিন, অটুট, গভীর, নিরোঁট, পুরোঁদস্তর, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুযুক্তিপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য, বিচক্ষণ, নৈতিক উৎকর্ষ সম্পন্ন, সদিশুণ্যুক্ত, সুনীতিসম্পন্ন, কঠব্যপরাধণ, সুনীতি অনুযায়ী, শুভ উদ্দেশ্য

প্রণোদিত, আন্তরিক, ঐশ্বরিক নিয়মসম্মত, সংকল্প [লোগাতুল কোরান : রশিদ লোমানি, লোগাতুল কোরান : আবদুল আজিজ, লোগাতুল কোরান : সিকান্দার আলি, আল মাওরিদ, আর মনজ্জিদ, আল কামুস, আল মেরুবাহ, আল কাওসার, জে জি হাভা, হ্যাস ওয়ের : কাউয়ান, স্টেইনগাস, জর্জ পাসি ব্যাজার, এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেইন, অ্যাডুনি স্যালমল, হাসান এস কারমি, জন অবকারিয়াস।] ফালাহ (সুতরাং তাহার জন্য) জাজ্জাআ (প্রতিদান, বদলা, শাস্তি দেওয়া, পুরস্কৃত করা, মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া, বিনিময়, পারিশ্রমিক, শাস্তি, পুরস্কার, পারিতোষিক, স্থলাভিষিক্ত, পরিশোধ, কৃতিপূরণ, খেসারত, তুল্যবিনিময়, প্রত্যর্পণ, প্রতিবিধান, দণ্ড, রিপেমেণ্ট, কমপেনসেশন, পানিশমেন্ট, রিটার্ন, অ্যামেন্ডস, পেনাল্টি) হসনা (উত্তম, সুন্দর, শোভন, মনোহর, রূপবান, কল্যাণ, মঙ্গল, বিউটিফুল, হ্যান্ডসাম, প্রিটি, লাভলি, একসিলেন্ট, সুপিরিওর, পারফেক্ট।

প্ট এবং সেই বিষয়ে, যে ইমান আনে এবং আমলে সালেহা করে সুতরাং তাহার জন্য উত্তম বিনিময়।

+ ওয়া (এবং) সানাকুলু (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] বলিব) লাহ (তাহাকে) মিন (হইতে) আমিরিনা (আমাদের [বহুবচনে বলা হয়েছে] নির্দেশে, আমাদের আদেশে) ইউসরা (সহজতা, আসানি, নম্রতা, সহজ, ইজিনেস, জেন্টলনেস, দ্রুতসাধনযোগ্যতা)।

প্ট এবং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] বলিব তাহাকে আমাদের নির্দেশ হইতে (যাহা) সহজ।

৮৯. সুম্মা (তারপর, অতঃপর, আবার, তখন, পরে তৎক্ষণাৎ, আরও, পুনরায়, ঐতদতিরিক্ত, অধিকন্তু, আরেকবার) আত্বা (তিনি এত্বেবা করিলেন, তিনি অনুসরণ করিলেন, অনুগমন, অনুকরণ [‘ইত্বেবা’ শব্দটি হতে এসেছে]) সাবাবান (যা উপর হইতে নিচে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, রশি, ওই শক্ত লম্বা রশি যা ধরিয়া উপরে ওঠা যায় বা নিচে নামা যায়, উপাদান, যে-সকল বস্তু একত্র করিয়া অন্য বস্তু গঠিত হয়, পথ [জে জি হাভা])।

প্ট তারপর তিনি অনুসরণ করিলেন উপায়।

৯০. হাততা (যতক্ষণ পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত, যখন, এমনকি) ইজা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) বালাগা (পৌছাইয়া গেলেন) মাতলিয়া (উদয়ের স্থান) সাম্মসি (সূর্যের) ওয়াজাদাহা (তাহা পাইলেন, তাহা পাইয়াছেন) তাতলুউ (উদয় হয়, বাহির হয়) আলা (উপর) কাওমিন (এক সম্প্রদায়, এক জাতি, এক দল) লাম (না, নাই, নহে) নাজ্জাল (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] সৃষ্টি করি) লাহম (তাহাদের জন্য) মিন্দুনিহা (উহা ব্যতীত, তিনি ব্যতীত, তিনি ছাড়া) সিতরান (হেজাব, পর্দা, আড়াল, বেড়া, আবরণ, অন্তরায় আচ্ছাদন, যবনিকা, ঘোমটা, অবগুণ্ঠন, বোরখা, হৃদ্যবেশ, ঢাকনা, ঢাল, বর্ম, মিথ্যা ওজর, ছুতা, ভয়, আশঙ্কা, আতঙ্ক, বিনয়, নম্রতা, লাজুকতা, সুশীলতা, শালীনতা, সচ্চরিত্র, কারটেইন, ডেইল, কভারিং, স্ক্রিন)।

প্ট যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের উদয়ের স্থানে যখন পৌছাইয়া গেলেন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হইতে তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন, উহা ব্যতীত আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] সৃষ্টি করি নাই তাহাদের জন্য আবরণ।

৯১. কাজালিকা (ওইভাবেই, ওইরূপেই, সেইভাবে, তেমনিই, এমনভাবে, অনুরূপে, ওই অবস্থায়, অনুরূপভাবে, সুতরাং, অতএব, অনুরূপ কারণে, তেমনিভাবে, ওই ধরনে, এই ধরনে, এতদনুসারে, এতদূর পর্যন্ত, ততদূর পর্যন্ত, সমভাবে, সো লাইক দিস, দাজ্জ, ইকুয়ালি, লাইকওয়াইজ, লাইক দ্যাট) ওয়া (এবং, আর, ও) কাদ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, যথেষ্ট) আহাতনা (আমরা ঘিরিয়া ফেলিয়াছি, আমরা জানিতে পারিয়াছি, আমরা সম্যক অবগত আছি, আমরা

পুরোপুরি বুঝিতে পারিয়াছি, আমরা বেঁটন করিয়া রাখিয়াছি) বিম্বা (যাহা, ওই বস্তু হইতে) লাড়াইহি (তাহার নিকট, তাহার সহিত, তাহার কাছে) খুবরান (খবর, সংবাদ, তথ্য, জ্ঞান, বুদ্ধি, বার্তা)।

প্ট ওইভাবেই। এবং নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] পুরোপুরি বুঝিতে পারিয়াছি যে-খবর তাহার কাছে (আছে)।

৯২. সুম্মা (তারপর, অতঃপর, আবার, তখন, পূর্বে তৎক্ষণাৎ, আরও, পুনরায়, ঐতদতিরিক্ত, অধিকন্তু, আরেকবার) আত্বা (তিনি ঐত্তেবা করিলেন, তিনি অনুসরণ করিলেন, অনুগমন, অনুকরণ [‘ইত্তেবা’ শব্দটি হতে এসেছে]) সাবাবান (যা উপর হইতে নিচে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, রশি, ওই শক্ত লম্বা রশি যা ধরিয়া উপরে ওঠা যায় বা নিচে নামা যায়, উপাদান, যে-সকল বস্তু একত্র করিয়া অন্য বস্তু গঠিত হয়, পথ [জে জি হাভা])।

প্ট তারপর তিনি অনুসরণ করিলেন উপায়।

৯৩. হাততা (যতক্ষণ পর্যন্ত, যে-পর্যন্ত, যখন, এমনকি) ইজা (যখন, ওইসময়, হঠাৎ) বালাগা (পৌছাইয়া গেলেন) বাইনা (মধ্যে, মাঝে) সাদ্দাইনি (দুইটি প্রাচীর, দুইটি দেওয়াল) ওয়াজাদা (পাইলেন, পাইয়াছেন) মিন্দুনিহিমা (তাহাদের দুই সম্প্রদায়) ছাড়াও কাওমান (একটি সম্প্রদায়)।

প্ট যতক্ষণ পর্যন্ত দুই প্রাচীরের মধ্যে যখন পৌছাইয়া গেলেন তিনি পাইলেন তাহাদের দুই (সম্প্রদায়) ছাড়াও একটি সম্প্রদায়কে।

+ লা (না) ইয়াকাদুনা (নিকটে) ইয়াকাহনা (তাহারা বুঝে) কাওলান (কথা)।

প্ট তাহারা কথা বুঝিবার নিকটেও না।

১ ব্যাখ্যা : সাতাশি নম্বর আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই পাঠকদেরকে মনে রাখতে হবে যে এই ঘটনাগুলো কয়েক হাজার বছর পূর্বের ঘটনা। সুতরাং, এই যুগে এই আধুনিককালের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা দিতে গেলে খাপছাড়া মনে হবে, মনে হবে বিষয়গুলো সাময়িক এবং ইহাই স্বাভাবিক। এই আয়াতের প্রথমেই জুলকারনাইন সেই সম্প্রদায়টিকে সাবধান করে দিয়ে বললেন যে, যে-কেই জুলুম করবে তাকে আমরা শাস্তি দিব। জুলকারনাইন বলছেন, কিছু শাস্তি দেবার প্রশ্নে ‘আমি’ শব্দটি ব্যবহার না করে ‘আমরা’ তথা বহুবচনটি ব্যবহার করা হলো। এই জুলুম বলতে অন্যের উপর জুলুম করাও বোঝায় আবার নিজের নফসের উপর জুলুম করাকেও বোঝায়। এই আয়াতে জুলুম বলতে আপন নফসের উপর জুলুম এবং অপরের উপর দৈহিক জুলুম উভয়টিকেই ধরে নিতে বাধ্য হলাম। কারণ, জুলুম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কিছু বলা হয় নি যে এই জুলুম আপন নফসের বিরুদ্ধে নাকি অন্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে। জুলুম করার ফলে যে-শাস্তিটি দেওয়া হবে সেই শাস্তি কি জেল-জরিমানার শাস্তি নাকি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি – ইহাও উল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং, শাস্তির পরিমাণ কেমন হবে উহা উল্লেখ করা হয় নি।

তারপর বলা হয়েছে যে, এই শাস্তি পাবার পর যে জুলুম করেছে সে একদিন না একদিন মারা যাবে এবং মৃত্যুর পর তার প্রতিপালকের নিকটেও আর একটি শাস্তি অপেক্ষা করছে। প্রতিপালক তথা রবের শাস্তিটি কেমন হবে উহা অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রতিপালকের শাস্তিটি হবে ভয়ানক ঘণিত শাস্তি। এই ‘ভয়ানক ঘণিত শাস্তি’ বলতেই বা কী বোঝায়? ইহা কি সিজিন-এ বন্দি অবস্থায় থাকার শাস্তি নাকি পুনরায় দেহধারণ করে আগমনের শাস্তি? রবের শাস্তিটি তথা প্রতিপালকের শাস্তিটি ভয়ানক এবং ঘণিত শাস্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিছু শাস্তির ধরন-ধারণ সম্পর্কে কোনো কিছু এই আয়াতে উল্লেখ করা হয় নাই। যদি রবের শাস্তিটি তথা প্রতিপালকের শাস্তিটি বলতে জাহান্নামে অবস্থান করার কথাটি বলা হতো তা হলে এতগুলো কথার অবতারণা করতে

হতো না, তাই অনুমানের উপর নির্ভর করেই লিখতে হলো যে, হয়তো এই শাস্তি সিদ্ধি-এ বন্ধি অবস্থায় থাকার শাস্তি, নতুবা দেহ ধারণ করে দুনিয়ার পরীক্ষার দিকে পুনরায় শাস্তির মাঝে পাতিয়ে দেওয়া অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করা। যেহেতু এই তিন শাস্তির একটিও উল্লেখ না করে ভয়ানক শাস্তি অথবা ঘণিত শাস্তির কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে তাই যার-যার দৃষ্টিভঙ্গি ও যার-যার দর্শনের উপর ভিত্তি করেই এই শাস্তির ব্যাখ্যাটি লিখতে গেলে কাহাকেও দোষী অথবা অভিযুক্ত করা যায় না। কারণ, কোরান-এর তফসিরগুলো পড়তে গেলে আমরা দেখতে পাই মহানবির জলিল কদরের একেকজন মহান সাহাবার একেক রকম ব্যাখ্যার বর্ণনা। এই বর্ণনাগুলোর মাঝে প্রায়ই আমরা মিল দেখতে পাই না। সাহাবার নামটি উল্লেখ না করে একটি নমুনা তুলে ধরলাম এই বলে যে, একজন জলিল কদরের সাহাবা বলেছেন যে, গরম পানির মধ্যে সূর্যকে অস্ত্র যেতে দেখতে পেলেন। পক্ষান্তরে আরেক সাহাবা বললেন, মিষ্টি পানির মাঝে অস্ত্র যায়। আবার, আরেক সাহাবা বললেন, কালো মাটির মধ্যে সূর্যটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তুকাহ নামক মহানবির জামানার বিখ্যাত কবি তো লিখেই ফেললেন যে, জুলকারনাইন পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং এই পূর্ব হতে পশ্চিমের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাবার সহায়তা করছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। বিখ্যাত কবি তুকাহ জুলকারনাইনের পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া চাটখানি কথা নয় বলে আল্লাহকে সামনে এনে হাজির করে দিয়ে সুন্দর একটি ভেটো-মারা বয়ান দিয়ে ফেললেন। এইভাবে অনেক রেফারেন্স নীলান তফসির হতে তুলে ধরা যায়, তবে এই সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে পাঠকেরাই আপন-আপনি দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের মাপকাঠি দিয়ে পড়ে নিলেই ভালো হয়। কারণ, সর্বোচ্চ পর্যায়ে কোনো গালি থাকে না, বরং আল্লাহরই লীলাখেলা বলে মনে হয়। এবং কালে-কালে, যুগে-যুগে এই লীলাখেলাগুলোর রূপ ও সৌন্দর্য ভিন্ন-ভিন্নভাবে ফুটে ওঠে।

আটাশি নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা ইমান আনবে অথবা ইমানের কাজ করবে এবং সেই সঙ্গে আমলে সালেহা (সৎকর্ম) করবে তাদের জন্য এই সুসংবাদটি দেওয়া হয়েছে যে, এই ইমান ও আমলে সালেহার বিনিময়ে রয়েছে একটি উত্তম এবং সুন্দর প্রতিদান। এই প্রতিদানটি আল্লাহ 'আমরা'-রূপে তথা বহুবচনটি ব্যবহার করে বলছেন যে, এই উত্তম এবং সুন্দর বিনিময়টি যাতে অচিরেই তথা তাড়াতাড়ি পেতে পারে সে-জন্য তার প্রতিটি কর্ম সহজ করে দেওয়া হবে এবং এই চলার পথটিও অত্যন্ত সহজ করে দেওয়া হবে বলে আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন।

নব্বই নম্বর হতে তিরানব্বই নম্বর আয়াতে যে-সূর্যোদয়ের কথাটি বলা হয়েছে উহা কি আসলেই জাগতিক সূর্য, নাকি আধ্যাত্মিক সূর্য? কারণ, জাগতিক সূর্য ধরে নিলে উহা সর্বপ্রথম উদ্ভূত হয় জাপান নামক দেশ হতে। অথচ জুলকারনাইন দেখতে পেলেন যে সেই সম্প্রদায় তথা কওমের মাঝে এবং সূর্যের মাঝে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করা হয় নাই।

বেষয়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে জাপানের অধিবাসীরা কি আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নে এতই উন্নত যে সূর্য এবং সেই সম্প্রদায়ের মাঝে কোনো অন্তরায় দেখতে পেলেন না? আসলে, আমার মনে হয়, উহা আধ্যাত্মিক সূর্য। এই আধ্যাত্মিক সূর্যটিকে আমি অধম লিখক যেহেতু মুসলমান সেই হেতু উহাকে নুরে মুহাম্মদি-রূপী সূর্য বলতে চাই। অন্যান্য ধর্মের যারা প্রবর্তক তাঁদের অনুসারীরা যদি প্রবর্তকের নামে এই রকম কিছু একটা বলতে চায় তা হলে আমারি বলার কিছু থাকে না। কারণ, কারও ধর্মের উপরেই বলপ্রয়োগ করা যায় না এবং বলপ্রয়োগের প্রশ্নটি ওঠাই অবাস্তব। সুতরাং, নুরে মুহাম্মদি-রূপী সূর্যটি, যাহা মানবের মনে অস্তমিত হয়, সেইখানে গিয়ে অস্তমিত হবার আসল কারণটি জুলকারনাইন অনুধাবন করলেন। এবং উহার প্রতিকারের ব্যবস্থাটি করে দেবার পর তিনি উহার উল্টো

দিকে তথা বিপরীত দিকে সূর্য-উদয়ের দেশটি পরিদর্শন করতে গেলেন। সেখানে গিয়ে জুলকারনাইন দেখতে পেলেন যে, ওই নুরে মুহাম্মদি-রূপী সূর্যটি এমন একটি সম্প্রদায়ের উপর উদ্ভিত হয় যাদের উপর আল্লাহর বিশেষ রহমতে উদয়ের পথে তাদের মনের মাঝে কোনো প্রকার প্রাচীর আল্লাহ রাখেন নাই। ইমানের নুরে নুরময় এরূপ একটি সম্প্রদায়কে দেখতে পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, ওই ভাবেই তো আছে। ইহার অর্থটি হলো, ওই সম্প্রদায়ের উপর নুরে মুহাম্মদির নুরময় বিকাশটি যে-রকম তাদের মাঝে থাকা সম্মাচীন উহা ঠিক তেমনই আছে। জীবনের প্রথম হতে যৌবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ইমান ও আমলে সালেহার অনুশীলন না করতে পারলে মানব-মনে ধীরে-ধীরে দুনিয়ার প্রতি লোভ, মোহ ও মায়ার আবরণ, যাকে আমরা খান্নাস-রূপী শয়তান বলে থাকি, উহা শক্ত হয়ে যায় এবং নুরে মুহাম্মদি নামক সূর্যের উদয়টিকে বাধাগ্রস্ত করে ফেলে। ইহাই তো আল্লাহর সৃষ্ট বিধিবিধান, যাহা পরিবর্তন হয় কি না জানি না। তবে এটুকু জানি যে, সুন্নাতাল্লাহি না তাবদিল - তথা, আল্লাহর সন্নত কখনোই বদল হয় না।

এখানে জুলকারনাইন আধ্যাত্মিক জগতের উন্নয়নের প্রশ্নে কতটুকু উন্নত হওয়া গেছে উহারই সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান মানদণ্ড। জুলকারনাইনের জ্ঞান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাঝেই পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। সুতরাং, জুলকারনাইন আধ্যাত্মিক জগতের মানদণ্ড। অবশেষে জুলকারনাইন বিপরীত আরেকটি অবস্থার দিকে মনোযোগ দিলেন। দেয়াল তথা প্রাচীর কথাটি দিয়ে এখানে ধার্মিকতার সীমাটি বোঝানো হয়েছে। ভালো এবং মন্দ এই দুয়ের মাঝের লোকেরা ধর্ম বিষয়টি জ্ঞানবার পরেও উহার অনুসারী হতে পারে না। মায়ার বন্ধন তথা খান্নাসের বিভিন্ন কুমন্ত্রণার কারণে ধর্মটিকে তাদের নিজস্ব প্রবৃত্তি দিয়ে মনগড়া রূপের মাঝে নিয়ে আসে এবং নিছক প্রবৃত্তিপ্ৰসূত মনগড়া কতগুলো অনুষ্ঠানের নীতির মধ্যে বেঁধে ফেলা হয়। এদের ধর্মটি থাকে বটে, কিন্তু মূল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে উদ্দেশ্যবিহীন কতগুলো নীতি আর আদর্শের ভেলকি দেখিয়ে অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মটিকে সম্প্রদায়ের কাছে তথা কওমের কাছে তথা একটি জাতির কাছে তথা অনেক লোকের কাছে দাঁড় করিয়ে দেয়।

৯৪. কাল (তাহারা [কওম] বলিল) ইয়া (হে, ওহে) জুলকারনাইন (জুলকারনাইন) ইননা (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে) ইয়াজ্জা (ইয়াজ্জ) ওয়া (এবং, আর, ও) মাজ্জা (মাজ্জ) মুফসিদুনা (অনেক্য সৃষ্টিকারী, দুষ্ট সৃষ্টিকারী, যারা দুষ্ট সৃষ্টি করে, দুষ্টকৃতকারী, বিধ্বংসী, ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী, অমঙ্গল সৃষ্টিকারী, ক্ষত সৃষ্টিকারী, ক্ষতিকর, বামেলা সৃষ্টিকারী, ঝগাট সৃষ্টিকারী, জ্বালাতনকারী, অশান্তি সৃষ্টিকারী) ফিল (মধ্যে) আরদি (জমিন, পৃথিবী, মাটি, দেহ) ফাহাল (সুতরাং কি?, অতএব কি?, কাজেই কি?, অগত্যা কি?) নাজ্জালু (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] দিব) লাকা (তোমার জন্য) খারজান (কর, ট্যাক্স, খাজনা) আলা (উপর) আন (যে, এই যে, হইতে, বিষয়ে, সম্পর্কে) তাজ্জালা (তুমি বানাইবে, তুমি করিবে) বাইনানা (আমাদের মধ্যে) ওয়া (এবং, আর, ও) বাইনাহম (তাহাদের মধ্যে) সাদদান (দেওয়াল, প্রাচীর)।

প্ট তাহারা (কওম) বলিল, হে জুলকারনাইন, নিশ্চয়ই ইয়াজ্জ এবং মাজ্জ ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী - পৃথিবীর মধ্যে, সুতরাং কি আপনার জন্য আমরা কর দিব (এই) বিষয়ের উপর, আপনি বানাইবেন আমাদের মধ্যে এবং তাহাদের মধ্যে প্রাচীর?

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে সেই সম্প্রদায়টি জুলকারনাইনের কাছে এই বলে ফরিয়াদ করল যে, নিশ্চয়ই ইয়াজ্জ এবং মাজ্জ পৃথিবীর বুকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করছে। এখন, এই ইয়াজ্জ এবং মাজ্জ বলতে কী বোঝায় উহারই সামান্য ব্যাখ্যা দিতে চাই। অধ্যাত্মবাদের বিষয়টি যখন পৃথিবী হতে ধীরে-ধীরে

হারিয়ে যেতে থাকে তখন কলুষিত বস্তুবাদ অনেক বেশি প্রকট হয়ে প্রকাশ পায় এবং মানুষেরা সেই কলুষিত বস্তুবাদের দিকে দলে-দলে ছুটে যেতে থাকে এবং অবশেষে শাসকরূপে এরাই পৃথিবীর সর্বসর্বা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই কলুষিত, এই মোহনীয় বস্তুবাদের মায়ার বলসানি দেখে পৃথিবীর লোকেরা বিরাট উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে এই ইয়াজুজ-মাজুজদেরকে সম্মুখীন দিতে ছুটে আসে। এই ইয়াজুজ-মাজুজ অন্য কোনো প্রাণী নয়। কারণ, পৃথিবীর আর কোনো প্রাণীকেই সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দেওয়া হয় নাই। সুতরাং, পৃথিবীর সব কিছু তোহিদে বাস করে, কেবলমাত্র জিন এবং মানুষ ছাড়া। কারণ, এই দুটো প্রাণীকেই সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, মানুষ ছাড়া যারা ইয়াজুজ আর মাজুজের খবর নিতে এবং গবেষণা করতে ব্যস্ত থাকেন তাদের হয়তো জানা নাই যে, জিন এবং মানুষই তোহিদ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে শেরেকের মধ্যে ডুবে থাকে। এই শেরেক একটি ভয়ানক পাপ। আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে মিশে থাকা অপবিত্র খান্নাসটির কত রকম, কত ধরনের কুমন্ত্রণার জাল বিস্তার করে কলুষিত বস্তুবাদের মায়ার বন্ধনের দিকে ধাবিত করার জঘন্য প্রচেষ্টায় দলে-দলে মানুষেরা অধ্যাত্মবাদের আসল রহস্যটিকে ফেলে দিয়ে ললিপপ চোষার মতো কলুষিত বস্তুবাদের নেতা নামক ইয়াজুজ-মাজুজের দিকে দলে-দলে ভেড়ার পালের মতো ছুটে আসে। তাই সেই বিশেষ কণ্ঠস্বরটি এই পাপের পঙ্কিলতাটি বুঝতে পেরে জুলকারনাইনকে গুরুদক্ষিণা দেবার কথাটি জানিয়ে দিলেন, যেটা কোরান-এর ভাষায় কর, খাজনা অথবা ট্যাক্স নামে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই জাগ্রত কণ্ঠস্বর গুরু-দক্ষিণার মাধ্যমে জুলকারনাইনকে সবিনয়ে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, আমাদের এবং তাদের মধ্যে আপনি একটি দেয়াল তথা প্রাচীর তৈরি করে দেবেন কি?

৯৫. কাল (জুলকারনাইন) বলিলেন) মা (না, কি, যে, যাহা, নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত, যদি) মোককান্নি (আমাকে মর্যাদা দিয়াছেন, আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, আমাকে শক্তিশালী করিয়াছেন, আমাকে দৃঢ় করিয়াছেন, আমাকে ক্ষমতাবান করিয়াছেন, আমাকে প্রভাবশালী করিয়াছেন, আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন) ফিহি (ইহার মধ্যে) রাব্বি (আমার রব, আমার প্রতিপালক, আমার সদাপ্রভু) খাইরু (উত্তম, অতিশয় ভালো, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ) ফাআইনুনি (সুতরাং তোমরা সাহায্য করো আমাকে) বিকুওয়াতিন্ (শক্তি দিয়া) আজ্জাল্ (আমি বানাইয়া দিব, আমি তৈরি করিয়া দিব, আমি গড়িয়া দিব, আমি নির্মাণ করিব) বাইনাকুম্ (তোমাদের মধ্যে, তোমাদের মাঝে) ওয়া (এবং) বাইনাহুম্ (তাহাদের মধ্যে, তাহাদের মাঝে) রাদ্মান্ (দেয়াল, প্রাচীর, বাধ)।

প্ট (জুলকারনাইন) বলিলেন, আমার রব ইহার মধ্যে যে আমাকে শক্তিশালী করিয়াছেন (উহা) উত্তম, সুতরাং তোমরা সাহায্য করো আমাকে শক্তি দিয়া, আমি তৈরি করিয়া দিব তোমাদের মধ্যে এবং তাহাদের মধ্যে প্রাচীর।

৯৬. আতুনি (আমাকে আনিয়া দাও) জুব্বারাল্ (পাতসমূহ, ফলকসমূহ, টুকরাগুলি) হাদিদি (লোহা, লৌহ)।

প্ট আমাকে আনিয়া দাও লোহার পাতসমূহ।

+ হাততা (যতক্ষণ পর্যন্ত, যে পর্যন্ত, যখন) ইজ্জা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) সাওয়া (সম্মান) বাইনা (মধ্যে, মাঝে) সদাফাইনি (দুই দেয়ালের, দুই প্রাচীরের, পাহাড়ের দুই ফাঁক, পাহাড়ের দুই কিনারা) কালি (জুলকারনাইন) বলিলেন) আনফুখু (তোমরা ফুঁ দাও, তোমরা ফুৎকার করিতে থাকো, তোমরা তাপ দাও, তোমরা দহন দাও)।

প্ট যতক্ষণ পর্যন্ত সম্মান (না হয়) ওই সময় (পর্যন্ত) দুই প্রাচীরের (পাহাড়) মধ্যে, (জুলকারনাইন) বলিলেন, তোমরা ফুৎকার দিতে থাকো।

+ হাতত (যতক্ষণ পর্যন্ত, যে পর্যন্ত, যখন) ইচ্ছা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) জাআলাহ (সে তাহা করিল, সে তাহা করিয়া ফেলিল) নারান্ (আপ্তন) কাল (জুলকারনাইন) বলিলেন) আতনি (আম্মাকে আনিয়া দাও, আমার কাছে আনি) উফরিগ (আমি ঢালিয়া দিব) আলাইহি (ইহার উপর) কিতরান্ (গলিত তাম্বা)।

স্ট (জুলকারনাইন) বলিলেন, আম্মাকে আনিয়া দাও ইহার উপর আমি ঢালিয়া দিব গলিত তাম্বা।

৯৭. ফাম্মাস্ (সুতরাং না) তায়ার্ট (তাহারা করিয়াছে) আন (যে, এই যে, হইতে) ইয়াজ্জাহুই (তাহারা আরোহণ করিতে পারে, তাহারা শক্তি পাইবে, তাহারা অতিক্রম করিবে, তাহারা জয়ী হইবে) ওয়া (এবং) মা (না) ইস্তাতাউ (তাহারা করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা হইয়াছে, করিতে পারে) লাহ (তাহার, তাহার জন্য) নাক্বান (সুড়ঙ্গ, ফাটল, ছিদ্র, ফুটা, গর্ত, খনন, কোটর, গুহা)।

স্ট সুতরাং তাহারা করিতে পারিবে না যে তাহারা আরোহণ করে এবং তাহারা করিতে পারিবে না তাহার জন্য সুড়ঙ্গ।

১ ব্যাখ্যা : এই তিনটি আয়াতের প্রথমেই জুলকারনাইন বলিলেন যে, আমার রব তথা আমার প্রতিপালক আম্মাকে শক্তিশালী করেছেন এবং ক্ষমতাবান করেছেন - ওটাই আমার জন্য যথেষ্ট মনে করি। এখানে একটু খেয়াল করুন, বলা হয়েছে 'আম্মার রব' তথা আমার প্রতিপালক, কিন্তু আম্মাদের প্রতিপালক অথবা তোমাদের প্রতিপালক কথাটি বলা হয় নাই। কারণ, রবরূপে তথা প্রতিপালকরূপে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ আছেন বা থাকেন বলেই এখানে 'আম্মার রব' বলা হয়েছে। কারণ, জুলকারনাইন আধ্যাত্মিক শক্তিতে এতই উচুতে অবস্থান করছেন যে সেই মর্যাদার অবস্থানটি আপন রবকে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞাত করেই অর্জন করা যায়। তাই তিনি সম্প্রদায়টিকে উদ্দেশ্য করে বলিলেন যে, আম্মার রবের দানই যথেষ্ট, তোমাদের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক সহযোগিতা চাইবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং, তোমরা তথা সম্প্রদায়ের লোকেরা যদি

একান্তই সাহায্য করতে চাও তা হলে আম্মাকে শ্রমশক্তি দিয়ে সাহায্য করতে পারো আমি যাতে তোমাদের ও তাদের মাঝখানে একটি দেয়াল তথা প্রাচীর তৈরি করতে পারি। এখানে একটু খেয়াল করে দেখুন যে, জুলকারনাইন ধন-সম্পদের সাহায্যটি চান নি, কারণ ধন-সম্পদের শক্তি দিয়ে আধ্যাত্মিক রাজ্যের গোপন রহস্যগুলো অর্জন করা যায় না, বরং যারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে অগ্রসর হবার পথে ইচ্ছা রাখে তাদের জন্য প্রয়োজন হয় ধৈর্য এবং মনোবল। এই ধৈর্য আর মনোবল নিয়ে যদি তোমরা আম্মাকে গুরুরূপে মেনে নিতে পারো তা হলে এমন একটি শক্তিশালী দেয়াল তৈরি করে দেব যে-দেয়াল ভেদ করে মোহনীয় এবং কলুষিত বস্তুবাদী শক্তি তোমাদেরকে কখনোই পরাস্ত করতে পারবে না। যদিও বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদ দুটো বিপরীতধর্মী, তবু এই দুটোর মিলনেই মানব-জীবন গঠিত হয়। বস্তু কখনোই মন্দ বিষয় নয়। কারণ, বস্তু তোহিদে বাস করে এবং আল্লাহর জিকিরে লিপ্ত থাকতে একান্ত বাধ্য থাকে, কারণ বস্তুর কোনো স্বাধীনতা নাই। কিন্তু মানুষের মনের মোহ-মায়ী যখন সেই বস্তুটির উপর পতিত হয় তথা এক কথায় বস্তুর উপর মোহ-মায়ার কামনাটি আরোপিত হয় তখনই বস্তুটি হয়ে যায় কলুষিত বস্তুবাদ, ঘৃণিত বস্তুবাদ এবং জঘন্য বস্তুবাদ। কারণ, আপন রবের উপর নির্ভরতার ধৈর্য ও মনোবলটি তখন হারিয়ে যেতে থাকে এবং মানুষ এই কলুষিত বস্তুবাদের দিকে ঝাঁকে-ঝাঁকে ভেড়ার পালের মতো অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এই কলুষিত, এই ঘৃণিত, এই জঘন্য বস্তুবাদটিকেই রূপক ভাষায় ইয়াজ্জ-মাজ্জ বলা হয়েছে। আর ইহাই বুঝতে না পেরে কত রকম কথার ধানাই-পানাই দিয়ে বড়-বড় তফসির লিখে সরিল-সহজ কাচা-গলা মোমের মতো মানুষগুলোকে বিভ্রান্তির দিকে টেনে

নিয়ে যাচ্ছে এবং বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাটি দেখে জুলকারনাইন লোহখণ্ড আনতে বললেন এবং সেই লোহখণ্ডের মধ্যে সেই সম্প্রদায়টিকে একাগ্রচিত্তে ধৈর্যধারণ করে অবিরত ফুৎকার দেবার উপদেশটি দিলেন যাতে এই ফুৎকারের মাধ্যমে লোহখণ্ডগুলো আগুনে পরিণত হয়ে যায় তথা গলে যায়। অবির, জুলকারনাইন বলছেন যে, আমার কাছে গলিত তাম্রা নিয়ে আস, আমি মোহ-মীয়ায় জড়িত কলুষিত বস্তুবাদের হিদ্রপুলোকে গলিত তাম্রা দিয়ে বন্ধ করে দেই। মোট কথা হলো, সেই সম্প্রদায়টিকে মহাপুরু জুলকারনাইন আধ্যাত্মিক রাজ্যে কেমন করে প্রবেশ করতে হবে তারই ব্যাখ্যা-বিশেষণ সম্পূর্ণ রূপক ভাষায় বর্ণনা করে দিচ্ছেন। এখানে লক্ষ করার বিষয়টি হলো, সম্প্রদায়টিকে গলিত তাম্রা দিয়ে কলুষিত বস্তুবাদের হিদ্রপুলোকে বন্ধ করতে না বলে তিনি তার রবের বিশেষ অনুগ্রহ পেয়ে বন্ধ করে দেবার ঘোষণাটি করলেন। এখানে এই সম্প্রদায়টি হলো জুলকারনাইনের মুরিদ আর জুলকারনাইন হলেন মহাপুরু তথা গাউসুল আজম। এই নোংরা, এই কলুষিত বস্তুবাদের পূজাকেই বলা হয় শেরেকের পূজা। এই জাতীয় শেরেক হতে মুক্তি দেবার জন্যই যুগে-যুগে, কালে-কালে মহাপুরু জুলকারনাইনের মতো মূনি-খাম্বি-সাধু-সন্ত-ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফদের আগমন হয়। অবির দুঃখের বিষয় হলো, এই জাতীয় মহাপুরুদের সঙ্গে পাশাপাশি নকল গুরুদের উড়ং-চড়ং এমন নিখুঁতভাবে দেখতে পাই যে তারা তো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই ডুবে আছে। এই আসল গুরু আর নকল গুরুর পার্থক্যটি বোঝা এই আধুনিক যুগে আরও বেশি কষ্টের বিষয়। দেখে মনে হয়, গুরুটি আচার-অনুষ্ঠানের সব কিছু পালন করছে, তথা দেখতে একদম ফিটফাট, কিন্তু একটু ধৈর্য, একটু মনোবল, একটু নিরপেক্ষতা, একটু জ্ঞান-গবেষণা, একটু জিজ্ঞাসার গবেষণায় ডুবে থাকতে পারলে আসল আর নকল চিনতে খুব বেশি একটা বেগ পেতে হয় না। তবে তকদিরে লিখা থাকলে পাবেন, অন্যথায় হাজার মাথা কুটলেও পাবেন না। ইহাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের লীলাখেলা। সবাই যদি একই আদর্শের অনুসারী হয়ে পড়েন তা হলে আল্লাহর লীলাখেলার সৌন্দর্যটি কেমন রূপ ধারণ করবে অধম লেখকের তা জানা নাই। পরিশেষে, পাঠকদেরকে অনুরোধ করতে চাই এই বলে যে, শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি-রচিত কোরান দর্শন নামক কোরান তফসিরের তিনটি খণ্ড সংগ্রহ করে পড়ুন। হয়তো বিবেকের ধাক্কায় একটি ঝাঁকুনি খেয়ে সত্যকে আলিঙ্গন করার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হতে পারেন।

৯৮. কালা ([জুলকারনাইন] বলিলেন) হাজা (ইহা, এই, এইটি, এইজন, ইনি) রাহমাতুন (রহমত, অনুগ্রহ, দয়া, মেহেরবানি, করুণা, অনুকম্পা) মিন (হইতে) রাব্বি (আমার রবের, আমার প্রতিপালকের, আমার সদাপ্রভুর)।

প্ট (জুলকারনাইন) বলিলেন, ইহা আমার রবের রহমত।

+ ফাইজা (সূতরাং যখন) জায়া (আসিবে) ওয়াদু (ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, শপথ, সংকল্প) রাব্বি (আমার রবের) জাআলাহ (তিনি তাহা করিলেন, তিনি তাহা করিয়া ফেলিলেন, তিনি তাহা করিয়া দিবেন) দাককাআ (ভাঙিয়া ফেলা, চূর্ণ করা, ধ্বংস করা)।

প্ট সূতরাং আমার রবের ওয়াদা আসিবে, তিনি তাহা ধ্বংস করিয়া দিবেন।

+ ওয়া (এবং) কানা (হয়, ছিল, ঘটে) ওয়াদু (ওয়াদা) রাব্বি (আমার রবের, আমার প্রতিপালকের, আমার সদাপ্রভুর) হীক্কান (হক, সত্য, সঠিক, বাস্তবিকই, সত্যসত্যই, প্রকৃতই, আসলেই)।

প্ট এবং আমার রবের ওয়াদা হইল সত্য।

৯৯. ওয়া (এবং) তারাকনা (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] ছাড়িয়া দিব) বাদাহম (তাহাদের কেহ কেহ) ইয়াওমায়িজিন (সেই দিন) ইয়ামুজ (তরঙ্গের মতো পতিত হইবে, ঢেউ খেলবে, ইহা তরঙ্গায়িত করে) ফি (মধ্যে) বাদিন

(কতকের, একেঅন্যের, একদল আরেক দলের উপর) ওয়া (এবং) নুফিখা (ফুঁ দেওয়া হইবে, ফুৎকার করা হইবে) ফি (মধ্যে) সুরে (সিঙ্গা) ফাজ্জামানাহুন্নী (সুতরাং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাদেরকে একত্রিত করিব) জাম্মআন (একসঙ্গে, একত্রে, সমবেতভাবে)।

প্ট এবং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] ছাড়িয়া দিব তাহাদের কেহ কেহ সেই দিন চেউয়ের মতো পতিত হইবে কতকের মধ্যে এবং ফুৎকার করা হইবে সিঙ্গার মধ্যে সুতরাং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাদিগকে একত্রিত করিব সমবেতভাবে।

১০০. ওয়া (এবং) আরাদনা (আমরা উপস্থিত করিলাম, আমরা পেশ করিলাম) জাহান্নামা (জাহান্নামকে, দোজখের একটি স্তরকে) ইয়াওমায়িজিল (সেই দিন, সেই ক্ষণে) লিল্কাফিরিনা (কাকেরদের জন্য) আরাদা (উপস্থিত করা, পেশ করা)।

প্ট এবং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] উপস্থিত করিব দোজখের একটি স্তরকে সেই দিন কাকেরদের জন্য উপস্থিত করার (মতো)।

১০১. লিল্লাজিনা (যাহারা, যাহাদের) কানাত্ (ছিল) আইয়ুহুন্নু (তাহাদের চোখগুলির) ফি (মধ্যে) গিতায়িন (পরদা, যবনিকা, আবরণ, ঘোমটা, অবগুষ্ঠন, বোরখা, ছদ্মবেশ) আন (যে, এই যে, হইতে, বিষয়ে, সম্পর্কে) জিকরি (আমার জিকির, আমার স্মরণ, আমার উপদেশ, আমার বয়ান, আমার আলোচনা, আমার উপদেশ, আমার যোগাযোগের, আমার সংযোগের বিষয়) ওয়া (এবং) কানু (তাহারা ছিল) না (না) ইয়াস্তাতিউনা (তাহাদের ক্ষমতা আছে, সক্ষম) সাম্মআন (গুনিতে, শ্রবণ করিতে)।

প্ট যাহাদের চোখগুলির মধ্যে ছিল পরদা আমার জিকির হইতে এবং তাহারা ছিল না শ্রবণ করিতে সক্ষম।

১ ব্যাখ্যা : এই আটানকাই হতে একশো এক নব্বুর আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্রথমেই বলছি যে, জুলকারনাইনের বিষয়টি অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে জড়িত। কারণ, জুলকারনাইনের জাম্মানায় এমন কোনো দুর্গম প্রাচীর বানাবার বাস্তব দৃষ্টান্তটি দেখতে পাই না। তা ছাড়া এমন সুউচ্চ প্রাচীর বানানোর কথা বলা হয়েছে যে-প্রাচীর ভিঙানো সহজ কথা নয়। এই জাতীয় প্রাচীর পৃথিবীর কোথাও আছে কি না আমার জ্ঞান নাই। তবে যিশুখ্রিস্টের জন্মের অনেক আগে চীনের যে সুউচ্চ বিশাল প্রাচীরটি বানানো হয়েছিল উহার অস্তিত্ব এখনও দেখতে পাই এবং এই জাতীয় প্রাচীর ভিঙানোটি তেমন কোনো কঠিন বিষয় নয়। এই আধুনিক যুগে কত উচু-উচু পর্বতশ্রেণী আরোহণ করার খবরগুলো আমরা জানতে পারি এবং এই পর্বতশ্রেণীগুলো এতই উচুতে অবস্থান করছে যে অক্সিজেনের বাক্স সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়। আমি এই জন্যই একথাগুলোর অবতারণা করলাম যে, জুলকারনাইনের যে-প্রাচীরটি বানানোর কথা বলা হয়েছে উহা কলুষিত বস্তুমোহের অধীনতা হতে কেমন করে মুক্ত হওয়া যায় সেই মুক্তির প্রাচীর। আল্লাহর ওলিরা আপন নফস হতে খান্নাসরুপী শয়তানের দেওয়া কুমন্ত্রণার মোহ-মায়া হতে মুক্ত হয়ে থাকে। এবং এই আল্লাহর ওলিরাই মুক্তি পাবার প্রশ্নে খান্নাসের কুমন্ত্রণায় বানানো মোহ-মায়ার উপর কেমন করে প্রাচীর তথা দেয়াল তৈরি করা যায় উহাই শিক্ষা দিয়ে থাকেন। জুলকারনাইন একজন মহাপুরুষ। তাই তিনি একটি সম্প্রদায়কে খান্নাসের কুমন্ত্রণায় দেওয়া মোহ-মায়ার প্রাচীর এবং সেই প্রাচীরের ফুটোগুলোকে বন্ধ করে দেবার জন্য শক্ত তাম্বাকে অনবরত ফুৎকার দিতে-দিতে তথা আল্লাহর জিকির-ফিকিরে ধ্যানস্থ হয়ে থেকে গলানো যায় এবং সেই গলানো তাম্বা দিয়ে কেমন করে ছিদ্রগুলো বন্ধ করা যায় উহারই শিক্ষা দিয়েছেন। এই বাধ রচনা করে জুলকারনাইন একটি সম্প্রদায়কে রহমত দান

করলেন। যতদিন পার্থিব এবং বৈষয়িক জীবনযাপন করতে হয় ততদিন মুক্তির দিশারি এই প্রাচীরের প্রয়োজন থাকে।

কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। এই কেয়ামত দুই প্রকার : একটি কেয়ামতে কবির তথা বড় কেয়ামত এবং অপরটি কেয়ামতে সগিরা তথা ছোট কেয়ামত। একজন মানুষের মৃত্যু-ঘটনাটিও একটি কেয়ামত, তবে ইহা ছোট কেয়ামত তথা কেয়ামতে সগিরা। এই কেয়ামতে সগিরা যখন এসে পড়ে তথা আগমন হয় তখন এই প্রাচীরের আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। আবার, মৃত্যু-ঘটনাটি দুই প্রকার : একটি স্বাভাবিক মৃত্যু, অপরটি মরার আগে মরে যিওঁয়ার মৃত্যু তথা মৃত কাবলা আনতামত। আল্লাহর ওলিরা মরার আগেই মারা যায় বলেই আল্লাহর বন্ধু তথা ওলি বলা হয়।

তারপর বলা হয়েছে, যারা এই প্রাচীরের আশ্রয় না নেবে তাদেরকে জাহান্নামেই ফেলে রাখা হবে। যারা খান্নাসের মোহ-মায়ায় জড়িয়ে আছে তাদের কথা, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের দর্শনে কোনো মিল পাওয়া যায় না, বরং মতভেদের ঢেউ তুলতে থাকে এবং এই ঢেউ খেলার মাঝে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তপ্তির ঢেঁকুর তুলবে। কিন্তু, পরিশেষে যখন সিস্কাই ফুৎকার দেওয়া হবে তথা মৃত্যু-ঘটনার মুখোমুখি হবে তখন সব কিছুর অবসান হয়ে যাবে। দুনিয়ার এই লোভনীয়, এই মোহনীয় আকর্ষণের সঙ্গে আপন নফসের সঙ্গে বাসি করা খান্নাসরূপী শয়তানটির কুমন্ত্রণা মিশে গিয়ে সোনায় সোহাগায় পরিণত হয়। তখন একটি মানুষ দুনিয়ার লোভ-মোহের মাঝে এমনভাবে ডুবে যায় যে অন্য কিছু একটা ভালো চিন্তার দর্শন মনের মাঝে প্রবেশ করা তো দূরে থাক, সামান্য একটা ধাক্কাও দিতে পারে না। এখানে সিস্কাই ফুৎকার দেওয়া বলতে দেহের মধ্যে মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়াকে বোঝায়। কোরান-এর সবখানেই মানবদেহটিকে সিস্কা বলা হয়েছে। মৃত্যু-ঘটনার সময় এই দেহ হতে নফসের (রুহের নয়) বিদায়ের জন্য বিচ্ছেদের যে ভয়ানক তুফান উড়তে থাকে তাকেই সিস্কাই ফুৎকার দেওয়া বলা হয়েছে।

পরিশেষে, যারা আল্লাহর ওলিদের সঙ্গে না থেকে এবং আল্লাহর ওলিদের কথাগুলো না শুনে মোহ-মায়ার দুনিয়ায় ডুবে থাকে, তারা মৃত্যু-ঘটনা ঘটে যাবার পরপরই দেখতে পায় কার্ফেরের খাতিয় তাদের নাম লেখা হয়ে গেছে এবং ঠিকানাটির নামও উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ঠিকানার নাম দুঃখজনক বেদনাদায়ক জাহান্নাম। দুনিয়ার মোহ-মায়ার প্রতি এদের প্রচণ্ড আকর্ষণের দরুন চোখ দুটো সত্যসন্ধীন হতে বিরত থেকে অন্ধ অবস্থায় ছিল এবং কান দুটো বধির ছিল। এই চোখের অন্ধতা, এই কানের বধিরতা আধ্যাত্মিক জগতের দিকে অগ্রসর হবার বধিরতা। তা না হলে দুনিয়ার মোহ-মায়ার হিসাবগুলো এরা পাই-টু-পাই আনু হিসাবীর মতো বুঝে নিতে পারে।

পরিশেষে, এই বলে শেষ করতে চাই যে, এই লোভ-মোহ-মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে অন্ধ আর বধির না হলে আল্লাহর লীলাখেলার একটি বিরাট রহস্য উপলব্ধি করা যেত। সুতরাং, চরম সত্যে আল্লাহর ওলিরা আগমন করে একদম নীরব হয়ে যান এবং বোবার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। যদি ইবলিস আদমকে সেজদা দিয়ে দিত, তা হলে কী হতো? যদি সত্যদ্রুতা আদম, যার মধ্যে নুরে মুহাম্মদি মণ্ডুদ আছে, তিনি যদি নিষিদ্ধ বৃক্ষের আশ্বাদনটি নিতে অস্বীকার করতেন, তা হলে কী হতো? পাঠক বাবা-মায়াদেরকে বলছি, অধম লেখকের এই বিষয়ে জানা নেই। তবে, এই কথাটুকু সামান্য হলেও হয়তো বুঝতে পেরেছি যে, যার পীর নেই নিঃসন্দেহে তার পীর হলো শয়তান।

১০২. আফাহাসিবা (সুতরাং ধারণা করিয়াছে কি?, সুতরাং মনে করিয়াছে কি?) আল্লাজিনা (যাহারা) কাফার (কুফরি করিয়াছে, অস্বীকার করিয়াছে, অবিশ্বাস করিয়াছে) আন (যে, এই যে, ইহাতে, বিষয়ে, সম্পর্কে) ইয়াততাখিজু (গ্রহণ করিয়াছে, গ্রহণ করিবে, ধরিয়া লইবে) ইবাদি (আম্মার বান্দাদেরকে)

মিনুদুনি (আম্মাকে ছাড়া, আম্মাকে ব্যতীত) আউলিয়াআ (অভিভাবক, বন্ধু, সঙ্গী, সাহায্যকারী, অনুগ্রহকারী, রক্ষাকর্তা)।

সুতরাং মনে করিয়াছে কি, যাহারা কুফরি করিয়াছে, যে (তাহারা) গ্রহণ করিবে আম্মার বান্দাদের আম্মাকে ছাড়িয়া অভিভাবক।

+ ইননা (নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে]) আতাদনা (আমরা তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি, আমরা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি) জাহান্নাম (জাহান্নাম, দোজখের একটি স্তর) লিল্ কাফিরিনা (কাফেরদের জন্য, অবিশ্বাসীদের জন্য, অস্বীকারকারীদের জন্য) নুজুলান্ (আবাস, বাড়ি, অভয়না, আতিথ্যভূমি, আপ্যায়ন, মেহমানদারি)।

সুতরাং নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তৈরি করিয়া রাখিয়াছি জাহান্নাম কাফেরদের জন্য আবাস (হিসাবে)।

১০৩. কুল (বলুন [জুলকারনাইন]) হাল্ (কি) নুনাববিউকুম্ (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] খবর দিব তোমাদেরকে) বিন্ আখসারিনা (কতিপয়দের সম্পর্কে) আম্মালান্ (আম্মলসমূহ, কর্মসমূহ)।

সুতরাং বলুন (জুলকারনাইন) আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] কি খবর দিব তোমাদেরকে কতিপয়দের আম্মলসমূহ?

১০৪. আললাজিনা (যাহারা, যাহাদের) দাল্লা (পথহারা, বিভ্রান্ত, সঠিক রাস্তা হারাইয়া ফেলিয়াছে, বিপথগামী) সাইউহুম্ (তাহাদের প্রচেষ্টা, তাহাদের চেষ্টা, তাহাদের দৌড়) ফিল্ (মধ্যে) হায়াতি (জীবনের) দুনিয়া (দুনিয়া) ওয়া (এবং) হুম্ (তাহারা) ইয়াহসাবুনা (ধারণা করে, মনে করে) আনিনাহুম্ (যে তাহারা) ইউহসিনুনা (ভালো, উত্তম করিয়াছে) সুনআন (কর্ম, কাজ)।

সুতরাং যাহারা পর্যবেক্ষিত হইয়াছে তাহাদের প্রচেষ্টা দুনিয়ার জীবনের মধ্যে এবং তাহারা মনে করে যে তাহারা ভালো কাজ করিয়াছে।

১০৫. উলাইকাল্লাজিনা (উহারাই তাহারা, ওইসব লোক যাহারা) কাফারু (কুফরি করিয়াছে, অস্বীকার করিয়াছে, চাকিয়া রাখিয়াছে) বিআয়াতি (আয়াতসমূহের সহিত, নিদর্শনসমূহের সহিত) রাব্বিহিম্ (তাহাদের রবের, তাহাদের প্রতিপালকের) ওয়া (এবং) লিকায়িহি (তাহার সাক্ষাৎ, তাহার মোলাকাত) ফাহাবিতাত্ (সুতরাং নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নষ্ট হইয়াছে) আম্মালুহুম্ (তাহাদের আম্মলগুলি, তাহাদের কর্মগুলি, তাহাদের কাজগুলি) ফালা (সুতরাং না) নুকিমু (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] কয়েম করিব, আমরা সাধী করিব, আমরা স্থাপন করিব, আমরা প্রতিষ্ঠা করিব) লাহুম্ (তাহাদের জন্য) ইয়াওমাল্ (দিনে) কিয়ামতি (কেয়ামতের) ওয়াজ্জান্ (পরিমাপ, ওজন)।

সুতরাং উহারাই যাহারা কুফরি করিয়াছে তাহাদের রবের আয়াতসমূহের সহিত এবং তাহার সাক্ষাৎ – সুতরাং নিষ্ফল হইয়াছে তাহাদের আম্মলগুলি এবং আমরা কয়েম করিব না তাহাদের জন্য কেয়ামতের দিনে ওজন।

১০৬. জালিকা (উহাই) জাজাউহুম্ (তাহাদের পারিশ্রমিক, তাহাদের প্রতিফল, তাহাদের বিনিময়) জাহান্নাম (জাহান্নাম, দোজখের একটি স্তর) বিন্না (যাহা, ওই বস্তু হইতে) কাফারু (কুফরি করিয়াছে, অস্বীকার করিয়াছে, অবিশ্বাস করিয়াছে) ওয়া (এবং) ইত্তাখাজু (গ্রহণ করিয়াছে, ধরিয়া লইবে, গ্রহণ করিবে, ধরো, বানাও) আইয়াতি (আম্মার আয়াতসমূহ, আম্মার নিদর্শনসমূহ, আম্মার নমুনাসমূহ) ওয়া (এবং) রসুলি (আম্মার রসুলদের, আম্মার রসুলগণকে) হজুয়ান্ (তীর্থা, মজা, বিদূষ, উপহাস, পরিহাস, তীক্ষ্ণাশা, ব্যঙ্গ, অবজ্ঞা, কৌতুক, মক, রিডিকিউল, জেস্ট, ডিরাইড, শ্লিয়ার, স্বফ, জিয়ার, লাফ, মেইক ফান)।

পঁট উহাই তাহাদের পারিশ্রমিক - জাহান্নাম, যাহারা কুফরি করিয়াছে এবং গ্রহণ করিয়াছে আমার আয়াতসমূহ এবং আমার রসুলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ (রূপে)।

১ ব্যাখ্যা : এই একশত দুই হতে একশত ছয় নম্বর আয়াতের সামান্য কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাই। যারা আল্লাহকে সব রকম শক্তির মূল্যধার বলে জানবার পরেও অন্য কোনো শক্তিকে তথা গায়রুল্লাহকে উদ্ধারকারী বন্ধু অথবা অভিভাবকরূপে মেনে নেবে তারা মিথ্যার মধ্যে আগ্রয় গ্রহণ করেছে বলে বলা হয়েছে এবং জাহান্নামই হবে এদের ঠিকানা তথা জাহান্নাম এদেরকে অতিথিরূপে গ্রহণ করে নেবে।

আমলে সালেহার দুরাই নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসটি বিদায় গ্রহণ করে তথা আমিত্তের বিনাশ ঘটে। আমিত্ত তথা নফস যোগ 'ত' তথা খান্নাস - দুটোকে একত্রে বাংলা ভাষায় আমিত্ত বলা হয়। এবং এই আমিত্ত হতে মুক্তি লাভ করতে হলে আমলে সালেহার গুরুত্বটি দেওয়া হয়েছে। জীবন পরিচালনার প্রশ্নে আমলে সালেহার অভাবে যারা কুফরি করে তাদের কর্মগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তারা তাদের কার্যকলাপগুলোকে মহৎকর্ম বলেই মনে করে থাকে। এরাই খান্নাস-মিশ্রিত প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। পাঠক, একটু গভীরভাবে লক্ষ করে দেখুন, কোরান-এর প্রতিটি সুরার প্রতিটি আয়াতে আপন নফস হতে মায়ারূপে দাঁড়িয়ে থাকা খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার জন্য অথবা খান্নাসটিকে মুসলমান বানাবার জন্য একটিমাত্র আত্মান এবং একটিমাত্র উপদেশ অনেক রকম উপমা দিয়ে আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সাবধানতা অবলম্বন করার তরে বারবার আত্মান করা হয়েছে। এই খান্নাসটিকে আপন নফস হতে মুক্ত করতে না পারলে যত আমলই করা হোক না কেন এবং যত এবাদতই করা হোক না কেন, কোনো কাজে আসবে না। তাই কোরান অন্যত্র বলেছে, উজুহ ইয়াওমাইজিন খাশিয়াতুন আম্মিলা, নাসিবাতুন তাসলা নারান হাম্মিয়া - অর্থাৎ, যেই দিন অনেক মুখমণ্ডল লাক্ষিত হবে অর্থাৎ দুনিয়াতে তারা অনেক আমল করেছে এবং আমল করতে করতে ক্লান্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের আমল ও এবাদত করা সত্ত্বেও তারা প্রচণ্ড উত্তপ্ত আগুনের মধ্যে প্রবেশ করবে। সুতরাং, আমল এবং এবাদতের মূল বিষয়টি হলো আপন নফসটিকে মায়ার খান্নাস হতে মুক্ত রাখা এবং এই মুক্ত রাখার তরে আমলে সালেহা ও এবাদত জাহান্নাতে প্রবেশ করার সহায়কের ভূমিকা অবশ্যই পালন করবে।

অন্যত্র বলা হয়েছে, আল্লাজিনা দোয়াল্লা সাইয়িউহম ফিল হায়াতিদু দুনিয়া - তথা, তারা হলো সেই সকল মানুষ যাদের চেফ্টা-সাধনা দুনিয়াতে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে এবং তারা ভ্রান্তপন্থায় আমল করেছে, যাহা আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। তাই একশ পাচ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, তাদের ধারণায় যাহা সং আমল তাহা মোটেই সং আমল নহে। তাদের সংকর্ম এবং তাদের আমিত্তের আবরণের মাঝে আপন রবের পরিচয়টি তারা ঢেকে রাখে। আমিত্তের পরদায় আপন রবের দর্শন আপন কর্মদোষে তারা ঢেকে রাখে। এই জাতীয় অনেক প্রকার আনুষ্ঠানিক এবাদত-বন্ধেগির মাধ্যমে আমলকারীদের সব রকম আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। এই সকল মানুষের এবাদত-বন্ধেগির মাধ্যমে যে-আমল হাসিল করা হয়েছে বলে মনে করে সেই আমলগুলোর কোনো ওজন থাকে না। সুতরাং, ওজন মাপার প্রশ্নই ওঠে না। ওজন থাকলে তো প্রশ্ন আসে। কিন্তু যেহেতু এই জাতীয় এবাদত-বন্ধেগিতে সামান্য ওজনও অবশিষ্ট থাকে না, সুতরাং মেপে নেবার প্রশ্নই ওঠে না।

তারপর বলা হচ্ছে, যারা সত্যকে ঢেকে রাখে আপন খেয়াল-খুশি প্রবৃত্তির আবরণ দিয়ে তাহাই কুফরি করে। মুখে কুফরি করার কথাটি অস্বীকার করলেও তাদের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে কুফরিটি ফুটে ওঠে। আল্লাহর প্রকাশিত

গুণগুলো আল্লাহরই আয়াত তথা নিদর্শন। সুতরাং, আল্লাহর গুণে গুণাবিত্ত হবার চেষ্টায় ধ্যানসাধনা করে কিছু দিন অতিবাহিত করতে পারলে আপন নফসের মধ্যেই আপন রবের পরিচয়টি ধীরে-ধীরে প্রকাশিত হতে থাকে। তাই আমরা দেখতে পাই, আল্লাহর ওলিরা বছরের পর বছর নির্জনে ধ্যানসাধনা করে আপন নফসের মধ্যে আপন রবটিকে প্রকাশিত করার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকেন নতুবা খান্নাসমিশ্রিত নফসটির পরিণতি হয় জাহান্নাম। কারণ, নফস কুফরি করে না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপন খান্নাসের মন্ত্রণার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। আপন নফসের সঙ্গে অবস্থান করা খান্নাসটি কুফরি করার অনেক রকম স্থূল এবং সূক্ষ্ম প্রতারণা করে। এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম প্রতারণার জালে নফসটি যখন আর্ফেপ্তে জড়িয়ে পড়ে তখনই সেই নফসের ঠিকানাটি হয় ঘণিত জাহান্নাম।

১০৭. ইন্নাল্ (নিশ্চয়ই) লাজিনা (যাহারা) আম্মান (ইমান আনিয়াছে) ওয়া (এবং) আম্মিল (কাজ করিয়েছে) সালিহাতি (ভালো, উপযুক্ত, শুভ, মঙ্গলকর, সঠিক, নির্ভুল, ন্যায়সঙ্গত) কানাত্ (রহিয়াছে) লাহম্ম (তাহাদের জন্য) জান্নাতুল ফিরদোসি (জান্নাতুল ফেরদোস) নুজুলান্ (আবাস, বাড়ি, অভ্যর্থনা, আতিথ্যভূমি, আপ্যায়ন, মেহমানদারি)।

প্ট নিশ্চয়ই যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং আম্মলে সালেহা করিয়াছে তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাতুল ফেরদোস আপ্যায়ন (রূপে)।

১০৮. খালেদিনা (তাহারা বাস করিবে) ফিহা (উহার মধ্যে) লা (না) ইয়াবগ্গনা (তাহারা চাইবে) আনহা (উহা হইতে) হিওয়ালান্ (স্থান পরিবর্তন করা, পরিবর্তন করা, পাল্টানো)।

প্ট তাহারা বাস করিবে উহার মধ্যে, তাহারা চাইবে না উহা হইতে পরিবর্তন।

১ ব্যাখ্যা : এই দুটি আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে, যারা ইমানের কাজ করে এবং আম্মলে সালেহা করে তাহাদের জন্য রাখা হয়েছে জান্নাতুল ফেরদোস। আম্মলে সালেহার অনেক রকম শাব্দিক অর্থই পাওয়া যায় এবং এই শাব্দিক অর্থগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা লিখতে গেলে অনেক রকম বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়। কারণ, অনেক অবিশ্বাসীরও সং কাজ করার দৃষ্টান্তটি পৃথিবীর বুকে দেখতে পাই। সুতরাং, অধম লিখকের মনে হয়, আম্মলে সালেহা মানে নির্জনে একাকী আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ধ্যানসাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখা। এই আধুনিক যুগে ধ্যানসাধনার কথাটি বললে অনেকেই অবাক হয়, কিন্তু মহানবি যে দেড় হাজার বছর আগে আড়াই হাজার ফুট উচুতে জাবালুন নুর পর্বতে অবস্থিত হেরাগ্গহায় পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করে গেছেন, এই ধ্যানসাধনাটিকেই ভাবগত অর্থে ধ্যানসাধনা লিখলাম। একটু খেয়াল করুন, ইমান আনার পরই আম্মলে সালেহার কথাটি বলা হয়েছে এবং ইমান ও আম্মলে সালেহার মাধ্যমে যে জান্নাতুল ফেরদোসে বসবাস করা যায় সেই সুসংবাদটি এই আয়াতে দেওয়া হয়েছে। আবার কোনো-কোনো জ্ঞানী তফসিরকারী আম্মলে সালেহাকে কর্মযোগ বলে উল্লেখ করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, এই কর্মযোগ বলতে কী বোঝায় এবং কর্মযোগের ধরন-ধারণটিই বা কেমন হবে এই কথাটি বলা হয় নি। সুতরাং, আম্মলে সালেহার শাব্দিক অনেক অর্থের মাঝে আসল অর্থটি ঢেকে আছে। অবশ্য ইহা অধম লিখকের একান্ত নিজস্ব মতামত।

আপন রব হতে এলহাম পাবার ইচ্ছাটি যারা মনের মধ্যে স্থান দিতে পেরেছে তাহাদেরকে অবশ্যই আম্মলে সালেহা নামক ধ্যানসাধনায় কিছুদিন হলেও রত থাকতে হবে। কমপক্ষে সর্বনিম্ন চার মাস ধ্যানসাধনা করাটি আম্মলে সালেহার পথে এগিয়ে যাবার প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করতে চাই। কারণ দুই-চার-

দশটি সংকল্প অথবা মহৎকর্ম দ্বারা আমলে সালেহাকে বোঝানো যায় কি না উহা পাঠকের হাতেই তুলে দিলাম।

অনেকেই ফেরদৌস বলতে বাগান তথা উদ্যানকে বোঝানোর কথাটি বলেছেন। আবার, অনেকে বলেছেন যে, বেহেশতের মধ্যস্থলটিকে ফেরদৌস বলা হয়। আবার অনেকে বলেছেন, সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম বেহেশতের স্থানটির নাম হলো ফেরদৌস। অনেকে বলেছেন, সমস্ত বেহেশতের মাঝখানে ফেরদৌসের স্থান এবং ওই স্থান হতেই ঝরনাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকে।

১০৯. কল (বলুন) লাও (যদি) কানাল (হয়) বাহরু (সবগুলো সাগর) মিদাদান (কালি, প্রদীপের তেল) লিকালিম্মাতি (কথাসমূহ লিখিবার জন্য) রাব্বি (আমার রবের, আমার প্রতিপালকের) লানাকিদালু (অবশ্যই শেষ হইয়া যাইবে) বাহরু (সাগরসমূহ) কাব্বা (আগেই, পূর্বেই) আনতানফাদা (শেষ হইবে) কালিম্মাতু (কথাসমূহ) রাব্বি (আমার রবের) ওয়া (এবং) লাও (যদি) জিনা (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] আনিয়া দেই) বিমিসলিহি (সমপরিমাণ, অনুরূপ) মাদাদান (সাহায্য, সাহায্যার্থে)।

পট বলুন, যদি সাগরসমূহ কালি হয় আমার রবের কথাসমূহ লিখিবার জন্য অবশ্যই শেষ হইয়া যাইবে সমুদ্রসমূহ আমার রবের কথাসমূহ শেষ হইবার আগেই এবং যদি আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] আনিয়া দিতাম সমপরিমাণ (সমুদ্র) সাহায্যার্থে।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতটিতে সাক্ষাতিক রহস্যপূর্ণ কথাটি বলা হয়েছে। মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তোমার মাঝে যিনি রবরূপে অবস্থান করছেন তার পরিচয় তোমার জ্ঞান নাই। বছরের পর বছর নিজনে একাকী ধ্যানসাধনার আমলে সালেহার মাধ্যমে, যাকে দায়েমি সালাতও বলা হয় – সেই সাধনায় যখন আপন রব আপনার মাঝে পরিপূর্ণ নুরময়রূপে ধরা দিতে থাকে তখন সাধক অবাক বিস্ময়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে। সাধক তখন দেখতে পায়, বিশ্বরবরূপী রবের প্রশংসার কথা লিখতে গেলে দুনিয়ার সাগরসমূহ যদি কালি হয় তবু ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু বিশ্বরবের অসীম প্রশংসার কথা ফুরিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। যদিও মানুষ দুর্বল এবং দেহের মাঝে ক্ষুদ্র উপাধি সাধকের মাঝে যে আপন রব বিরাজ করছে সেই রবকে বছরের পর বছর ধ্যানসাধনার মাধ্যমে যখন জাগ্রত করতে পারে তখন দেখতে পায় যে আমার ভেতরের রবই তো বিশ্বরব। কাঁঠালের বিচির মধ্যেই তো বিশাল কাঁঠাল গাছটি দেখতে পাই। ছোট্ট একটি বটবৃক্ষের বীজের মধ্যে বিশাল বটবৃক্ষটি দেখার মতো বিশ্বরবের নুরময় জালুয়া ও শান দেখে সাধক সব রকম কথার ভাষা ও শব্দ চয়নগুলো একদম ভুলে যায় এবং অসীম রবের অসীম নুরময় বিকাশের মধ্যে আপন নফসটি হারিয়ে যায়। তখন আর কথা থাকে না, থাকে কেবল দর্শন। সুতরাং, খোদার মধ্যে কথা নাই এবং কথার মধ্যে খোদা নাই। এটাই ধ্রুব সত্য। এটাই স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এটাই চিরন্তন সত্য। তাই আমরা দেখতে পাই, হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি তার আপন মুরশিদ আবু আলি ফরমাদির দেওয়া ধ্যানসাধনাটি একটানা ছয়-সাত বছর করার পর আর একটি কথাও লিখে যেতে পারেন নি।

তারপর, বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গিতেও যদি ইহার ব্যাখ্যাটি দিতে চাই সেখানে তো এক হাজার সাগরের পানি যদি কালি হয় তবু আল্লাহর শান-মানের একটি ক্ষুদ্রাংশও লেখা যায় কি না সন্দেহ। সামান্য একটি নমুনা তুলে ধরতে চাই। আমরা জানি আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। তা হলে এক মিনিটে কত হবে? এক দিবারাত্রিতে কত হবে? এক মাসে কত হবে? এক বছরে কত হবে? আমরা শুনে অবাক হই যখন বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এমন সব নক্ষত্র বিচরণ করছে যার আলো আজও পৃথিবীতে আসে নাই। কতগুলো গ্রহ এবং কতগুলো উপগ্রহ নিয়েই সূর্য নামক সৌরজগৎ। পৃথিবী-বিখ্যাত

বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন যে, আমার মনে হয় এ-রকম পঞ্চাশ বিলিয়ন সৌরজগৎ আছে এবং ইহা প্রথম আকাশেই অবস্থান করছে। সুতরাং, মানুষের এই আড়াই ইঞ্চি চোঁট দিয়ে আল্লাহর শান-মান-জালুয়ার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়াটা অসম্ভব বলেই ধরে নিতে চাই

১১০. কুল (বলুন) ইন্ননা (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহ) ম্মা (কি, না) আননা (আমি) বাশারুম্ (বাশার) মিসলুকুম্ (তোমাদের মতো) ইউহা (ওহি করা হয়) ইলাইয়া (আমার দিকে, আমার প্রতি) আননাম্মা (যে) ইলাহকুম্ (তোমাদের ইলাহ) ইলাহন্ (ইলাহ) ওয়াহিদুন্ (এক)।

স্ট বলুন, নিশ্চয়ই কি আমি তোমাদের মতো বাশার? আমার দিকে ওহি করা হয় যে তোমাদের ইলাহ একই ইলাহ।

+ ফাম্মান্ (সুতরাং যে) কান্না (করে) ইয়ারজু (আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা) লিকায়্যা (উপস্থিতি, সামনে আসা, মিলন, মৌলাকাত, সাক্ষাৎ) রাব্বিহি (তাহার রবের) ফালইয়াম্মান্ (সুতরাং সে যেন করে) আম্মালান্ (কাজ, কর্ম, আমল) সালিহান্ (ভালো, উপযুক্ত, শুভ, মঙ্গল, সঠিক, নির্ভুল, ন্যায়সম্মত, যথাযথ, মানানসই, সুন্দর, শৌভন, অটুট, গভীর, নিরোঁট, পুরাদস্তুর, সুপ্রতিষ্ঠিত, সুযুক্তিপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য, বিচক্ষণ, নৈতিক উৎকর্ষসম্পন্ন, সদ্ব্যবহৃত, সুনীতিসম্পন্ন, কঠব্যপরাযণ, শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত, আন্তরিক, ঐশ্বরিক, নিয়মসম্মত, সংকর্ম) ওয়া (এবং) লা (না) ইউশরিক্ (শেবেক করে) বিইবাদাতি (তাহার এবাদতের সহিত, তাহার এবাদতে) রাব্বিহি (তাহার রবের) আহাদান্ (কাহাকেও)।

স্ট সুতরাং যে আকাঙ্ক্ষা করে তাহার রবের সাক্ষাৎ সুতরাং সে যেন আমলে সালেহা করে এবং শেবেক না করে তাহার এবাদতে তাহার রবের (সহিত) কাহাকেও।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই কি আমি তোমাদের মতো বাশার? অর্থাৎ, তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদের মতো একজন ব্যক্তি, অথবা একজন মানুষ? অথবা ইহাও হয় যে, বলুন নিশ্চয়ই আমি নহি তোমাদের মতো এক ব্যক্তি তথা একজন মানুষ। এই কথাগুলোর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এক কথায় বলতে গেলে ইহাই বোঝানো হয়েছে যে, রসূল মোটেও আমাদের মতো মানুষ নহেন। কেবলমাত্র দেহের আকার-প্রকারে – তাও আবার মানুষের মোটা দৃষ্টিতে আমাদের মতো মানুষই বলে মনে হবে, কিন্তু নবি-রসূলরা যে দেহের দিক দিয়েও মোটেও আমাদের মতো মানুষ নহেন তার ভুরি-ভুরি প্রমাণ কোরান-হাদিস-ইনজিল-তাওরাত-জাবুর-বেদ-গীতা হতে দেওয়া যায়। যেহেতু অধম লিখক জন্মসূত্রে আজন্ম তকদিরের লিখনে মুসলমানের ঘরে জন্মেছি সেই হেতু কোরান-হাদিস হতে নবি-রসূলরা যে মোটেও আমাদের মতো মানুষ নহেন ইহার বহু দলিল-প্রমাণ দিতে পারি। ধরে নিলাম, সব রকম দলিল-প্রমাণগুলো একসাথে রেখে কেবলমাত্র একটি প্রশ্নের উত্তরে জগতের কেহই উত্তরটি দিতে পারবে না আর সেটা হলো, নবি-রসূলের কাছে ওহি আসে। এই ওহি আসাটি কি একটি যেনতেন কথা? এই ওহি আসাটি কি এমনই মামুলি বিষয় যে, নবি-রসূলদের আমাদের কাতারে এনে দাঁড় করাবার চেষ্টা করব? এই চেষ্টাটি কি একটি জঘন্য অপচেষ্টা নয়? এই চেষ্টাটি কি একটি হীনম্মন্যতার পরিচয় বহন করে না? এই চেষ্টাটি কি বেয়াদবির তলিবিহীন গঠের মধ্যে ঢুকে যাবার অপচেষ্টা নয়? কত বড় বেয়াদব হলে নবি-রসূলদের আমাদেরই মতো মানুষ মনে করতে চায়? অতি সামান্য একটি নমুনা তুলে ধরতে চাই যে, আমাদের শরীর হতে যে-ঘাম বাহির হয় উহা অনেক রকম দুর্গন্ধযুক্ত। অনেকের শরীরের ঘাম হতে তো ময়লা পায়খানার মতো গন্ধ বেরুতে থাকে এবং সেই ময়লা পায়খানার গন্ধটিকে নানা রকম সেন্ট-আতর দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করে, অথচ মহানবির পবিত্র দেহ-

মোবারক হতে যে-ঘাম বাহির হতো উহা মেশকানুর নামক সুগন্ধী হতেও অনেক বেশি সুগন্ধযুক্ত। ইহার দলিলটি মহানবির স্বী আমাদের মা হজরত আয়েশা (রা.); উম্মে সালমা (রা.); উম্মে হাবিবা (রা.) এবং বহু জলিল কদরের সাহাবাদের মূল্যবান বাণীসমূহ হতে জানতে পারি। অতি পুরাতন এবং একদম শুকনো একটি কুপের মধ্যে মহানবির সামান্য খুত নিক্ষেপ করার দরুন কুপটি জলে পরিপূর্ণ হয়ে যাবার ঘটনাটি বহু জলিল কদরের সাহাবা সচক্ষে অবলোকন করেছেন। ইহা কি আমাদের মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব? তা হলে নবি-রসুলদের কী করে এবং কেমন করে আমাদের মতো মানুষ বলার অসহ্য ধূর্ততা প্রকাশ পায়?

কোরানুল হাকিম-এ বহুবার বলা হয়েছে যে, কাফেরেরা নবি-রসুলদেরকে তাদের মতোই মানুষ মনে করতো। এই কথা বলার পরেও কেমন করে নবি-রসুলদেরকে আমাদের মতো মানুষ মনে করা যায়? নবি-রসুলেরা যে মোটেও আমাদের মতো মানুষ নহেন উহা বুঝতে চাইলে আমলে সালেহা নামক ধ্যানসাধনাটি মাত্র একটি বছর নির্জনে করতে পারলেই ইহার সত্যতা হাতে-নাতে টের পাওয়া যায়। এক বছরের আমলে সালেহা অথবা দায়েমি সালাতের মাধ্যমে কামেল হতে না পারলেও ধূয়া দেখলে যেমন আশ্রয় আছে বলে ধারণা করা যায় তেমনি নবি-রসুলরা যে মোটেও আমাদের মতো মানুষ নহেন উহার প্রমাণটুকু অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু আফসোস, আমাদের দেশে এ-রকম ধ্যানসাধনার একটিও স্থল খোলার প্রয়োজন মনে করা হয় নাই, বরং শৈখিল্য প্রদর্শনের দরুন এহেন করুণ অবস্থাটি দেখতে পাই।

শয়তান হতে মুক্তি চাই বললেই যেমন মুক্তি পাওয়া যায় না, সে-রকম আপন রবের সঙ্গে কাহাকেও শরিক করি না বললেই শেরেক হতে মুক্তি লাভ করা যায় না। মুক্তি তখনই পাওয়া যায়, যখন আমলে সালেহার ধ্যানসাধনাটি করা হয়। কারণ, মুখে বলা এক বিষয় আর আমলে সালেহার মাধ্যমে তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে সঠিক বিষয়টি অবগত হওয়া সম্পূর্ণ অন্য বিষয়।

একবার মহানবিকে এক সাহাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ, ছোট শেরেক কী? মহানবি বললেন, 'আরবিয়াও' তথা লোক-দেখানো এবাদত করা। 'আরবিয়াও' যে একটি শেরেক মহানবি এই কথাটি জানিয়ে দিলেন। একবার মহানবির কিছু সাহাবার মধ্যে কথা বলাবলি হচ্ছিল। এমন সময় মহানবির আগমন হওয়াতে এবং কিসের আলোচনা হচ্ছিল প্রশ্ন করাতে সাহাবারা দাজ্জালের আলোচনার কথাটি বললেন এবং সাহাবারা এও বললেন যে, এই দাজ্জালের ভয়ে আমরা খুবই ভীত। এই কথা শোনার পর মহানবি সাহাবাদেরকে বললেন, এর চেয়েও তথা দাজ্জাল বিষয়ের চেয়েও ভয়ানক বিভীষিকায় পূর্ণ বিষয়ের কথাটি কি তোমাদের বলে দেব না? সাহাবারা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ, বলুন। মহানবি বললেন, দাজ্জালের ভয়ানক বিভীষিকায় ভরা বিষয়টি হতেও আরও অধিক ভয়ঙ্কর বিষয়টি হলো 'শিরকে খফি' তথা গোপন শেরেক আর সেই গোপন শেরেকটি হলো, মানুষদের দেখাবার জন্য যারা নামাজ পড়ে।

ইজরত উবাদা ইবনে সাম্মত (রা.) নামক সাহাবার নিকট জানতে চাওয়া হলো যে, বলুন তো এক ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে নামাজ-রোজা-হজ্জ-জাকাত এবং প্রায় সব রকম সংকল্পগুলো করছে এবং সেই সঙ্গে সেই লোকটি চায় যে তার প্রশংসা করা হোক এবং নামটি ছড়িয়ে পড়ুক। ইজরত উবাদা ইবনে সাম্মত বললেন, সেই লোকটির সব রকম আমল ব্যর্থ হয়েছে।

প্রিয় পাঠকেরা, এখন আমলে সালেহা বলতে সংকল্প শব্দটি ব্যবহার না করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ধ্যানসাধনা করাটিকে বোঝাতে চেয়েছি। হয়তো অধম লেখকের ভুলও হতে পারে। লোক-দেখানো নামাজ-রোজা-হজ্জ-জাকাত ইত্যাদি মহৎ কার্যগুলো নিজের প্রশংসা ও নাম ছড়াবার উদ্দেশে যে বা যারা করে, আল্লাহ বলছেন : এইগুলো আমার কোনো প্রয়োজন নাই।

মিনাশ শাহওয়াতিল খাফিয়াতিশ্ শিরকে - মহানবির এই বাণীটির অর্থ হলো গোপন কুকামনা ও শিরক। এক সাহাবা বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ, গোপন কুকামনা বলতে তো নারীকে কেন্দ্র করে কামনা-বাসনা বোঝায়; তখন বলা হলো, যে-ব্যক্তি মানুষকে দেখাবার জন্য নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং দান-খয়রাত করে সে-ও শেরেক করে। মানসাল্লা ইয়ারানি ফাকাদ আশরিক ওয়া মান সাম্মা ইয়ারানি ফাকাদ আশরিকা ওয়া মান তাসাদ্দাক ইয়ারায়া ফাকাদ ইউশরিক - অর্থাৎ, যে-মানুষটি দেখাবার জন্য নামাজ পড়ে সে শেরেক করে, যে-মানুষটি দেখাবার জন্য রোজা রাখে সে শেরেক করে এবং যে-মানুষটি দেখাবার জন্য দান-খয়রাত করে সে-ও শেরেক করে।

আতাখাউফুন আলা উম্মাতিশ্ শিরকে ওয়া শাহওয়াতিল খাফিয়াতি - অর্থাৎ, মহানবি বলেন, আমার উম্মতের উপর শিরক ও গোপন কুকামনার ভয় করি। মহানবি পুনরায় বললেন, তারা চন্দ্র-সূর্য, পাথর ও মূর্তিপূজা করে না, বরং তারা অন্য মানুষকে দেখাবার উদ্দেশ্যে আমল করবে এবং গোপন কুকামনাটি হলো, কেই রোজা রাখল, কিছু সহসা কোনো কুকামনায় উত্তেজিত হলো তখন রোজা ভেঙে গেল।

পরিশেষে, এই কথাটুকু অতিরঞ্জিত হলেও পাঠকদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে, নরুসিংদী জেলার শিবপুর থানার জয়নগর ইউনিয়নে অবস্থিত নৌকাঘাটা গ্রামে পচিশ বিঘা জমির উপর একটি ধ্যানসাধনার স্থল খুলেছি এবং একসঙ্গে তেরজন সাধকের জন্য আলাদা-আলাদা স্থানে বারান্দাসহ টিন শেড বিল্ডিং করে দিয়েছি। এই স্থলটি দাঁড় করাবার জন্য মাত্র পাঁচজনের অবদানই বেশি তবে সবচেয়ে বড় অবদানটি হলো জনাব আতাউর রহমান রফিক এবং রেজাউল আলমের। সবার কাছেই প্রকাশ্যে এই স্থলটির জন্য সাহায্য চেয়েছি এবং চাই যাতে স্থলটিকে আরও সুন্দর করতে পারি। নিশ্চিত হয়ে বলছি না, বরং 'হয়তো' যোগি করে বলছি যে, এই স্থলের দানটুকু হয়তো মরণের আগে অথবা পূর্বে সাহায্য-সহযোগিতার ভূমিকাটিতে সাক্ষীরূপে আল্লাহ পাকের দরবারে দাঁড়িয়েও যেতে পারে। আরেকটি কথা হলো যে, এই দুনিয়াতে আল্লাহ কিছু দান করলেও বোঝা যায় না আবার নিলেও বোঝা যায় না।

৩৬ নং সূরা : ইয়াসিন
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল্লাহর নামের সাথে (বিসমিল্লাহি) যিনি একমাত্র দাতা
(আর রাহমান) একমাত্র দয়ালু (আর রাহিম)

১. ইয়া সিন।

স্ট ইয়াসিন।

১ ব্যাখ্যা : ইশারা বা ইঙ্গিতের দ্বারা ব্যক্ত ইয়া এবং সিন হতে এই সূরাটির নাম রাখা হয়েছে ইয়াসিন। সিন অক্ষরটি দিয়ে সিরাজাম মুনীরাতা অতিশয় দীপ্ত আলো বোঝানো হয়েছে। আল্লাহর জ্ঞাত নূর হতে (সেফাতি নূর নহে) মহানবির আগমন এবং তিনি আদি নূর। এই অতিশয় দীপ্ত আলো মনবরূপে পৃথিবীর বুকে মানবীয় দেহরূপী আবরণের মধ্য দিয়ে আগমন করেছেন। আরাধনা ও মহিমাকীর্তনের সহায়তা দিয়ে মহানবি আলোকিত হন নাই এবং হবার প্রশ্নই ওঠে না। কোনো একজন অতিশয় দীপ্ত আলো হতে আমলের সাহায্যে তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে মহা আলো তথা আল্লাহর জ্ঞাত অর্জন করে সাধনার দ্বারা তিনি আলোকিত হন নাই। মহানবি হলেন আল্লাহর হাবিব। এখানে হাবিবের বিষয়ে একটু কথা বলা দরকার। হাবিব অর্থটি হলো, মহানবি মাশুক তথা প্রেমাস্পদ এবং আল্লাহ স্বয়ং হলেন প্রেমিক বা আশেক - তথা, সর্বযুগে, সর্বকালে, সর্বসাধকদের দৃষ্টিকেন্দ্র এবং লক্ষ্যস্থলের কেন্দ্রবিন্দু এবং মানবজাতির জন্য তিনি হলেন নেতাদের কেন্দ্র, নবিদের কেন্দ্র, রসুলদের

কেন্দ্র, আবদালদের কেন্দ্র, গাউস-কুতুব-আরিফ-মুনি-খাম্বি-সাধু-সন্তদের তিনিই হলেন কেন্দ্রবিন্দু। হিন্দু ধর্মে ভগবানের কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় শিবকে, কিন্তু আমরা কোরানুল হাকিম-এ মহানবিকে আল্লাহর অখণ্ড জ্ঞানব্রহ্মের প্রকাশিত হয়ে পড়া খণ্ডিত (?) নুর বলতে চাই। তাই আল্লাহর বড়-বড় ওলিরা বলে থাকেন, দোনাহিকা শেকেল এক হয়, কিসকো খোদা কাই? তথা, দুজনার চেহারা তো একই, তা হলে কাকে খোদা বলব? ফাকানা কাবা কাওসাইনে আও আদনা - তথা, দুই ধনুকের ব্যবধানে অথবা আরও নিকটে বলা হয়েছে। একটি ধনুক দেখতে অনেকটা অর্ধবৃত্তের মতো। দুইটি ধনুক দুইটি অর্ধবৃত্ত এবং দুইটি অর্ধবৃত্ত একসঙ্গে জোড়া লাগিয়ে দিলে একটি বৃত্তে পরিণত হয় এবং যদি দেখতে পাও যে পরিপূর্ণ একটি বৃত্ত হতে সামান্য ফাঁক-ফোকর রয়ে গেছে তা হলে 'আও আদনা' তথা আরও নিকটে নিয়ে আসো। সূতরাং, এই কথাটি বলতে কি দোষ আছে যে, অপ্রকাশিত নুরটি আল্লাহ এবং প্রকাশিত নুরটির নাম নুরে মুহাম্মদি? মহানবির যেমন অনেক নাম আছে তেমনি হিন্দু ধর্মে শিবেরও অনেক নাম আছে এবং যার-যার ধর্মে তার-তার নিজস্ব নাম থাকতে পারে। মহানবি বলেছেন, 'আউয়ালুনা মুহাম্মদ' - তথা, আদিতে আমরা মুহাম্মদ, 'আওসাতুনা মুহাম্মদ' - মধ্যখানেও আমরাই মুহাম্মদ, 'আখেরুনা মুহাম্মদ' - তথা, সর্বশেষেও আমরা মুহাম্মদ এবং 'কুললানা মুহাম্মদ', তথা - আদি-মধ্য-অন্ত এবং সর্বাবস্থায় আমরাই মুহাম্মদ। তবে অন্যান্য তফসিরকারকেরা এই 'ইয়াসিন' শব্দটির যদি ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ করে থাকেন তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনের ওপর ভিত্তি করে, তা হলে ইহা কোনো দোষের বিষয় বলে মনে করি না। কারণ, প্রত্যেকেই আন্তরিকভাবেই করে থাকেন বলে ধরে নিতে চাই। মহানবির জ্ঞান-নুরের মহা আলোটি যতদূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে ততদূর পর্যন্ত তমসার ঘোর অন্ধকারি কিছুটা হলেও দূর হতে পেরেছে। সূতরাং, যে বা যিনি যতটুকু এই মহা-নুরকে ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে তার ডেতরের অন্ধকার ততটুকুই বিতাড়িত অথবা অপসৃত হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, মহানবির মানব আকারের মাঝে মহাআলো খাল্লাস-মিশ্রিত নফসগুলিকে উদ্ধার করার জন্য আগমন করেছেন। তাই প্রতিটি খাল্লাসমুক্ত আল্লাহর ওলিরা এই মহা-নুরকে 'হে অতিশয় দীপ্ত আলো' বলে সম্বোধন করে মানুষের কাছে রহস্যময় বক্তব্যগুলো তুলে ধরেছেন। আল্লাহ হতে প্রকাশিত জ্ঞান-নুর নুরে মুহাম্মদি মানব আকারের মাঝে আবরণী দিয়ে পৃথিবীর মাঝে মূর্ত হয়ে আসলেন। নিঃসন্দেহে প্রতিটি খাল্লাসমুক্ত নফস তথা আল্লাহর ওলিদের নিকট ইহা একটি বিরাট-বিশাল মহিমামণ্ডিত বিষয়। কারণ, আপন নফস হতে খাল্লাসটিকে সাধনার দ্বারা দুর্বল করে ফেলা যায় এবং এটাই সাধনার একটি বিশেষ স্তর। সেই বিশেষ স্তর ইতে উত্তরণ করে শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য যে-নুরের প্রয়োজন সেই নুরটির নামই হলো নুরে মুহাম্মদি। এখানে এসেই সাধকেরা মর্মে-মর্মে বুঝতে পারেন যে, উত্তরণের শেষ প্রান্তে উপনীত হতে হলে সাধনা স্থবির হয়ে যায়। এবং সাধনার পঙ্কজের মধ্যে ধৈর্যধারণ করে নুরে মুহাম্মদির বিশেষ রহমতটি পাবার আশায় তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এখানে ইলেকশন নয়, বরং সিলেকশন। এখানে যুক্তি-তর্কের সমাধি এবং চরম রহমতের মহা-নুরের পুষ্পটি ফুটে ওঠা। এখানে যে তকদিরের কম্পাস এডারেস্টের শব্দের চেয়েও কঠিন এবং দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তা কেবল আপন নফস হতে খাল্লাসমুক্তির ধ্যানসাধনায় যারা রত আছেন তারাই মর্মে-মর্মে বুঝতে পারেন।

২. ওয়াল্ (এবং, ও, আর, যখন, শপথ, কসম, সাথে, সঙ্গে, সহিত, অনেক, দোহাই পাড়িয়া, সাক্ষী মানিয়া [হ্যাস ওয়ের : কাউয়ান]) কুরআনিল (কোরান, কোরান-এর) হাকিম (বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাপূর্ণ, জ্ঞানী ব্যক্তি, দার্শনিক, জ্ঞানগর্ভ, অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সুবিচারপূর্ণ, ন্যায্যবিচারপূর্ণ, সুদক্ষ,

বিজ্ঞতাপ্রসূত, উত্তম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন, প্রকৃতিবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ডাক্তার, হেকিম, শিক্ষক, মেরামতকারী [এতগুলো গুণের সমন্বয় করলে হয় হাকিম। সুতরাং, সবগুলো গুণ একত্র করে আমরা মহাবৈজ্ঞানিক অথবা মহাবিজ্ঞানময় শব্দ দুটো ব্যবহার করলাম। অবশ্য এই শব্দ দুটো আমাদের মনগড়া - গ্রহণ করেও নিতে পারেন, নাও পারেন]।

প্ট দোহাই মহাবিজ্ঞানময় কোরান-এর।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতটির সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। কোরান হলো কতগুলো পাঠ বিশেষ তথা যাহা ভাষার মাধ্যমে পড়ে জানতে হয়। এ-জন্য বড় সহিফা বলে কোরান-কে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকালে কোরান-এর পাঠসমূহ পশুর চামড়ায়, খেজুর পাতায়, পশুর হাড়ে এবং অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পেয়েছি। এখন কিছুকাল পূর্ব হতে এই আধুনিক যুগে যে কোরান-এর পাঠসমূহ অতি উন্নতমানের কাগজে সর্বাধুনিক ছাপার অঙ্করে দেখতে পাই উহাও প্রাচীনকালের পশুর চামড়া, হাড়, খেজুর পাতা ইত্যাদি হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। কোরান-এর পাঠসমূহ নিম্নমানের কাগজ হতে অতি উচ্চমানের কাগজে তথা যে-কাগজেই ছাপার অঙ্করে অথবা হাতের লেখায় দেখতে পাই উহাকে আমরা সম্মান প্রদর্শন করি। এই সম্মান কাগজকে নয়, পশুর চামড়াকে নয়, হাড় ও খেজুর পাতাকে নয় - বরং নিছক পাঠসমূহকেই সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। আল্লাহর নবি-রসুলেরা আল্লাহর নুরি কোরান হতে যে-জ্ঞানদান করে থাকেন সেই জ্ঞানের ভাষাগুলোকেই একেকটা সহিফা বলা হয়। যেমন তাওরাত একটি সহিফা, জবুর একটি সহিফা, ইঞ্জিল একটি সহিফা এবং কোরান হলো বড় সহিফা। তা হীড়া আরও সহিফা, সব মিলে একশত চারখানা সহিফার কথা জানা যায়, তবে ইহাদের নামগুলো উল্লেখ করা হয় নাই। যেহেতু নামগুলো উল্লেখ করা হয় নাই, সেই হেতু অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে সহিফা বলে উল্লেখ করতে চাই না। কারণ, ইহাতে মতভেদ ও তর্ক-বিতর্কের প্রশুটি এসে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা থেকে যায়। কোরান আসলে নুর। ইহাকে ভাষার পাশে যদিও আবিদ্ধ করা যায় না, তবে নুরি কোরান-এর পরিচয়টি জানবার আগ্রহটির জন্ম দেয়। নুরি কোরান-এর কিছুটা পরিচয় জানার যদি কারো আগ্রহ থাকে তবে কোরান-এর চব্বিশ নম্বর সূরা 'নুর'-এর পয়ত্রিশ নম্বর আয়াতটি গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অধ্যয়ন করলেই কিছুটা বুঝতে পারবেন। তা হাড়া মাওলাউল আলা শাহ সুফি মাওলানা বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর উর্দু ভাষায় রচিত সিররে হক জামে নুর নামক গ্রন্থটির সরল বাংলায় অনুবাদটি পড়ে দেখলেই একটি পরিষ্কার ধারণা জন্মাবার সম্ভাবনা আছে।

৩. ইননা (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে) কা (তাই, তুমি, আপনি) লা (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, জন্য, শপথ, কসম) মিনাল্ (মধ্য হইতে, থেকে, চেয়ে, হতে) মুরসালিন্ (ইহা 'রসুল'-এর বহুবচন, রসুলদের, রসুলগণ, রসুলেরা)।

প্ট নিশ্চয়ই আপনি অবশ্যই রসুলগণের মধ্য হইতে।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যার এ-জন্যই প্রয়োজন অনুভব করছি যে, অনেকেই রসুল এবং নবি উভয়ের পার্থক্যটি না করে লবিড়া পাকিয়ে ফেলেন, অথচ রসুল এবং নবির মধ্যে বিরাট একটি পার্থক্য আমরা ভুলে যাই। আমরা কোরান হতে তন্নতন্ন করে খুঁজেও 'খাতামার রসুল' তথা রসুল শেষ হয়ে গেছে কথাটি একটি বারের তরেও পাই নাই। কারণ, যেহেতু রসুলদের অস্তিত্ব করা হয়েছে ফেরেশতাদেরকেও তাই রসুল শব্দটির আগে বী পরে 'খাতামান্' তথা শেষ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নাই। যেমন, বাইশ নম্বর সূরা হজ্জ-এর পচাত্তর নম্বর আয়াতে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ রসুল নিয়োগ করছেন ফেরেশতা এবং মানবজাতি হতে। এখন প্রশ্ন আসে, ফেরেশতাজাতির মধ্যে নফসও দেওয়া হয় নি এবং রুহও দেওয়া হয় নি। ফেরেশতারা হলো

আল্লাহর গুণবাচক নুরের তথা সেফাতি নুরের তৈরি নফস-এবং রুহ-বিহীন আত্মাবহ তথা নির্বাচন করার ক্ষমতাবর্জিত এক প্রকার সত্তা। এখন প্রশ্ন হলো, সত্তা বললেও যদি সত্তার ভেতরে নফস ও রুহের গন্ধ থেকে যায় তা হলে সত্তা শব্দটিও সাক্ষাৎসিক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, ফেরেশতাদেরকে অনুবাদে ফেরেশতা রেখে দিতেই বাধ্য হলাম। তবে সর্বসাধারণের বুঝবার জন্য আল্লাহর সর্বাধুনিক রোবট বলা যায় কি না উহা পাঠকের কাছেই ছেড়ে দিলাম। অবশ্য অধম লিখক ফেরেশতা অনুবাদে কোনো উপায়ত্তর না দেখে আল্লাহর সর্বাধুনিক রোবট বলতে বাধ্য হয়েছি।

কোরান-এর পয়গ্বিশ নম্বর সূরা ফাতির-এর প্রথম আয়াতেই ফেরেশতাদের থেকে রসুল নির্বাচনের কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং শুনলে অবাক হবেন যে, এই প্রথম আয়াতে কেবলমাত্র ফেরেশতাদেরকেই রসুল নির্বাচনের কথাটি বলা হয়েছে, মানুষের নাম-গন্ধও নেই। সুতরাং, আরি কোনো সন্দেহের অবকাশই রইল না যে আল্লাহ ফেরেশতাদের থেকেও রসুল নির্বাচন করেন। বাইশ নম্বর সূরা হজ্জ-এর পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে যে রসুল নির্বাচনের কথাটি বলা হয়েছে উহাতে কিছু ফেরেশতাদের সঙ্গে মানবজাতির কথাটিও বলা হয়েছে, কিন্তু সূরা ফাতির-এর প্রথম আয়াতটিতে রসুল নির্বাচনের প্রশ্নে মানবজাতির নাম-গন্ধটিও রাখা হয় নাই। কোরান-এর উনত্রিশ নম্বর সূরা আনকাবুত-এর একত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ওয়ালাম্মা জাতীত রসুলুনা ইবরাহিমা বিল বুশরা - অর্থাৎ, 'যখন আমাদের রসুলগণ (ফেরেশতারা) ইবরাহিমের নিকটে সুসংবাদ লইয়া আসিল' - এই আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়ে গেল যে নবি ইবরাহিম (আ.)-এর নিকট সুসংবাদ বহনকারীদের দলে ফেরেশতারাই ছিল এবং এই ফেরেশতাদেরকে এখানে রসুল বলা হয়েছে এবং একবারও নবি বলা হয় নাই। সুতরাং, 'খাতাম্মার রসুল' শব্দটি কোরান-এ থাকার কথা নয় এবং থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তারপরেও যদি গায়ের জোরে রসুলদের আগমনটিকে কেউ খতম করিয়া দেন উহাতে যথেষ্ট আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বলবার মতো কিছু বলতে চাই না। অনেক আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। খ্রিস্টান ফাউন্ডেশনের বড়-বড় আলেম-উলামা এবং মুফতিরা একত্রিত হয়ে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর বিচার করছেন। বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর অপরাধটি ছিল, তিনি বলেছিলেন যে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে। কিন্তু খ্রিস্টান ফাউন্ডেশনের মুফতি আজম হতে শুরু করে মুফতি আলেম-উলামারা সবাই একবাক্যে নাউজুবিল্লাহ পড়ে বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। কারণ, খ্রিস্টান ফাউন্ডেশনের আলেম-উলামাদের সহি একমত ছিল যে পৃথিবী স্থির এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য ঘুরছে। সুতরাং, গ্যালিলিওর এই নব আবিষ্কৃত মতবাদটিতে সম্পূর্ণ উল্টো কথা শোনাবার দরুন এবং ধর্ম বিষয়ের উপর অনুভূতিতে প্রচণ্ড আঘাত বিবেচনা করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার রায়টি ঘোষণা করা হয়েছিল।

আশা করি এই বিষয়টি সবারই কমবেশি জানা থাকার কথা। সুতরাং, আরও কথা, আরও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেত, কিন্তু উহা না করে কেবলমাত্র পাঠকদেরকে একটি কথাই মনে রাখতে অনুরোধ করছি যে, 'খাতাম্মার নবি' তথা নবি শেষ কথাটি কোরান-এ পাবেন, অথচ 'খাতাম্মার রসুল' তথা রসুল শেষ এই কথাটি কোরান-এর কোথাও পাবেন না। তারপরেও যদি কথার মারিপ্যাচ, ব্যাকরণের ভিগবাজি মার্কাস্টাইল দিয়ে কোনো কিছু লিখতে ও বলতে চান তা হলে আমার বলার কিছু রইল না। কারণ, ইহাও তকদিকের খেলা বলে ধরে নিতে চাই।

৪. আলা (উপরে, ঊর্ধ্বে, প্রতি, দিকে, অভিমুখে, বিষয়ে, সম্পর্কে, যুক্ত হইয়া, ভিত্তি করিয়া, অগ্রসর হইবার ভাবসূচক, ততোধিক, অধিকতর, উচ্ছে, অধিকতর উচ্ছে, ঊর্ধ্বদিকে, বিষয়ে, সম্পর্কে, অন, আপঅন, ওভার, এবাভ)

সিরাতিম্ম (পথ, রাস্তা, সোজা ও সহজ রাস্তা, পন্থা, উপায়, মার্গ) মুস্তাকিম (সঠিক, সম্পূর্ণ ঠিক বা খাটি, নির্ভুল, যথার্থ, ভ্রমহীন, ভ্রটিহীন, সত্য, নির্ধারিত, স্থির, অবিকল, উপযুক্ত, দোষমুক্ত)।

পট সঠিক রাস্তার উপরে (আছেন, রহিয়াছেন)। [‘আছেন’ অথবা ‘রহিয়াছেন’ শব্দ দুইটি এখানে নাই, তাই ব্যাকটে দিলাম।]

১ ব্যাখ্যা : এখানে মহানবিকে আল্লাহ বলছেন যে, আপনি যেখানে যে-অবস্থায়, যে-পরিস্থিতিতে এবং যে-পরিবেশেই অবস্থান করুন না কেন, অথবা দাঁড়িয়ে থাকুন না কেন, আপনার কদম মোবারকের চিহ্নসমূহ তথা দাগসমূহ অনুসরণের উপর রয়েছে সঠিক পথের নির্দেশনা। এই সঠিক পথের নির্দেশনা বলতে কী বোঝায় এবং এই সঠিক পথের অনুসরণ করলেই বা কী পাওয়া যাবে, কোন গন্তব্যের সিদ্ধান্তটি দেওয়া হয়েছে? এই সঠিক পথে অনুসরণ জীবনভর করতেই থাকবে, নাকি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবে? এই সঠিক পথে চলতে গিয়ে যে সঠিক মনজিলে মকসুদে পৌঁছে যেতে পারবে উহা কি নগদ পাওয়া যাবে, নাকি বাকিতে পাওয়া যাবে? নগদ বলতে এই দুনিয়ার জীবনেই কি পাওয়া যাবে, নাকি মরে যাবার পর বাকিতে পাওয়া যাবে? এখানেও একটি বিরাট জিজ্ঞাসা, বিরাট প্রশ্ন থেকে যায়। এখানেও বর্ণনা হয়েছে যে, মরার পরপরই পাওয়া যাবে। এই মরা তথা মারা যাওয়াটি আবার দুই প্রকার : একটি মরে যাবার আগে মরণ, অপরটি দেহবিনাশের মরণ। মরার আগে মরণটিকে বলা হয় ‘মৃত কাবলা আনতামৃত’ তথা মরার আগে মরে যাও। এই মরার আগে মরে যাবার কথাটি দিয়েই বী কী বোঝানো হয়েছে? আপন পবিত্র নফস হতে অপবিত্র কুমন্ত্রণাদাতা খান্নাস হতে মুক্ত হতে পারলেই বলা হয় মরার আগে মরে যাওয়া। এই মরার আগে মরে যাবার ধ্যানসাধনাটি করতে গেলে পর্বতগুহা কাহাফে অথবা হেরাণ্ডহায় অবস্থানের মতো নির্জনে একাকী ধ্যানসাধনায় বিরাট ধৈর্যসহকারে অবস্থান করতে হয়। অন্যথায় বহু ধর্মগ্রন্থের বহু আদেশ-উপদেশগুলো মুখস্থ করে অথবা আয়ত্তে এনে কথার জাহাজ বনে যাওয়া যায়, কথার নাগরআলি সাগরআলি হওয়া যায়, কিন্তু মূল বিষয় তথা আসল বিষয় হতে বহু দূরেই অবস্থান করতে হয়। এবং ইহাতে আত্মতৃপ্তির মিষ্টি ঢেঁকুর তোলা যায়, কিন্তু মহাসত্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে প্রতিটি মানুষের জীবন-রণের তথা শাহারণের নিকটে অবস্থান করছেন উহার পরিচয় জানা যায় না। আর যে-মৃত্যুতে দেহ মুসলমানটিকে সঙ্গে নিয়ে মন নামক খান্নাসমিশ্রিত নফসটিকে নিয়ে মরতে হয় উহাই দুর্ভাগ্যজনক হতাশাব্যঞ্জক একটি মৃত্যু-ঘটনা। এই বিষয়টি অনেকেই বুঝতে পারে, আবার অনেকেই বুঝতে পারে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির। বারবার কেন তকদির শব্দটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে? কারণ, এই তকদিরের মহালীলাখেলাটি যদি না থাকে তা হলে দুনিয়ার প্রতি মানুষের মোহ-মায়া থাকার প্রশ্নটি ওঠে না এবং এই মোহ-মায়াই একটি পরীক্ষা। সুতরাং, আল্লাহর সঙ্গে মিলনে পরীক্ষার সমাপ্তি এবং বিচ্ছেদেই বারবার আগমনের বার্তা তথা পুনর্জন্মবাদের অবধারিত সিদ্ধান্তটি দাঁড়িয়ে থাকে এবং ইহাই কেয়ামতে সগিরী তথা ছোট কেয়ামত।

পরিশেষে, ‘সিরাতিম্ম মুস্তাকিম’ বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি। কারণ, ‘সিরাতিম্ম মুস্তাকিম’ সঠিক একটি পথ নয়, বরং অনেক এবং অসংখ্য। কোরান-এ ‘সুবুলানী’ তথা আমাদের পথগুলি কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। উনত্রিশ নম্বর সূরা আনকাবুত-এর উনসত্তর নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এবং যাহারা আমাদের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমরা তাহাদিগকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহে (সুবুলানা) পরিচালিত করিব।’

আল্লাহর পথসমূহই তথা পথগুলিই সিরাতিম্ম মুস্তাকিম। অধম লিখকের মনে হয়, এই সিরাতিম্ম মুস্তাকিম দ্বারা সহজ-সরল পথ অনুবাদ করাটি সঠিক হয়

কি না সন্দেহ। কারণ, এই পথসমূহ তথা সিরাতিল মুস্তাকিম তথা 'সুবুলানা' তৌহিদের বিনিয়াদের উপর দৃষ্টায়মান। এই পথের পথিকেরাই ধ্যানসাধনায় বিরাট ধৈর্যসহকারে অবস্থানটি গ্রহণ করে। কারণ, নফস খান্নাসযুক্ত মোহের আবরণে আবিষ্ট হয়ে বস্তুর প্রতি চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং এই চঞ্চলতা হতে মুক্তিলাভ করে তৌহিদের বিনিয়াদে অবস্থান করার উদ্দেশ্যে ধ্যানসাধনা ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা আছে কি না আমাদের জানা নাই। কারণ, খান্নাসের মোহ-মায়ার কুমন্ত্রণায় বস্তুর উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করতে পারলেই খান্নাসের কুমন্ত্রণার ধোকাবাজি হতে মুক্তি পাবার সম্ভাবনাটি অবস্থান করে এবং এই ধ্যানসাধনার ফলে নফস মোহ-মায়ায় ভীত ও চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে না। 'এস্তেকামাত' হতে মুস্তাকিম। 'এস্তেকামাত'-এর অর্থটি হলো ধীরতা, স্থিরতা, অটলতা, অচঞ্চলতা। সাধকদের ধ্যানসাধনায় নফসের উপর চঞ্চলতাটি ধীরে-ধীরে কমে আসে এবং তৌহিদের বিনিয়াদে ধৈর্যসহকারে অগ্রসর হতে থাকে এবং ইহাকেই সিরাতিল মুস্তাকিম বলা হয়। সুতরাং, কেমন করে এবং কীভাবে সাধকদের জন্য এই পথগুলো অথবা এই পথটি সহজ এবং সরল হতে পারে?

৫. তানজিলাল (নাম্নানো, অবতীর্ণ করা, প্রত্যাদেশ, ব্যক্তকরণ, রহস্যোদ্ঘাটন, প্রকাশ করা, ফাঁস করা, প্রকটিত করা, দৈববাণী, অতিপ্রাকৃত উপায়ে লব্ধ জ্ঞান, নাজিল করা, অবতরণ, নিচে নামানো, পদাবনতি) আজিজ (প্রবল ক্রমতাবান, শক্তিমান, বিস্ময়কর, অতিশয়, প্রবল, বিশাল, প্রচণ্ড, অতীব কার্যকর, প্রগাঢ়, সম্মানিত, শ্রদ্ধেয়, বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, লক্ষণীয়, স্মরণীয়, শক্তিশালী, জোরালো, তেজী, বলিষ্ঠ, দৃঢ়, অটল, শক্ত, কড়া, মাইটি, পাওয়ারফুল, ডিসটিংগুইশড, স্ট্রং, নোট্যাবল, রেসপেক্টেড) রাহিম (মোহেরবীন, রহমতওয়ালা, দয়ালু, করুণাময় অনুগ্রহশীল, দয়াপরবশ, অনুকম্পাশীল, মার্শিফুল, কমপ্যাশিওনেট)।

ষ্ট (ইহা) প্রবল ক্রমতাবান রাহিম (হইতে) নাজেল।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে 'আজিজ' শব্দটির অর্থ নিয়েছি প্রবল ক্রমতাবান। যদিও আল্লাহই একমাত্র ক্রমতাবান, তবু 'প্রবল' শব্দটি শক্তি বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হলো। যেহেতু আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্য তৌহিদে বাস করে তথা সমস্ত কিছু তারই, সুতরাং একমাত্র ক্রমতাবান বলাটাই সঠিক। কারণ, আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্যে কাহারও কোনো বিদুমাত্র ক্রমতা নাই, যদিও জিন এবং মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সামান্য স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি আল্লাহ কর্তৃকই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং, সর্বোচ্চ পর্যায়ে দর্শন করলে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও ক্রমতা নাই এবং থাকবার কথাও নয়। সুতরাং, প্রবল শব্দটি নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গির দর্শনে একটি সামাজ্যিক শব্দ, যদিও সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য প্রবল শব্দটি ব্যবহার করতে বাধ্য হলাম। অতিরিক্ত একটি ধূলিকণারও বলবার কোনো উপায় নাই যে সেই ধূলিকণাটি যত ছোটই হোক না কেন উহা আল্লাহ হতে সম্পূর্ণ আলাদা তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন মহিমায় মহিমাবিত। যদি এই অতিরিক্ত ধূলিকণাটি কিছু একটা বলতে পারত তা হলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর সঙ্গে শেরেক করত তথা অংশীদারিত্বের কথাটি ঘোষণা করতে পারত। তাই বলা হয়ে থাকে 'লা শারিকা লাহ' - তথা, নাই কোনো শরিক একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। আপন নফসের সঙ্গে যে মোহ-মায়ার খান্নাসটিকে আর্টেপুর্চে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই খান্নাসই মানবজাতিকে অনেক রকম কুমন্ত্রণা দিয়ে শেরেকের পথে নিয়ে যায় তথা অংশীদারিত্বের দাবিটি তুলে বসে। এ-জন্যই শেরেক করা একটি কবির গুনাহ। দুইয়ের মাঝে তৌহিদ থাকে না। আবার ঠিক সে-রকমভাবে একের মাঝে শেরেক থাকে না। সুতরাং, কোরান-এর দর্শন (ফিলসফি) খান্নাসযুক্ত দুনিয়ার

বিনিয়াদের উপর বলা হয় নি। তৌহিদের পথে কেমন করে আসা যায়, কেমন করে জানা যায়, কেমন করে বোঝা যায় তারই ভিত্তিটি হলো কোরানুল

হাকিম। সুতরাং, 'সিরাতিম মুস্তাকিম'-এর উপর যে-বুনিয়াদ উহাতে খান্নাসমূহ মোহ-মায়ীর দুনিয়াটি থাকতে পারে না। তাই এখানে রহিম-রূপী আল্লাহর কথাটি বলা হয়েছে। রহিম-রূপটি আল্লাহর বিশেষ দান। কারণ, রহস্য উদ্ঘাটনের প্রশ্নে তথা খান্নাস হতে মুক্ত করে তোহিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে গেলেই আল্লাহ রহিম-রূপটি ধারণ করেন। সুতরাং, আল্লাহর রহিম-রূপ হতেই রহস্যসমূহ উদ্ঘাটন করা হয় তথা যে-সার্বিক যতটুকু গভীরে প্রবেশ করতে পারে ততটুকুই আল্লাহ রহিম-রূপে দান করে থাকেন। এই দানকেই নাজেলের দান বলা হয়। এই নাজেলকেই বাংলাভাষায় দৈববাণীও বলা হয় অথবা রহস্য উদ্ঘাটনের দরজাপুলো একে-একে খুলে দেওয়া হয়। এই অবদান রহিম-এর অবদান। এই অবদান মোটেও রহমান-এর অবদান নয়। কারণ, ইতর প্রাণী হতে সর্বভূতে তথা সর্বঅস্তিত্বে যে-দানটি অবস্থান করে উহাকেই রহমান-এর দান বলা হয়। সুতরাং, রহমান-রূপে হলো সাধারণ দান এবং পক্ষান্তরে রহিম-এর দানটি হলো রহস্যের দরজাপুলো খুলে দেবার দান। অথচ রহমান-রূপেরও দান এবং রহিম-রূপেরও দান, কিন্তু দুটো দানের মাঝে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্যটি বিরাজ করছে উহা সবার চোখে ধরা না পড়ারই কথা। এতগুলো কথা জানবার পরেও অনেকেই তো ধ্যানসাধনার মাধ্যমে খান্নাসমূহ তোহিদি বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করা জীবনদর্শনটিকে গ্রহণ করার মানসে এগিয়ে আসতে পারে না। এই পারে-না-টাই তকদির। এই পারে-না-টাই আল্লাহর লীলাখেলা। এই পারে-না-টার জন্যই দুনিয়ার বুকে যত অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলতা, শঠতা, ষোকাবাজি, হীনস্বার্থ উদ্ধারের মত্ততা, হিংস্র প্রতিযোগিতা, আফালনের কুৎসিত অহঙ্কার ইত্যাদি বিষয়গুলো আছে বলেই এত আয়োজন। জেনেও জানে না, বুঝেও বোঝে না, দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, ধ্রুবসত্য জেনেও এগিয়ে আসে না - ইহা কত উচ্চ স্তরের বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে তাহা আজও দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারে নি, বরং বিনাবাক্যে অকপটে অনেকেই স্বীকার করে গিয়েছে যে ইহা বিজ্ঞান বহির্ভূত আরেকটি বিজ্ঞান, যাহা আমাদের জানা নাই। ইট ইজ সায়েন্স বিয়ন্ড সায়েন্স।

৬. লিতুনজিরা (সতর্ক করিবার জন্য, সতর্ক করিতে, বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়ার জন্য, মৃদু ভৎসনা করিবার জন্য) কণ্ডমাম (কণ্ডমকে, সম্প্রদায়কে জাতিকে) মা (না, কি, যে, যাহা, নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত, যদি, নাই, নি, নয়, কত, কোন), উন্জিরা (সতর্ক করা, বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া, মৃদু ভৎসনা করা) আবায়ুহম (তাহাদের বাপ-দাদা, তাহাদের পিতৃপুরুষ, তাহাদের পূর্বপুরুষ) ফাইম (সুতরাং তাহারা) গাফিলুন (অমনোযোগী, অসতর্ক, উদাসীন, গাফেল, বেখবর, অন্যমনস্ক)।

প্ট কণ্ডমকে সতর্ক করার জন্য, না সতর্ক করা হইয়াছে তাহাদের বাপ-দাদাদেরকে, সুতরাং তাহারা গাফেল।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই একটি কথা বলতে হয় যে, প্রতিটি জাতির নিকট তথা কণ্ডমের নিকট সতর্ককারীরূপে নবি-রসুলদেরকে পথপ্রদর্শনের জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। এই কথাটির উপর ভিত্তি করে অনেকেই কোরান-এর মাঝে আত্মবিরোধী কথা অথবা সাম্প্রদায়িক কথাগুলো আবিষ্কার করতে চায়, কিন্তু ইহা মোটেও আত্মবিরোধী অথবা সাম্প্রদায়িক বিষয় নয়। কারণ, প্রতিটি কণ্ডমের জন্য যে নবি-রসুলদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য পাঠানো হয়ে থাকে এই কথাটি যেমন সত্য, তেমনি আবার ইহাও একটি সত্য কথা যে, যদি কোনো কণ্ডমের জন্য একান্তই নবি-রসুল পাঠানো না হয়ে থাকে তা হলে তাদের উপর অজ্ঞতার অন্ধকারই কেবলমাত্র থেকে যায়। এই অজ্ঞতার অন্ধকারে অবস্থান করার দরুন সেই জাতি মানুষের রূপে অনেকটা পশুর তুল্য তথা জীব-জানোয়ারের মতো। জীব-জানোয়ারকে শাস্তি দিলেই কী, আর না দিলেই কী - উহা যেমন মর্মে-মর্মে অনুধাবন করতে

পারে না, সেই রকম যে-জাতির উপর কোনো নবি-রসূল পাঠানো হয় নি তাদের দশাও একই রকম।

নামাজ বেহেশতের চাবি - এই কথাটি যেমন সত্য আবার নামাজেরও যে চাবি আছে এবং সেই চাবির নামটি হলো 'তাহারত' তথা পবিত্রতা - উহাও জানা না থাকলে অনেক সময় বিভ্রান্তির ঘোর-প্যাচে পড়ে যেতে হয়। সুতরাং, নামাজের বিষয়টিতে নামাজ যে-রকম বেহেশতের চাবি বলে প্রচার করা হয় তার সঙ্গে নামাজের চাবিও যে তাহারত তথা পবিত্রতা ইহারও প্রচার করে দিলে সমস্ত বিষয়টি ধারণার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায়। আবার, নামাজও যে দুই প্রকার - ইহাও অনেকে জেনেও জানে না, বুঝেও বোঝে না। যেমন, ওয়াক্টিয়া নামাজ এবং দায়েমি নামাজ। কোরান-এ এ-জন্যই ওয়াক্টিয়া নামাজের কথাটি একটি স্থানেও উল্লেখ করা হয় নাই যে, ওয়াক্টিয়ার হিসাবটি ধরলে দেশের অধিক ওয়াক্টিয়া নামাজের কথাটি এসে পড়ে। কিন্তু কোরান-এর সত্তর নম্বর সূরা মারিজ-এর তেইশ নম্বর আয়াতে দায়েমি নামাজের কথাটি পাওয়া যায়। এখন কেহ যদি দায়েমি নামাজের কথাটি অস্বীকার করে ওয়াক্টিয়া নামাজকেই একমাত্র নামাজ মনে করে তা হলেও বলার কিছু থাকে না। আমরা সমাজ-পরিবর্তনের মাঝে অনেক সময় অনেক দিনের প্রচলিত কথাগুলোকেও বদলিয়ে ফেলি বিভিন্ন রকম কথার মারপ্যাচ ও সুন্দর ফতোয়ার মাধ্যমে। যেমন হাজার বছরের প্রচলিত 'খোদা হাফেজ' শব্দটিকে 'আল্লাহ হাফেজ' করে ফেলা। কারণ, আধুনিককালের আলেম-উলামারা ফতোয়া দিয়েছেন এই বলে যে 'আল্লাহ হাফেজ' বলার মাঝে অনেক সওয়াব ও নেকি আছে যাহা 'খোদা হাফেজ'-এর মধ্যে নাই। খাজা গরিব নেওয়াজ, মণ্ডলানা জালাল উদ্দিন রুমি, বাবা শামসে তাবরিজ, হজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালি এবং আল্লামা ইকবাল-এর মতো বিশ্ববিখ্যাত ইসলামের চিন্তাবিদেরা এ-জন্যই 'খোদা হাফেজ' বলেছিলেন যে তাদের জানা ছিল না যে, 'আল্লাহ হাফেজ' বলার মাঝে এত নেকি, এত সওয়াব রয়ে গেছে!

অথচ ভারতে আজ হতে প্রায় আট শত বছর পূর্বে চার কোটি লোকের বসবাস ছিল। সেই অথচ ভারতে অবস্থানরত চার কোটি মানুষের মধ্যে জৈন ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, অগ্নি উপাসকের ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং মূর্তিপূজার ধর্ম বিদ্যমান ছিল। খাজা গরিব নেওয়াজ এই চার কোটি লোকের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার করে বিরানবাই লক্ষ মুসলমান বানিয়ে গেছেন। সমগ্র কোরান-এর বর্ণিত সমস্ত নবির মিলেও খাজা বাবার বারো ভাগের এক ভাগ মুসলমান বানাতে পারেন নাই, অথচ ওনার মতো বিশ্ববিখ্যাত ওলি কেমন করে 'আল্লাহ হাফেজ' বলার মাঝে এত সওয়াব, এত নেকির কথাটি ভুলে গেলেন! আমাদের মাঝে অনেক ইসলাম-গবেষকদেরকে দেখতে পাই, তারা কেবল ছুর-ছুর করেন এবং গভীরভাবে গবেষণা করেন কি না জানি না। অগ্ন-পশ্চাৎ, ভালো-মন্দ কোনো কিছু চিন্তার ধার না ধরে যা মনে আসে তাই লিখে ফেলেন। অবশ্য ইহারও প্রয়োজন আছে বৈকি! বিভ্রান্তি না থাকলে সত্যের জন্য পরিশ্রম করতে হয় না। ডেজাল আছে বলেই খাটির কথাটি আসে। অন্ধকার আছে বলেই আলো গুরুত্ব বহন করে। সুতরাং, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বিক দর্শনের উপর ভর করেই তো আল্লাহর লীলাখেলাটি ছুটে চলছে। ধরতে পারাটাও ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আবার অবহেলা করাটাও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তবে কি তা বিবর্তনবাদের আপেক্ষিকতায় ভাসমান? বিবর্তনবাদের আপেক্ষিকতার দর্শনটি তুলে ধরলে কিছু-কিছু জ্ঞান-গবেষকের মনোমধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে এবং অনেক রকম চিন্তাচিন্তিতে মজে ওঠে। ইহাও তো আল্লাহরই লীলাখেলা। পৃথিবীর সর্বোচ্চ এভারেস্ট শৃঙ্গটির ওপর দাঁড়িয়ে কেহ কি চিন্তা করতে পারে যে, দুই কোটি বছর আগে ইহাই ছিল একটি গভীর সমুদ্র যাকে টেথাস ওশেন বলা হয়? তা হলে কি এই এভারেস্ট শৃঙ্গটিকে দুই কোটি বছরের আপেক্ষিক বিবর্তনবাদের সত্য বলে ধরে

নিতে পারি না? আনুমানিক পাঁচ কোটি বছর আগে পৃথিবী নামক গ্রহের সম্মারূপে যারা বিচরণ করত তারা ছিল ডাইনোসর। সেই ডাইনোসরের জামানটি কি একটি বিবর্তনের আপেক্ষিক সত্য বলে ধরে নিতে পারি না?

অবশেষে, যে-কণ্ঠকে তথা যে-জাতিকে সতর্ক করার জন্য কোনো নবি-রসূলই পাঠানো হয় নাই সেই জাতিকে খুব বেশি হলে গাফেল অথবা অলস বলা যায়। এর বেশি কিছু বলাটা কী আত্মবিরোধী নয় অথবা সাম্প্রদায়িক নয়? পাঠকদের কাছেই বিচারের ভারটি তুলে দিলাম।

উমাইয়া এবং আব্বাসীয়া রাজবংশটি ইসলামের উপর যে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে উহা অন্য ধর্মের অনুসারীরা কল্পনাও করতে পারে না। ইসলাম ধর্ম-দর্শনের সার্বজনীন ভাবটিকে অন্ধকার স্রু গলির মধ্যে ঢাকনার পর ঢাকনা দিয়ে সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র বৃত্তে এমনই তুচ্ছ করে প্রকাশ করে গেছে যে মহানবিকেও আমরা সাধারণ মানুষরূপে প্রচার করার কায়দা-কৌশলগুলো রপ্ত করে ফেলেছি। আফসোস, অন্য যে-কোনো ধর্মে ধর্মের প্রবর্তককে লুপ্ত তথা প্রভু বলে সম্বোধন করা হয়, অথচ মহানবিকে বড় ভাই, চোখুরী, এমনকি মুচি-চাম্বারের সঙ্গেও তুলনা করার জঘন্য দৃষ্টান্তগুলো দেখতে পাই। সুতরাং, সাতাল্লিখ মুসলিম দেশ আজি কোথায়, কোন পতনের বিপ্লুতে দাঁড়িয়ে আছি উহাও কি বলে দিতে হবে?

৭. লাকাদ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে) হাক্কাল (সত্য, যথার্থ, প্রকৃত, নির্ভুল, হক, সঠিক, বাস্তবিকই, সত্যসত্যই, প্রকৃতপক্ষে, আসলেই, নিশ্চিত, প্রমাণিত, যথার্থ, টু, অথেনটিক, রিয়াল, কারেক্ট, ড্যালিড, ট্রুথ) কাওল (কথা, উক্তি, বাণী, বচন, বাক্য, মন্তব্য, বক্তব্য, বর্ণনা, মত, ঘোষণা, প্রতিবেদন, ওয়ার্ড, স্পিচ, সেইং, রিমার্ক, স্টেটমেন্ট, ডিক্লারেশন, রিপোর্ট, অ্যাকাউন্ট, টিচিং, ডকট্রিন) আলা (উপরে, উপরে, প্রতি, দিকে, অভিমুখে, বিষয়ে, সম্পর্কে, যুক্ত হইয়া, ভিত্তি করিয়া, ততোধিক, অধিকতর, উচ্চে, অধিকতর উচ্চে, উর্ধ্বদিকে, বিষয়ে, সম্পর্কে, অন, আপন, ওভার, এবাভ) আক্সারিহিম (তাহাদের অধিকাংশ, তাহাদের বেশিরভাগ) ফাহম (সুতরাং তাহারা) লা (না) ইউমিনুনা (ইমান আনিবে, বিশ্বাস স্থাপন করিবে)।

প্ট নিশ্চয়ই (এই) কথাটি তাহাদের বেশিরভাগের উপরেই সত্য, সুতরাং তাহারা ইমান আনিবে না।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে কিছুটা বিবৃত বোধ করতে হয় কি! কারণ, যে-জাতির বা সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ নবি-রসূল প্রেরণ করেন নাই সেই জাতি অথবা সম্প্রদায়ের উপর শুভ এবং অশুভ বিষয়টি ধর্তব্যরূপে গৃহীত হয় না। তবে এ-কথাটিও সত্য যে এই জাতির অনেকেই ইহুদি এবং খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন। স্বয়ং মহানবি (সা.)-এর পিতা-মাতাও হানাফাইট খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারী ছিলেন বলে জানতে পারি। যদিও উমাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজবংশ মহানবি (সা.)-এর পিতা-মাতাকে পৌত্তলিকতার যুগকাঠে ফেলে সাস্বেসার করে দেবার ইন এবং জঘন্য প্রচারটি করে গেছে যাহার ধকল আজও, এই আধুনিক যুগেও, কিছু-কিছু লোকের মন-মগজে ঢুকে আছে।

ইসা নবি (আ.) যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য নবি হয়ে থাকেন তা হলে বলার কিছু থাকে না। কিন্তু ইসা নবি (আ.) কি আসলেই একটি জাতির জন্য নবি, নাকি সমগ্র পৃথিবীর মানুষদের জন্য নবি - এই বিষয়টি একদম নিরপেক্ষ হয়ে ভেবে দেখা দরকার। কারণ, পৃথিবীর এমন কোনো দেশ ও জাতি নাই যেখানে ইসা নবি (আ.)-এর অনুসারী কম-বেশি পাওয়া যায় না। সবাই যদি আপন-আপন দলীয় সাইনবোর্ডটি কাঁধে নিয়ে বহন করি তা হলে সার্বজনীন শব্দটি কি আত্মবিরোধী অথবা সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়ে না? সঙ্কীর্ণ মন ও মানসিকতা মানুষকে অন্ধ গলিতে ঠেলে দেয় এবং সার্বজনীনতার

মহাবাণীটি মানব-সমাজ হতে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। অথবা সার্বজনীনতার নামে এই পৃথিবীর বুকে যত ঠেলাঠেলি, লাঠালাঠি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে গেছে ইহারও কি দলিল দিতে হবে? দীর্ঘ ক্রুসেডের যুদ্ধে সমগ্র মানবজাতিকে চোখে আঙুল দিয়ে কি বুঝিয়ে দেওয়া হয় নাই? যদি ধরে নেই, আরব জাতির মধ্যে কোনো নবি-রসুলের আগমনটি ঘটে নাই, তা হলে তারা ইমান আনয়ন করবে না কথাটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ধরে নিলাম, আরব জাতির মধ্যে কোনো নবি-রসুলের আগমন ঘটে নি, তা হলে তারা ইমান আনয়ন করবে না কথাটি কি সাময়িক হয়ে দাঁড়ায় না? দলীয় সাইনবোর্ড কাঁধের উপর অবস্থান করার দরুন আমরা ইসা নবিকে বিশ্বনবিরূপে গ্রহণ করে নিতে দ্বিধাবোধ করি। সুতরাং, পরিশেষে অধম লেখককে একান্ত বাধ্য হয়ে বলতে হলো যে এই আয়াতটির মর্মার্থ আমরা জানা নাই।

৮. ইননা (নিশ্চয়ই আমরা, অবশ্যই আমরা, নিঃসন্দেহে আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে]) জাআল্না (আমরা করিয়াছি, আমরা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, আমরা দিয়াছি, আমরা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি [বহুবচনে বলা হয়েছে]) ফি (মধ্যে, মাঝে, তে, এ, অভ্যন্তরে, ভিতরে, বিষয়ে, সম্বন্ধে, কালে, সময়ে, ইহাতে, অভিমুখে, প্রতি, ইন, উইদীন, অ্যাম্মাঙ, নেয়ার) আনাকিহিন্ন (তাহাদের ঘাড়গুলি, তাহাদের গলাসমূহ, তাহাদের গর্দানগুলি) আগললান (বেঁটনীগুলি, গলাবন্ধনীসমূহ, বেড়িগুলি, শিকলগুলি [‘গুলন’ শব্দের বহুবচন হলো আগললান]) ফাহিয়া (সুতরাং, তাহা) ইলান (দিকে, প্রতি, নিকটে, পর্যন্ত, নাগাদ, অবধি, ট, টয়র্ড, আপ টু, অ্যাজ ফর অ্যাজ, টিল, আনটিল) আজ্জানি (চিবুকগুলি, খুতনিগুলি, ওঁঠদুয়ের নিম্নদেশসমূহ, চিন) ফাহম (সুতরাং তাহারা) মুকমাহন (মাথা উঁচু করিয়া থাকা, উর্ধ্বমুখী, মুখ উপরে তুলিয়া রাখা, তাহাদের মাথা উঁচু করা ইইল)।

৯. নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] করিয়াছি তাহাদের ঘাড়গুলির মধ্যে বেড়িগুলি, সুতরাং তাহা চিবুকগুলির দিকে, সুতরাং তাহারা মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে।

১০ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের শব্দগুলো রূপকের মতো এবং ব্যাকারের শৈলী ছড়ায়, কিন্তু আসলে অতি সহজ কথা। কথাগুলো দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপন নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসের মোহ-মায়ার কুমন্ত্রণায় বস্তুবাদের শক্ত বেড়িগুলো নিজের ঘাড়ের উপর চেপে বসে এবং ইহাই অধ্যাত্মজ্ঞানের দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেয় এবং ইহার ফলে মানুষের মাঝে রহস্যের সত্যের উদয় হতে পারে না। এখানেও একটি কথায় ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, কারণ বস্তুবাদ কোনো নেতিবাচক দর্শন নয়। নেতিবাচক দর্শনটি তখনই আরোপিত হয় যখন মায়ারূপী খান্নাসটি বস্তুবাদের উপর আরোপিত হয়। কারণ, বস্তু তোহিদে বাস করে। সুতরাং, তোহিদে বাস করা বস্তুবাদটি মোটেই কলুষিত (করাপটেড) নয়। কলুষিত বস্তুবাদ (করাপটেড স্টেরিয়ালিজম) তখনই পরিগণিত হয় যখন খান্নাসরূপী মায়াজি ওই বস্তুবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তথা লোভনীয় করে তোলে। সুফিবাদ আল্লাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো একটি মতবাদ নয়, বরং আল্লাহর গভীর নৈকট্যের মাঝে নিজেকে তথা আপন নফসটিকে ফানা করে দেবার ধ্যানসাধনাটিকে সুফিবাদ বলা হয়। যদিও শুনতে আলাদা মনে হয়, আসলে আল্লাহকে আপন নফসের উপর পূর্ণরূপে জাগ্রত করে তোলার ধ্যানসাধনার নামটিই হলো সুফিবাদ। যেমন প্রধানত চারটি মাজহাব আছে : হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি এবং হাম্বলি মাজহাব। এই চারটি মাজহাবের নামগন্ধও কোরান-হাদিসের কোথাও নাই, অথচ এই চারটি মাজহাবই কোরান এবং হাদিসের উপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়েছে। কোনো মাজহাবেই কোরান-হাদিসের বাইরে কিছু বলা হয় নাই। এমন কি কোনো-কোনো মাজহাবের ইমাম বলেই ফেলেছেন যে, যদি আমরা দেওয়া

দলিলগুলো হতে আরও উন্নত, আরও মর্যাদাকর দলিল পাও তা হলে আমার দলিলটিকে অবহেলা করলেও আমার পক্ষ হতে কোনো প্রকার আপত্তি থাকবে না। সুতরাং, কোনো মাজহাবেই আল্লাহ এবং নবি-রসুলের আদেশ-উপদেশের বহির্ভূত কোনো মনগড়া কথা নাই এবং থাকতে পারে না। অবশ্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রস্নে এদিক-সেদিক হতে পারে এবং এই এদিক-সেদিক হওয়াটাই একান্ত স্বাভাবিক এবং না হওয়াটাই একান্ত অস্বাভাবিক।

সংশয় তথা বিভ্রান্তির দিকে মানুষকে আল্লাহ তৈলে দেন না তথা চালনা করেন না। এই সংশয়, এই বিভ্রান্তি রচিত হয় মায়া নামক খান্নাসের কুমন্ত্রণায়। এই লোভ-লালসার মোহবন্ধনটি নফসটিকে এমনভাবে আর্টেপুর্টে জড়িয়ে ফেলে যে আপন নফসের মধ্যে অধ্যাত্মজ্ঞানের বীজটি চারাগাছরূপে গজিয়ে ওঠার সব কয়টি পথ বন্ধ করে ফেলে। এবং ইহারই ফলে মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সত্য লাভ করার দরজাগুলো আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়। পূর্বজন্মের কর্মফলের তকদিরে গড়া মানুষটির তখন সত্যপথের রহস্যময় জ্ঞানের দেশে আর পৌছিয়ে যাবার উপায়টি থাকে না। তবে ইহাও একটি সত্য কথা যে, সব রকম অলসতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পথে দৃঢ়সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হতে পারলে মহান আল্লাহ রহিম-রূপ ধারণ করে আপন করে নেন। তাই একটি মানব-জীবনের প্রতিটি কাজের মাঝেই তাকে সজাগ থাকতে হবে। কোথা হতে এই সজাগ? এই সজাগ কি বাহির হতে? না, কখনোই না। এই সজাগ থাকার অর্থ হলো, আপন নফসটি হতে মায়াবী খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দেবার তরে অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলার তরে ধৈর্যধারণ করে একাগ্রমনে ধ্যানসাধনাটি করে যেতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রতিটি কর্মই একেকটি উপাসনা তথা এবাদত। এই এবাদত, এই উপাসনা নিরবচ্ছিন্ন। সুতরাং, দায়েমি সালাত। এই দায়েমি সালাতটিকে যারা অবহেলা করে নির্দিষ্ট কয়টি সময়ে কয়টি উপাসনার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চায় তারা রহস্যের সত্যটি তথা রহস্যময় জ্ঞানের মাঝে ডুব দিতে পারে না। বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দরজাগুলো মনের অজান্তে একে-একে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে এবং পরিশেষে হা-হতাশের নির্বোধের আচার-আচরণগুলো ফুটে ওঠে। এভাবেই আমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিত পালন করেও আপন নফস হতে খান্নাসের আবরণটি ভেঙে ফেলে দিয়ে তোহিদের মাঝে ডুবে যেতে পারি না। তাই সব কথার শেষ কথাটি হলো, কোরান-এর চল্লিশ নম্বর সূরা মোমিন-এর ষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক কী অপূর্ব, কী বিজ্ঞানময় ভাষায় পৃথিবীতে বাস করা মানুষগুলোকে ছোট্ট একটি বাক্যে বিরাট একটি উপদেশ এবং বলতে গেলে একমাত্র উপদেশটি দিয়ে গেলেন, আর তা হলো, ফাকালারাব্বুকুম উদউনি আসতা জেবলাকুম – তথা, ‘সুতরাং তোমাদের রব বলিলেন, আমি তোমাদের একা ডাক (দুইজনের ডাক শুনি না। তথা তুমি ও খান্নাস থাকলে দুইজন হয়ে আছ। সুতরাং খান্নাসটিকে তাড়িয়ে একা হও) অবশ্যই সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদেরকে জবাব দেব।’ দুইজন হলে ‘উদউনা’ হয়, তখন আর ‘উদউনি’ থাকে না। এই আয়াতে ‘উদউনা’ বলা হয় নি তথা ‘দুইজনে ডাক’ বলা হয় নাই, বরং বলা হয়েছে একা ডাক। অবশ্যই সঙ্গে-সঙ্গে ডাকার জবাবটি পাবে।

আমি কি সত্যিই আপন নফস হতে নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছি? আমি কি সত্যিই দুধের সঙ্গে মাখন যে-রকম মিশে একাকার হয়ে থাকে সেই রকম আমারই নফসের সঙ্গে যে-খান্নাসটি মিশে আছে সেই খান্নাসটিকে মুসলমান বানাতে পেরেছি অথবা তাড়িয়ে দিতে পেরেছি? এই প্রশ্নের উত্তর নিজের কাছে, এই প্রশ্নের দেদীপ্যমান সাক্ষ্যটি তো নিজেই। নূরি ময়খের নূরময় আলোকরশ্মি আপন নফসের মাঝেই যখন পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তখনই ধ্যানসাধনায় রত থাকা মুনি-ঋষি-সাধু-সন্ত-ওলি-গাউস-কুতুব-আবদাল-আরিফেরা বলে ফেলেন : অনিল হক ;

লাইসা ফি জুব্বাতি সেওয়া আল্লাহুতায়াল্লা; আনা সুবহানি মা আজ্জামুশশানি; ইমানাম ইয়ারাম কি আন্ধার নুরে হক ফানি সুদাম; চুজুমলা ফানা গাসিতে বতু হেচুনামুন্দাহ, খাহে কে আনাল্লাহে বণ্ড খাহেকে হয়ল্লাহি; সোহহম সোহমি; তুই মুই, মুই তুই; আলিফ মে লাম নাহি আউর লাম মে আলিফ নাহি; না আল্লাহি হয়ি না বাক্কা হয়ি, না হা হয়ি না ই হয়ি; জব আদম না বুদে তো মান বুদাম, জব হাওয়া না বুদে তো মান বুদাম ওয়া জাতে খোদা না বুদে তো মান বুদাম।

সূত্রাং, সর্বপ্রথম কথাটি হলো এবং সর্বশেষ কথাটিও হলো, মাত্র একটি কথা, মাত্র একটি বাক্য আর তা হলো – আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে অপবিত্র খান্নাসটিকে পরীক্ষা করার জন্য যে দেওয়া হয়েছে উহাকে তথা খান্নাসটিকে তাড়িয়ে দাও অথবা মুসলমান বানিয়ে দাও। ইহাই ইসলামের মূল দর্শন। সমগ্র কোরান-এর তিরিশটি পারাই একটিমাত্র উপদেশ দিয়ে গেছে আর সেই উপদেশটিও হলো ওই একই কথা ওই একই প্রাচীন আগমন, ওই একই মধ্যযুগীয় আগমন, ওই একই আধুনিককালের আগমন, ওই একই একবিংশ শতাব্দীর অত্যাধুনিক আগমন। মাহবুবে এলাহি হজরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রধান খলিফা হজরত আমির খসরুর আবিষ্কৃত ঝুমরি রাগে মাত্র চারটি শব্দ আর সেই শব্দ চারটি হলো ‘দেখো রিনা মানে সাম্মা’ – এই চারটি শব্দের দ্বারা দুই হাজার পাঁচশত ভিন্ন-ভিন্ন সুরের মুর্ছনায়, সুরের শৈলীতে যখন ওস্তাদ নাজাকীত আলি আর ওস্তাদ সালামত আলি আজ হতে বায়ান্ন বছর আগে ঢাকা স্টেডিয়ামে গেয়েছিলেন তখন সমস্ত শ্রোতারা অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

৯. ওয়া (এবং, ও, আর) জাআলনা (আমরা করি [বহুবচনে বলা হয়েছে], আমরা করিয়াছি, আমরা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, আমরা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি, আমরা দিয়াছি) মিন্ (হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্য হইতে, অপেক্ষা, দ্বারা, যাবৎ, এর) বাইনি (মধ্যে, মাঝে, মাঝখানে, মধ্যবর্তী স্থানে, মধ্যবর্তী সময়ে, দুইয়ের মধ্যে, পরস্পরের মধ্যে, বহুর মধ্যে, অভ্যন্তরে, ভিতরে, বিটুইন, এমাং, অ্যামিড্‌স্ট) আইদিহিম্ (তাহাদের হাতগুলি, তাহাদের হস্তসমূহ) সাদ্দা (প্রাচীর, দেয়াল, প্রতিবন্ধক, বাধ, প্রতিবন্ধকতা, বাধা, বুক, ব্যারিয়ার, অবস্টাকশন, অবস্টাকল, ব্যারিকেড, ড্যাম) ওয়া (এবং, ও, আর) মিন্ (হইতে, থেকে, চেয়ে) খালফিহিম্ (তাহাদের পিছনে, তাহাদের পশ্চাতে, মুখের বিপরীত দিক, ব্যাক, রিয়ার) সাদ্দা (প্রাচীর, দেয়াল, প্রতিবন্ধক, বাধ, প্রতিবন্ধকতা, বাধা, বুক, ব্যারিয়ার, অবস্টাকশন, অবস্টাকল, ব্যারিকেড, ড্যাম) ফায়াগ্‌শাইনাহম্ (সূত্রাং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাদিগকে উপর হইতে ঢাকিয়া দিয়াছি, সূত্রাং আমরা তাহাদিগকে আহত করিয়াছি, সূত্রাং আমরা তাহাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়াছি, সূত্রাং আমরা তাহাদিগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছি) ফাহম্ (সূত্রাং তাহারী) লা (না) ইয়ুবসিরুন (তাহারা দেখিতে পায়)।

স্ট এবং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] দিয়াছি তাহাদের মধ্য হইতে দেওয়াল এবং তাহাদের পিছন হইতে দেওয়াল সূত্রাং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] ঢাকিয়া দিয়াছি তাহাদেরকে সূত্রাং তাহারী দেখিতে পায় না।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতটির একদম সাদামাটা ব্যাখ্যা লিখতে গেলে মনে হবে যে আল্লাহ মুখতার দেয়াল সামনে ও পেছনে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ইহা আসলে মোটেও সত্য নয় এবং গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, আল্লাহ কোনো প্রকার আকাম-কুকামের কুপরামর্শ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তা হলে এই আকাম-কুকাম যে করে তার নামি হলো শয়তান। এই শয়তানের আবার চারখানা রূপের ভড়ং-চড়ং। কুমন্ত্রণাদাতারূপে শয়তানের যে-রূপটি সেই রূপটির নাম হলো খান্নাস এবং সেই কুমন্ত্রণাটি মোহ-মায়া উপর ভিত্তি করেই

দেওয়া হয়। সুতরাং, মোহ-মায়াই আবরণ, প্রাচীর এবং সূক্ষ্ম দেয়াল যাহা শক্তভাবে অবস্থান করছে অথচ খালি চোখে দেখার উপায় নাই। পূর্বজন্মের কর্মফলের হিসাব-নিকাশ নিয়েই পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই পুনরায় জন্মগ্রহণ করাটিকেই কোরান-এর ভাষায় কেয়ামতে সগিরা বলা হয়েছে তথা একজন মানুষের মৃত্যুটাই তার জন্য ছোট কেয়ামত। এই বিষয়টি অনেকেই বুঝেও বুঝতে চায় না। কারণ, বিজাতীয় ধর্মের গন্ধটি থেকে যায় বলে ইহা ইতে মুক্ত থাকার জন্য গোজামিলের ধানাই-পানাই-মার্কী ব্যাখ্যা ও খাপছাড়া কথাবার্তা দিয়ে ভরে রাখা হয়। অতি সত্য কথাটি যদি একান্তই বলতে হয় তা হলে বলতে হয় যে মানুষ জাহান্নামে যাবে না, বরং মানুষ জাহান্নামে বাস করছে। ইহা একটি ঘটমান বর্তমান কাল যাকে ইংরেজিতে প্রজেক্ট কনটিনিউয়াস টেস বলা হয়। আমরাও ইচ্ছা করেই 'জাহান্নামে আছে' না বলে 'জাহান্নামে যাবে' বলি। কারণ, তা হলে মানুষেরা হয়তো বলতে চাইবে যে জাহান্নামটি তো মোটামুটি ভালোই লাগছে। এই জাহান্নামের আশ্রয়ের যে প্রচণ্ড জ্বালা-যন্ত্রণা উহা গৈরিক দাবদাহ অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাত অথবা কেমিকেলের গুদামের লেলিহান অগ্নিশিখার চেয়েও কোটি-কোটি গুণে ভয়ঙ্কর এবং বিভীষিকাময়। কারণ, এই জাহান্নামের আশ্রন চোখে দেখা যায় না। কত ভয়ঙ্কর এই জাহান্নামের আশ্রনের দাহটি! কতখানি অসহ্য হতে পারলে একটি মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে, বিষপান করে অথবা অন্য যে-কোনো পন্থায় আত্মহত্যাটি পর্যন্ত করে ফেলে। কত বড় ভয়ঙ্কর জাহান্নামের দহনটি অগ্নির মাঝে জ্বলতে পারলে মানুষ নিজের হাতে নিজেকে হত্যা করে ফেলে। কারণ, জাহান্নামের আশ্রন বাড়িঘর জ্বালায় না, জাহান্নামের আশ্রন জামাকাপড়, আসবাবপত্র জ্বালায় না, এমনকি জাহান্নামের আশ্রন দেহটিকেও জ্বালায় না। জাহান্নামের আশ্রন কেবলমাত্র একটি জিনিসই জ্বালায় এবং জ্বালাতে ভালোবাসে : সেই জিনিসটির নাম হলো মানুষের অন্তর, মানুষের হৃদয়। সুতরাং, সামনে এবং পেছনে যে-অজ্ঞতার দেয়াল দাঁড় করানো হয়ে থাকে এবং অজ্ঞতার অন্ধকারের বলয়ে ঘিরে ফেলা হয় উহা পূর্বজন্মের কর্মফল তথা কেয়ামতে সগিরার কর্মফল।

প্রতিটি নফস পবিত্র, কিন্তু ওই পবিত্র নফসের সঙ্গেই যখন খান্নাসটির অবস্থান বিরাজ করে তখনই পবিত্র নফসটি কলুষিত নফসে পরিণত হয়ে যায়। ইংরেজি ভাষায় বলা হয় করাপটেড অর পলিউটেড অর ম্যাকিউলেটেড অর ব্রেমিশ ফ্যাকালটিস অ্যান্ড সেসেস। সে-রকমভাবে বস্তুবাদ পবিত্র, যাকে ইংরেজিতে মেটেরিয়ালিজম বলা হয়। কিন্তু সেই বস্তুবাদের উপর যখন 'কলুষিত' শব্দটি আরোপিত হয়, যখন 'পাপপূর্ণ' শব্দটি বসানো হয়, যখন 'আবিল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যখন 'দূষিত' শব্দটি বস্তুবাদকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখনই বস্তুবাদ আর পবিত্র থাকে না। সে-রকমভাবে সুফিবাদের উপর যখন খনকারি, কবিরাজি, আড়-ফুক, তাবিজ-তুহা, জিন তীড়ানোর ভড়ং-চড়ং, মাটি বাবা, জুতা বাবা, গাছ বাবা, পানি বাবা ইত্যাদি বিষয়গুলো আরোপিত হয় তখন সুফিবাদও কলুষিত হয়ে যায়, কলঙ্কিত হয়ে যায়, দূষিত হয়ে যায়, পাপপূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং, অভিজ্ঞতার শর্তে একই বিষয়ের আশ্রন দুটো দিক দেখতে পাই : একটি ইতিবাচক, অপরটি নেতিবাচক। একই স্টিলে সার্জনের ছুরি এবং কুসাইর ছুরি তৈরি হয়। একজনে কাটে বাচাবার জন্য, অপরজন কাটে গোস্ত বিক্রি করার জন্য। একই গান, একই মিউজিকের সমাহার নিয়ে আদনান সামির গজল শোনার জন্য হাজার-হাজার টাকার টিকিটে মানুষ যায়, আবার একই গানে একই মিউজিকের সমাহারে অধম লেখক গজল গাইতে গেলে কুকুরসমূহের ঘেউ-ঘেউ শব্দটি শুনতে হয়। তাই ভগবান কৃষ্ণের জন্য যে-বিষয়টি লীলাখেলা উহাই আরেকজনের জন্য অনৈতিক কর্ম। বিষয় একটি, কিন্তু দর্শনের ভিন্নতা অনেক। এই দর্শনের ভিন্নতার বহু ধারা-

উপধারাগুলো মানুষকে কত রঙ-রূপ, মায়া-মরীচিকায় ফেলে দিয়ে বৈতালিক প্রেতনৃত্যে নাচিয়ে চলছে! এই কলুষিত বস্তুবাদের মাঝে চোখের স্বাভাবিক চাহনিগুলো মোটেই হারিয়ে যায় না। মোটেই হারিয়ে যায় না জ্ঞানগর্ভতা। কেবলমাত্র হারিয়ে যায় মনের অজ্ঞানতাই হারাই ভিতরের অগ্নিদৃষ্টির মহাসত্যটি। সুতরাং, বস্তুবাদের প্রাচীর যখন অস্তরটিকে চারদিক হতে ঘিরে ফেলে, তখন গভীরে গমন করার দর্শনটি অপসুষমাণ হতে থাকে। সুতরাং, পরিশেষে ওই একটি কথাই ভাঙা রেকর্ডের মতো, ওই একটি কথাই ইজরত আমির খসরুর চুমুরি রাগে 'দেখো রিনা মানে সাম্মা'র মতো বলতে হচ্ছে যে, আপন পবিত্র নফসে অবস্থানরত অপবিত্র খান্নাসরূপী শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে মুক্ত হবার তরে, তিরিশ পারা কোরান মাত্র একটি উপদেশই দিয়েছে।

১০. ওয়া (এবং, ও, আর) সাওয়াউন (সম্মান-সম্মান, উভয় দিক হইতে সম্মান হওয়া, ইকুয়াল, বি ইকুয়াল, টি বি ইকুইভ্যালেন্ট, মেক ইকুয়াল, টি ইভেন, লেভেল) আলাইহিম (তাহাদের উপর) আ আনজারতাহম (আপনি তাহাদেরকে ভয়ের বাণী শুনাইয়াছেন, আপনি তাহাদেরকে সাবধান করেন কি?) আম্ম (অথবা, কি, নয় তো, আর, বা, কিংবা, নাকি) লাম্ম (না, নাই, নি) তুনজিরহম (আপনি তাহাদেরকে সতর্ক করুন) লা (না) ইয়ুমিনুন (তাহারা ইমান আনিবে)।

স্ট এবং আপনি তাহাদেরকে সতর্ক করুন কি না-ই করুন - তাহাদের উপর সম্মান, তাহারা ইমান আনিবে না।

১ ব্যাখ্যা : আপন নফসের তথা আপন প্রাণের তথা আপন জীবনের গুঢ় তাৎপর্য অথবা মর্ম বুঝবার যে-আকাঙ্ক্ষাটি থেকে যাবার কথা উহা থেকেও থাকে না। প্রতিটি মনিষ এই দুর্বোধ্য গুপ্ত তত্ত্বটি কমবেশি বুঝতে পারে, কিন্তু বুঝবার পরও অনুসন্ধান করার ইচ্ছাটি থেকেও থাকে না, জেনেও জানতে চায় না, বুঝেও বুঝতে চায় না। কেন? কী তার কারণ? আপন-আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে পরীক্ষা করার তরে যে-শয়তানটিকে খান্নাসরূপে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া হয়েছে, সেই খান্নাসটিকে মোহ-মায়ায় কুমন্ত্রণার খপ্পরে পড়ে আপন নফস হতে আলাদা করার ইচ্ছাটি থাকলেও ইচ্ছাটি প্রয়োগের অলসতায় জড়িয়ে পড়ে। কেন 'দুর্বোধ্য গুপ্ত তত্ত্ব' শব্দগুলো ব্যবহার করলাম, কেন 'গুঢ় তাৎপর্য অথবা মর্ম' শব্দগুলো ব্যবহার করলাম উহারও একটি কারণ আছে, আর সেই কারণটি হলো, কী বিশ্বয়কর বিজ্ঞানময় পদ্ধতিতে আল্লাহ প্রতিটি নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন যে, দুধেরই মাঝে মাখন লুকিয়ে থাকার বিষয়টি বুঝেও বোঝা যায় না, দেখেও দেখা যায় না। কারণ, ধ্যানসাধনার দায়েমি সালাতের মাধ্যমে সাধনা করার বিষয়টি পরিষ্কার জানা থাকলেও মোহ-মায়ায় কুমন্ত্রণার ফাদে পড়ে রহস্য উদ্ঘাটনের অগ্রযাত্রায় অলসতার মাঝে গা ভাসিয়ে দেয়।

প্রতিটি নফস ভালো করেই জানে যে আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার উৎস এবং মুখে-মুখে এই কথাগুলো মেনেও নেওয়া হয়। কিন্তু ইমানের কাজে তথা আপন সন্তায় আপন প্রভুটিকে দেখে নেবার কাজে অগ্রসর হয় না। মুখের স্বীকৃতি এবং ধ্যানসাধনা করার স্বীকৃতির মাঝে এখানেই বিরাট পার্থক্য। এই পার্থক্যটি নিজেই ধরতে হয় এবং অপরের দ্বারা ধরাটি সম্ভবপর নয়। তবে কামেল গুরুর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু কামেল গুরু চুপ করে কেবলই চেয়ে দেখবেন অথবা মৃদু আস্থান জানাবেন। এর বেশি নয়।

পরিশেষে, একটি কথা বলেই শোধ করে দিতে চাই যে, খান্নাসরূপী শয়তানের কুমন্ত্রণায় মোহগ্নস্ত নফসটির তথা মানুষটির আল্লাহর কালাম এবং গুঢ় তাৎপর্য অথবা মর্মটি জানবার এবং বুঝবার আর কোনো দাম থাকে না। তখন সব কিছু জেনে-শুনেও মোহ-মায়ায় অপরাধে নিজেকে জর্জরিত করে ফেলে। তখন কেহ আর চায় না দুধের উপর কিছুকণ অবিরাম গতিতে চরকি

পরিচালনা করে দুধ হতে মাখনটিকে বাহির করে আনার প্রকাশ্য দৃশ্যটি দেখে নিতে।

আউজবিলাহি মিনাশ শায়তোয়ানুর রাজিম - তথা পাথরের আঘাত খাওয়া শয়তান হতে আশ্রয় চাই কথাটি লক্ষ্যবাহু পড়লেও যেমন আশ্রয় পাওয়া যায় না, তেমনি ওই দুধের উপর চরকাটি কিছুরূপ না ঘুরিয়ে দুধ হতে মাখনটিকেও বাহির করা যায় না। ইহাই বাস্তব সত্য। ইহাই চোখের নিরেট দর্শন। ইহাই দিগন্তের সত্য তথা উলঙ্গ সত্য। এখানে পোশাকটি সত্যের অবগুণ্ঠন, সত্যের প্রাচীর, সত্যের আবরণ। সুতরাং, জীবনের এই গুঢ় তাৎপর্য অথবা মর্মটি বুঝে নেবার তরে একটি ধ্যানসাধনা করার স্থল খোলার প্রয়োজন আছে কি না এবং প্রয়োজন থাকলে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রয়োজন আছে কি না উহা পাঠকের উপরই বিচারের ভারটি তুলে দিলাম। এবং আমরা যে পচিশ বিঘা জমির উপর ধ্যানসাধনা তথা মোরাকিবা-মোশাহেদা করার তরে একটি স্থল খুলেছি সেই স্থলটির উন্নয়নকল্পে সাহায্য সহযোগিতাটি কি চাইতে পারি না? তবে ইহাও একটি সত্য কথা যে মহাপাপীদের প্রচুর ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মহাপাপের দরুন যুক্তি-তর্কের মায়াজাল তৈরি করে সাহায্য-সহযোগিতা করা হতে মুখ ফিরিয়ে নিতে হবেই। কারণ, ইহাও যে অদৃশ্য তকদিরেরই লীলাখেলা তা বুঝবার কোনো উপায় থাকে না।

১১. ইন্নামা (নিশ্চয়ই কি, বস্তুত, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে, ইহা ব্যতীত নহে, প্রকৃতপক্ষে, আসলে) তুন্জিরু (আপনি ভয় দেখান, আপনি ভয় দেখাইবেন, আপনি সতর্ক করেন, আপনি সাবধান করেন) মানিত্ (যে, কেউ, কাহারও) তাবাত্ (অনুসরণ করে, মানিয়া চলে, পরে আসা, অনুগামী হওয়া, পিছনে চলা, অধীন হওয়া, লাগিয়া থাকা, ধাওয়া করা, চলা) জিক্রা (জিকির, সংযোগ, স্মরণ, যোগাযোগ, উপদেশ, বয়ান, আলোচনা) ওয়া (এবং, আর, ও) খাশিয়া (ভয় করা, আশঙ্কা করা, ভীত হওয়া, তটস্থ হওয়া, ভয় দেখানো, সতর্ক করা, ফ্রাইটেন, অ্যালার্ম, স্কেয়ার, টেরিফাই, ড্রেড, বি অ্যাফরেইড, ফিয়ার) রাহমানা (রহমানকে) বিল্গাইবি (অদৃশ্য, দেখা যায় না এমন, দৃষ্টির অগোচর, লুক্কায়িত, গোপন, গুপ্ত, গায়েবি)।

প্ট আসলে আপনি সতর্ক করুন যে জিকিরের অনুসরণ করে এবং গায়েবি রহমানকে ভয় করে।

+ ফাবাশশিরহ (সুতরাং তাহাকে আপনি সুসংবাদ দেন) বিমাগফিরাতিন (কুমার সহিত, মার্জনার সহিত, মাকের সহিত, সহিষ্ণুতার সহিত, তিতিকার সহিত, নিবৃত্তির সহিত, কুপার সহিত, দয়ার সহিত, ক্ষান্তির সহিত, অনিহুতার সহিত, ওদারের সহিত) ওয়া (এবং, ও, আর) আজুরিন্ (পারিশ্রমিক, প্রতিফল, মহা পুরস্কার, প্রতিদান, কর্মফল, শ্রমফল, পারিতোষিক, মজুরি, বেতন, সম্মানি, সওয়াব) কারিম (করিম, সম্মানিত, মর্যাদাবান, মূলবান, মহৎ, উদার, দানশীল, দাতা, মহানুভব, বদান্য, অতিথিপরায়ণ, অভিজাত, সম্মান, সদাশয়, বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, নোবল, ডিসটিংগুইশড, এমিনেন্ট, জেনারাস, লিবারাল, হসপিটাল, বেনিফিসেন্ট, বেনিফ্যাক্টর, কাইন্ড, এমিকেবল, অবলাইজিং, প্রেশিয়াস, রেসপেকটেবল, অনারেবল, ডিসেন্ট, প্রেশিয়াস, ভ্যালুয়েবল, কস্টলি)।

প্ট সুতরাং তাহাকে সুসংবাদ দিন মাগফেরাতের সহিত এবং সম্মানজনক পারিশ্রমিকের।

১ ব্যাখ্যা : যে-ব্যক্তির মাঝে হেদায়েত পাবার সামান্যতম ইচ্ছাটিও থাকে না সেই রকম ব্যক্তিকে আল্লাহ অথবা আল্লাহর নবি-রসুল এবং আল্লাহর ওলিরা কেহই হেদায়েতের মাধ্যমে সঠিক পথে আনতে পারেন না এ-জন্য যে সেই ব্যক্তিটিকে জীবনচলার পথে একটি সুনির্দিষ্ট সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি পূর্বেই দান করার কথাটি ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুনিয়ার জীবনে যত রকম

দানই আল্লাহ দৃষ্টির অগোচরে থেকে রহমানরূপে করে থাকেন উহা নিছক পরীক্ষা করার জন্যই দান করা হয়ে থাকে। সুতরাং, এই পরীক্ষামূলক দানটিকে বলা হয় রহমানের দান। এই দানটি সাধারণ দান। এই দানটি ক্রমার আগের দান। এই দানটি কখনোই ক্রমার পরের দান নহে। কারণ, ক্রমার পরে যে-দানটি করা হয় উহা বিশেষ দান। এবং এই বিশেষ দানটিকে বলা হয় রহিম-রূপের দান। সুতরাং, দানের প্রশ্নে মিল থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ দান ও বিশেষ দানের মধ্যে থেকে যায় বিরাট একটি পার্থক্য।

যিনি অথবা যে-ব্যক্তি আপন রবের সংযোগে লিপ্ত থাকার তরে কিছুদিন ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তথা মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে অগ্রসর হতে থাকে সে অবশ্যই রহিম-রূপী আল্লাহর ক্রমাটি লাভ করে রহস্যজগতে অবস্থান করতে পারে। প্রথমে অদৃশ্য রহমানের প্রতি ইমানের দৃঢ়তা বন্ধে ধারণ করে ধ্যানসাধনার পথে অগ্রসর হবার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে নিতে হয়। তারপর একদিন রহিম-রূপী আল্লাহর বিশেষ ক্রমাটি লাভ করতে পেরে রহস্যের জগতে অবস্থান করতে পারে। ইহাই বিধির বিধান। এই বিধান বদল করা হয় না তথা সুন্নাতাল্লাহি লা তাবদীলা। সুতরাং, প্রথম পদক্ষেপেই অদৃশ্য রহমানের উপর ইমান আনয়ন করে তথা বিশ্বাস স্থাপন করে অগ্রসর হতে হয় এবং পরিশেষে আপন রবের সহিত মিলনে ঘটে পরিসমাপ্তি। এই পরিসমাপ্তির অপর নামই মোমিন। প্রথমটি আমানু, শেষটি মোমিন। কোরান-এর আট নম্বর সূরা আনফাল-এর উনিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ যে মোমিনদের সঙ্গে আছেন বলেছেন, ইহাই তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১২. ইন্ন (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে) নান্ন (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে]) নুহিল (জীবিত করা, জীবনদান করা, আমরা জীবনদান করি) মাওতা (মৃত, বিগতপ্রাণ, জীবনশূন্য, নফসহারা, প্রাণহীন, যে-দেহ হইতে নফসকে আলাদা করা হইয়াছে তাহাকে মৃত অথবা মরা বলা হয় [রুহকে নয়। কারণ, রুহ মারা যায় না। অনেক ভুল করে নফস-এর বদলে রুহ শব্দটি ব্যবহার করে। কারণ, রুহ মারা যায় এমন একটি আয়াত কোরান-এর কোথাও নাই। আবার অনশ্রিত শব্দটিও সম্পূর্ণ একটি আত্মবিরোধী শব্দ। কারণ, অনশ্রিত বলতে বোঝা যায় কোনো কিছু নাই, তথা শূন্য। শূন্য হতে কোনো কিছুই সৃষ্টি করা যায় না, ইহা সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত।) ওয়া (এবং, আর, ও) নাক্তুব (আমরা লিখিয়া থাকি [এখানেও বহুবচনে বলা হয়েছে। তবে এই লিখে রাখার মাঝে যে-গোপন কথাটি থেকে যায় উহা হলো, একটি পার্থিব জীবনের সব রকম কাজ-কাম তথা কর্মফলগুলো লিখে রাখা হয় এবং পুনরায় আরেকটি দেহধারণের মাধ্যমে তা ভোগ করতে হয়। সুতরাং, দেহ তথা শরীর তথা লাশটি এবং নফসটি তথা প্রাণটি এক বিষয় নয়, দুটোই সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। নফস যখন দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তথা পৃথক হয়ে যায় তখনই সেই দেহটিকে লাশ বলা হয়) মা (যাহা, না, কি, যে, নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত, যদি, যা, নাই, নি, নয় কত, কোন) কাদ্দাম্ব (আগেই তাহারা পাঠাইয়াছে) ওয়া (এবং, আর, ও) আসারা (পদচিহ্ন, পদাক্ষ, পায়ের ছাপ, প্রামাণিক সাক্ষ্য, গমন পথ, যে-পথ দিয়া যাওয়া হইয়াছে, যে-চিহ্ন রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে, চলাচলের ফলে সৃষ্ট পথ, সঙ্কেতচিহ্ন, প্রতীক, স্মারকচিহ্ন বা নিদর্শন, বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন, ছাপ, চিহ্ন, ট্রেস, সাইন, মার্ক) হম্ম (তাহাদের)।

প্ট নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচন] - আমরা জীবিত করি মৃতকে এবং আমরা [বহুবচন] লিখিয়া রাখি যাহা আগেই তাহারা পাঠাইয়াছে এবং তাহাদের পদচিহ্ন (কীর্তি) সমূহ।

+ ওয়া (এবং, আর, ও, অধিকন্তু) কুল্লা (সমস্ত, সকল, প্রত্যেক, প্রতিটি, সর্ব, এক-এক করিয়া সমুদয় [এই শব্দটি শব্দ হিসাবে একবচন, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে বহুবচন। তাই বাক্যের ব্যবহারে ইহা উভয়বচনেই ব্যবহৃত হয়])

সমগ্র, সমুদয়, গোটা) শাইয়িন্ (বস্তু, কিছু, জিনিস, বিষয়) আহসাইনাহ (আমরা বিহবচনে বলা হয়েছে) তাহা গণনা করিয়া রাখিয়াছি, আমরা তাহা হিসাব করিয়া রাখিয়াছি, আমরা তাহা সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছি) ফি (মধ্যে, মাঝে, ভিতরে) ইমামিন্ (নেতা, প্রধান, ইমাম, যার অনুসরণ করা হয়, হকুমদাতা, নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালক, প্রভু, মালিক, নায়ক, সর্দার, কর্তা, শাসিক, রাজা, শিক্ষক, গুরু, মনিব, পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, ওস্তাদ, পণ্ডিত, বিশারদ ব্যক্তি, লিডার, মাস্টার) মুবিন্ (স্পষ্ট, সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য, নির্দোষ, নিখুঁত, দৃঢ়তর, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, প্রকাশিত)।

স্পষ্ট এবং সকল বিষয় (তাহা) আমরা [বিহবচন] সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছি ইমামের মধ্যে (যিনি) প্রকাশ্য।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই আমরা মৃতকে জীবিত করি। অর্থাৎ, যার প্রাণ নাই তথা নফস নাই তাকে নফস তথা প্রাণ দান করি। কেহ-কেহ তো না-বুঝে না-শুনেই রুহ দান করার কথাটিও বলে ফেলেন। এই জীবন, এই প্রাণ, এই নফস প্রাণহীনকেও যেমন দান করা যায়, তেমনি চেতনাবিহীন জড়পদার্থ হতেও জীবন সৃষ্টি করা যায়। আবার, মৃতকেও পুনরায় নফস তথা প্রাণটি দেওয়া যায়। দেহ তথা শরীর হতে নফসকে তথা প্রাণটিকে পৃথক করে দেওয়া অথবা সরিয়ে দেওয়াকেও মৃত বলা হয়। আবার নফসটিকে তথা প্রাণটিকে পুনরায় মরণের পরে দেহের মাঝে প্রবেশ করানো যায়। একটি দেহ বিবর্তনবাদের অধীন। আজ যে শিশু আগামীতে সে-ই যুবক, তারপরে বৃদ্ধ। সুতরাং, কোনো দেহই বিবর্তনবাদের ধাক্কা হতে মুক্ত নয়। অবশ্য আল্লাহর ওলিদের প্রশ্নে ব্যতিক্রম। কারণ, কাহাফে বাস করা আল্লাহর ওলিদের দেহগুলো তিনশত নয় বছর পরেও তিক একই রকম ছিল তথা বড়ো হয়ে যাবার বিবর্তনবাদের ধাক্কাটি স্পর্শ করে নি। সুতরাং, বিবর্তনবাদের ধাক্কাটি যেমন সত্য, তেমনি বিবর্তনবাদের ধাক্কার কোনো ধার না ধারবার বিষয়টিও একদম সত্য। আমরা সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিবর্তনবাদের ধাক্কাটিকে মেনে নেই, কিন্তু বিবর্তনবাদের ধাক্কাটিও যে দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে যেতে পারে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি কাহাফে বাস করা ওলিদের মাঝে দেখতে পাই। আল্লাহর ওলিরা দেহের মাঝেই বাস করেন এবং বিবর্তনের ধাক্কাগুলো খেয়ে যান, কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহর ওলিরা যে-কোনো স্থানে যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো পরিবেশে, যে-কোনো দেহ ধারণ করে উপস্থিত হবার ক্ষমতাটি অর্জন করতে পেরেছেন বলেই ইনারা আল্লাহর ওলি।

এখানে একটি দেহ হতে মৃত্যু-ঘটনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হবার পর পুনরায় দেহের মধ্যে নফসটিকে প্রবেশ করার কথাটি বলা হয়েছে। সুতরাং, সেই দেহটি শিশুর দেহ হতে পারে। যুবকের দেহ হতে পারে। বৃদ্ধের দেহ হতে পারে, আবার শুষ্ক-কীটে অতীব সূক্ষ্মরূপে অবস্থানও করতে পারে। এখানে নির্দিষ্ট বয়সের একটি দেহের কথা বলা হয় নাই, বরং বলা হয়েছে দেহ হতে মৃত্যু-ঘটনার মাধ্যমে নফসকে বিচ্ছিন্ন করার পরও পুনরায় একটি দেহের মধ্যে নফস তথা প্রাণটিকে ঢুকিয়ে দেবার কথাটি। পুনর্জন্মবাদ তথা কেয়ামতে সগিরা তথা ব্যক্তি-মৃত্যুর ঘটনাটি যদি সরাসরি অস্বীকার করা হয় তা হলে প্রাচীনকালের মুনি-ঋষি হতে বেশ কয়েকটি ধর্মের মাঝে যে পুনর্জন্মবাদের কথাটি অতি স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে উহা মিথ্যা হয়ে যায়।

প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিদের ভবিষ্যদ্বাণী, বেদ-এর বাণী এবং আরও অনেক বাণীতে আমরা মহানবির আগমনবার্তাটি জানতে পারি। মহানবির আগমনের বার্তাটি আমরা আনন্দের সঙ্গে প্রচার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এতটুকুই বিরোধিতা করি পুনর্জন্মবাদের দর্শনটিকে তথা কেয়ামতে সগিরাটিকে। তা হলে কি উহা প্রশ্নবিদ্ধ হয় না যে, যাহা আমাদের কথা বলে উহা নির্রেট সত্য, আর যাহা আমরা বুঝতে না পেরে ভুল বুঝি উহা নির্রেট মিথ্যা? ইহাতে কি

আমাদের বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের মাঝে যে ধর্মীয় সাইনবোর্ডগুলো জন্মসূত্রে কাধের উপর ঝুলছে উহাই কি সমর্থন করছি না? তা হলে সার্বজনীনতার অবস্থানটি কোথায় থাকে? গণ্ডির বলয়ে অবস্থান করে গণ্ডির চিহ্নাধারাটিকে সার্বজনীন আশ্রয়নটিকে কি আমরা সবাই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রচার করছি না? তা হলে কি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগুলোতে জন্মগ্রহণ করাটাই আজন্ম তকদির? যে-জাতি তাঁর নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করে না সেই জাতির ভাগ্য আল্লাহ কখনোই পরিবর্তন করেন না। একটি-একটি করে মানুষ দিয়েই তো একটি জাতি হয়। তা হলে কি ভাগ্যটি পরিবর্তন করার ইশারা-ইঙ্গিত করা হচ্ছে না? অবশ্য এই ভাগ্য পরিবর্তনযোগ্য ভাগ্য। এই ভাগ্য তকদিরে মূবরাম তথা অপরিবর্তনীয় ভাগ্য নয়।

পরিশেষে, কোরান-এর সাতষটি নম্বর সূরা মুল্ক-এর দুই নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, কে তোমাদের মধ্যে সুন্দর আমল করে তোমাদেরকে এই পুরস্কা করার জন্য তিনি মরণ এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন। এই মরণ এবং জীবনের গোপন রহস্যটুকু বুঝবার, জানবার সামান্যতম আগ্রহটি প্রকাশ না করে খান্নাসের কুমন্ত্রণায় লেভি-মোহের মাযার বন্ধনে দুনিয়ার জীবনটি মৃত্যু-ঘটনা দিয়ে ইতি টানাটাও কি একটি তকদির? এই তকদির ছিন্তা করার উরে অনেকেই এগিয়ে আসে। তবে কেহ পারে, কেহ পারে না। পারাটাও তকদির, না পারাটাও তকদির। সুতরাং, সব কথার শেষ কথাটি হলো, চরম সত্যে কোনো গালি নেই, কোনো বকুনি নেই – আছে কেবল একটিমাত্র দর্শনের পিতা দর্শন, একটিমাত্র ফাদার অব দ্য ফিলোসফি আর সেটা হলো, যেমনি নাচাও তেমনি নাচি।

এই আয়াতের শেষ অংশে বলা হয়েছে ইমাম তথা মাস্টার বা প্রভু অথবা পিতা। সেই কবেকার উমাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজবংশের জাতাকলে পড়ে ইমাম শব্দটিকে নেতা, মাস্টার অথবা প্রভু মেনে না নিয়ে কেতাব অনুবাদ করা হয়েছে এবং আজও সেই অনুবাদের ধারাটিকে বহাল তবীয়তে বজায় রেখে চলছে। মুবিন-এর অর্থটি হলো প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট – আর সেই প্রকাশ্য সুস্পষ্ট নেতাকে কেতাব অনুবাদ করে প্রচার করে চলছি। কোথায় একজন প্রকাশ্য ইমামরূপী নেতা আর কোথায় অনুবাদ করা হলো একটি সুস্পষ্ট কেতাব। অথচ, ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, এই আয়াতে কেতাব নামক শব্দটির নাম-গন্ধটিও নাই। তাই মনের অজান্তে অনেক সময় বলতে ইচ্ছা করে যে, গায়ের জোরে গুপ্তা হওয়া যায়, গুরু হওয়া যায় না। আল্লাহ কি প্রতিটি কণ্ঠকে হেদায়েত করার জন্য নেতা নিযুক্ত করেন নাই? আল্লাহর নিয়োজিত সেই নেতাকেই ইমাম বলা হয়। সেই ইমামই হলো সেই কণ্ঠের জন্য আল্লাহর মনোনীত মওলা। অবশ্য যদি কোনো কণ্ঠের নিকট হেদায়েতের বাণী প্রচার করার জন্য কোনো ইমাম অথবা কোনো নবি-রসূল পাঠানো না হয়ে থাকে তা হলে পুরস্কার ও শাস্তির কথাটির প্রশ্নই ওঠে না।

পাঠকদেরকে একটি বিষয় ভেবে দেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করলাম এ জন্য যে, একটিবার চিন্তা করে দেখুন, আরবি ভাষায় ইমাম শব্দটি দিয়ে কোথাও, কোনো স্থানেও কেতাব বলে বোঝাবার একটি নমুনাও নাই। অথচ এই উমাইয়া আর আব্বাসীয় রাজবংশের ইমামকেও কেতাব অনুবাদ করতে সামান্যতম বিবেকের মাঝে আঘাত লাগে নি। এমন জঘন্য পোড়ী কপাইলা একটি মরুভূমির দেশে আল্লাহ মহানবির মতো তুলনাবিহীন নবি পাঠিয়েছেন। এই উমাইয়া-আব্বাসীয়রাই ইমামকে তথা একজন মাস্টারকে তথা একজন প্রভুকে তথা একজন নেতাকে কেমন করে কেতাব বানাতে পারে তারই জঘন্য দৃষ্টিভঙ্গিটি কলঙ্কের তিলকের মতো মুসলিম সমাজে আজও প্রচার হয়ে চলছে। এই ইমামকে কেতাব বানাবার অজ্ঞাতে নানা ডিজাইনের গুল-মারা বিদ্যা আর ব্যাকরণের নানা রকম ডিগ্বাজির ধাক্কাগুলো মুসলিম সমাজ আর

কতদিন দেখে যাবে! এরাই মিথ্যার বস্তা তৈরি করার আনু ওস্তাদ নাগরআলি আর সাগরআলি। এরা কথার মাঝে ইসলাম খোজে। এভাবে যে কোরান-এর কত আয়াতের কত রকম বিকৃত, বানোয়াট মনগড়া অনুবাদ এবং হরেক রকমের টীকা-টিপ্পনি দিয়ে ভরে রেখেছে আশা করি ধরা পড়তে বেশি দিন লাগবে না। অনেকের মুখেই শুনতে পাই যে, অনেক সম্প্রদায় তাদের ধর্মগ্রন্থটিকে বিকৃত করে ফেলেছে। কিন্তু কোরান-কে সামান্যতম বিকৃত করার প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে কী করা হয়েছে? করা হয়েছে আয়াতগুলোর মনগড়া বিকৃত অনুবাদ আর ব্যাখ্যা। তবে সত্যের জয় অবধারিত। সত্য আপন মূর্তিতে ভাসমান হতে আর বেশি দিন লাগবে না, বিশ্বাস করি। মুবিন অর্থটি হলো স্পষ্ট, প্রকাশ্য, দৃঢ়বাহিনী। সেই, মুবিন শব্দটিকে ইমাম-এর স্থলে কেতাব লিখে তার সঙ্গে চাতুর্য মিশিয়ে প্রকাশ্য, স্পষ্ট, দৃঢ়বাহিনী শব্দটিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ যেন এই আধুনিক যুগের কোনো আনু ডাক্তারের প্লাস্টিক সাজার করার মতো।

মহানবির আওলাদে রসুলদেরকে এভাবেই উম্মাইয়া এবং আব্বাসীয় রাজবংশ ধামাচাপা দেবার জন্য কত রকম বিশ্রী কলাকৌশল অবলম্বন করেছে তারই দৃষ্টান্তগুলো ইসলামের ইতিহাস পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়। এজিদের টাকায় বিক্রি হয়ে যাওয়া তিনশত জাদরেল মুফতি-মওলানারা আওলাদে রসুল শহিদে আজম ইমাম হোসায়েনকে পর্যন্ত রাষ্ট্রদ্রোহী ফতোয়া এবং কতল করার ফতোয়াটি দিয়েছিল, সেই ইতিহাস পড়লে ঘণায় শরীর রি রি করে ওঠে।

১৩. ওয়া (এবং, আর, ও) ইদ্রিব (আপনি আঘাত করেন, আপনি বর্ণনা করেন, আপনি বানান, আপনি মারেন, আপনি বানাইয়া দেন, আপনি উদাহরণ দেন, উপমা দেন, আপনি রূপক কাহিনী বর্ণনা করেন, আপনি ধাক্কা দেন, ঝাঁইক) লাহম (তাহাদের জন্য) মাসালান (মেসাল, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, নিদর্শন, নজির, উপমা, নমুনা, প্রমাণ, উল্লেখ, চিহ্ন, উদাহরণস্বরূপ, যেমন, যথা, রূপক কাহিনী, ফর একজাম্পল, ফর ইসট্যাম) আস্তাবান (অধিবাসীরা, নিবাসীরা, বাসিন্দারা, বসবাসকারীরা) কারইয়াতি (লোকালয়, নগর, গ্রাম প্রভৃতি মনুষ্যের আবাস, জনপদ)।

প্ট এবং তাহাদের জন্য বর্ণনা করুন একটি লোকালয়ের বাসিন্দাদের মেসাল।

+ ইজ (যখন, যে-সময়, যেহেতু, কারণ, অতঃপর, হঠাৎ, অকস্মাৎ) জায়াহাল (সেখায় আসেন, সেখানে আসিয়াছিলেন, তিনি তাহার নিকটে আসিয়াছিলেন) মুরসালুন (রসুলেরা, রসুলগণ [এখানে নবিগণ বলা হয় নাই])।

প্ট যখন রসুলগণ সেখানে আসিয়াছিলেন।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে পুরাতন তফসিরকারকেরা তথা যারা ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন তাদের বেশিরভাগই সেই লোকালয়টিকে এশিয়া মাইনরের ভিতরে আনতাকিয়া শহর বলে উল্লেখ করেছেন। সেই লোকালয়ে যে তিনজন রসুলকে পাঠানো হয়েছিল সম্ভবত তাঁরা ইসা নবির শিষ্য ছিলেন। অনেকে তো সেই তিনজন রসুলের নামটিও বলে ফেলেছেন : প্রথম জনের নাম সামউন, তারপর ইউহান্না এবং তৃতীয় রসুলের নাম বুয়াস বলা হয়েছে। যদি ইসা নবির অনুসারী এই তিনজন সেই লোকালয়ে এসেই থাকেন তা হলে তাদেরকে কোনো অবস্থাতেই নবি বলা যাবে না। কারণ, রসুলেরাই নবিদেরকে অনুসরণ করেন, কিন্তু নবিরা রসুলদেরকে অনুসরণ করেন না – যেহেতু নবিরা কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন। তাই ‘নবিইনী’ অথবা ‘আম্বিয়া’ শব্দটি ব্যবহার না করে ‘মুরসালিন’ তথা রসুলের বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। সতরাং, হজরত ইসা নবির আগমনের কথাটি সঠিক বলে মেনে নিতে চাই। অনেকে তো নবি এবং রসুলের এই পার্থক্যটি শত দলিল-প্রমাণ দিলেও মেনে নিতে চান না। আবার অনেকে আজব-আজব কথা পাঠকের সামনে তুলে

ধরে এই বলে যে, রসুল নবি হতে বড়। এখানে কেবলমাত্র একটি কথাই বলতে চাই যে, সমগ্র কোরান-এর একটি স্থানেও একজন ফেরেশতাকে নবি বলে উল্লেখ করা হয় নাই। ফেরেশতা রসুল হতে পারে, কিন্তু নবি হবার প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু ফেরেশতা যত শক্তিরই অধিকারী হোক না কেন এবং যত মাহাত্ম্যই প্রকাশ পাক না কেন এবং যতই আল্লাহর গুণবাচক নুরের (জ্ঞাত-নুরের নহে) তৈরি হোক না কেন, কিন্তু সমগ্র কোরান-এর একটি আয়াতেও ফেরেশতাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব যথা ক্রাউন অব দ্য ক্রিয়েশন বলা হয় নাই। এত কিছু বলার পরেও যারা আমাদের কথাগুলো মেনে নিতে চাইবেন না তাদেরকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নাই।

এই এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত আনতাকিয়া লোকালয়টির যে অধিপতি ছিল সে নাকি মূর্তিপূজা করত। মূর্তিপূজার প্রশ্নেও কিছু কথা থেকে যায়। ধাতুতে তৈরি মূর্তিকেও মূর্তি বলা হয়, আবার অগ্নি খান্নাসমিশ্রিত প্রবৃত্তির প্রতিফলনটিকেও মূর্তি বলা হয়। সেই লোকালয়ের অধিপতির নামটি পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে যে ওনার নাম ছিল ইনতিখাস ইবনে ইনতিখাস ইবনে ইনতিখাস। অর্থাৎ, ইনতিখাসের ছেলে ইনতিখাস এবং ইনতিখাসের ছেলে ইনতিখাস। এমন আজব এবং কিস্তিকিমাকার নামটি অধম লিখক জীবনেও শোনে নি।

পরিশেষে, এই বিষয়ে অনেক কিছুই বলা যায়। কিন্তু এগুলো জেনে কী লাভ হবে? ইহা কি অনেকটা অশ্বভিষ প্রসব করার মতো সাজানো-গোছানো কাহিনী তথা কাসাস হয়ে যায় না? মানুষ ছোট হতে কবরে যাবার আগে পর্যন্ত আসল বিষয় ফেলে গল্প শুনতে বড়ই ভালোবাসে এবং ইহাকেও একটি সুন্দর তকদির বলতে চাই।

১৪. ইজ (যখন, যে-সময়, যেহেতু, কারণ, অতঃপর, হঠাৎ, অকস্মাৎ) আরসালনা (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] পাঠাইয়াছি, আমরা প্রেরণ করিয়াছি, আমরা নিয়োগ করিয়াছি) ইলাইহিম (তাহাদের দিকে, তাহাদের প্রতি, তাহাদের সমীপে, তাহাদের নিকটে, তাহাদের কাছে) ইস্নাইনি (দুইজনকে, উভয়কে, যুগলকে) ফাকাজ্জাবুহমা (সুতরাং তাহারা উভয়কেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল) ফাকাজ্জাজুনা (সুতরাং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] সাহায্য করিলাম, আমরা শক্তি দিয়াছি, আমরা শক্তিশালী করিয়াছি, আমরা জোরদার করিয়াছি, টু বি অর বিকাম সূঃ-পাওয়ারফুল-রেসপেক্টেড; টু বি অর বিকাম রেয়ার, স্ক্রয়ার, বি স্কারলি টু বি ফাউন্ড; টু বি অর বিকাম ডিয়ার, চেরিশড, প্রেশাস) বিসালিসিন (তিনজনের দ্বারা, তিনজনকে দিয়া, তৃতীয়জনকে দিয়া, তৃতীয়জনের দ্বারা) ফাকালু (সুতরাং তাহারা বলিল) ইন্ননা (নিশ্চয়ই আমরা) ইলাইকুম (তোমাদের দিকে, তোমাদের প্রতি) মুরসালুন (রসুলগণ, রসুলেরা)।

স্ট যখন আমরা পাঠাইয়াছি তাহাদের দিকে দুইজনকে, সুতরাং তাহারা দুইজনকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল, সুতরাং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] সাহায্য করিলাম তৃতীয়জনকে দিয়া, সুতরাং তাহারা বলিল নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের দিকে রসুলগণ।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বলা হয়েছে, নবি ইসার অনুসারীদেরকে সাহাবা না বলে হাওয়ারি বলা হতো। এই হাওয়ারিদের মধ্য ইতেই প্রথমে দুইজন রসুলকে (নবি নহেন) হেদায়েতের জন্য আনতাকিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়টি হলো, ওই লোকালয়ের মানুষেরা দুইজনকে রসুলরূপে গ্রহণ করা তো দূরে থাক, বরং অনেক রকম যুক্তি-তর্ক মিশ্রিত কথার দ্বারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল। তাই এই দুই রসুলকে শক্তিশালী করার তরে আরেকজন রসুল পাঠানো হলো। যখন এই তিনজন রসুল তাদের রেসালতের শক্তিশালী প্রমাণি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে তারা আসলেই রসুল তখন ওই লোকালয়ের লোকেরা কিছু অলৌকিক নিদর্শন দেখার পরেও মেনে নিতে অস্বীকার করল এই বলে যে, তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ এবং

আমাদের মতোই তো তোমরা রসুল হয়েও রহমানের দানেই বেঁচে আছ। সুতরাং, তোমরা কেমন করে রসুল হওঁ ইহা আমাদের বুঝে আসে না।

পরিশেষে বলতে চাই যে, নবিদের কথা তো বহু দূরের কথা, বরং আল্লাহর রসুলেরাও যে মোটেও আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নহেন তার দলিল কোরান-হাদিস হতে অনেক তুলে ধরা যায়। আল্লাহর নবি-রসুলেরা কখনোই, কোনো দিনও রহমানের দানের অধীনে থাকেন না, বরং তারা রহমানের মেহমান হয়ে যান। কোরান-এর উনিশ নম্বর সূরা মরিয়ম-এর পঁচাশি নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুঠাকিনদেরকে রহমানের দিকে সমবেত করা হয় অতিথি-রূপে অথবা সম্মানিত প্রতিনিধিদল-রূপে। রহমানের পরীক্ষামূলক দানগুলো লোকালয়ে বাস করা সাধারণ লোকের জন্য, কিন্তু নবি-রসুলদের জন্য মোটেও নয়। নবি-রসুলদের অনেক অলৌকিক পরিচয় পাবার পরেও যে সাধারণ লোকেরা হেদায়েত গ্রহণ করতে রাজি হয় না তাহারও অনেক প্রমাণ তুলে ধরা যায়। এ-জন্যই আমরা দেখতে পাই যে নবি-রসুলদেরকে মিথ্যাবাদী এবং জাদুকর বলে গালি দিতেও সামান্যতম লজ্জাবোধ করে নি।

১৫. কালু (। ওই লোকালয়ের লোকেরা) বলিল) মা (না) আনতুম (তোমরা) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত) বাশারুন (মানুষ, মনুষ্য, মানবজাতি, তুকে, চামড়া, ছাল, উপরের চামড়া, গায়ের রঙ, ম্যান, ম্যানকাইন্ড, স্কিন, এপিডারমিস, কিউটিকল) মিসলুনা (আমাদের মতোই)।

প্ট (লোকালয়ের লোকেরা) বলিল, তোমরা আমাদের মতোই মানুষ ব্যতীত নও।

+ ওয়া (এবং, আর, ও) মা (নো) আনজালা (নাঞ্জিল করিয়াছেন, পাঠাইয়াছেন, প্রেরণ করিয়াছেন, অবতীর্ণ করিয়াছেন) রাহমান (রহমান, অনুগ্রহশীল, দয়াময়, মেহেরবান, অনুকম্পাশীল, করুণাময়, ক্রমাশীল, দরদি, অনুগ্রহশীল, মমতাময়) মিন্ (হইতে, থেকে চেয়ে) শাইয়িন্ (বস্তু, কিছু, জিনিস, বিষয়)।

প্ট এবং নাজেল করেন না রহমান কিছু হইতে।

+ ইন্ (যদি, যদি না, অবশ্যই, নিশ্চয়ই, নহে,) আনতুম (তোমরা) ইল্লা (একমাত্র, কিন্তু, ব্যতীত, বাদে, ছাড়া, তবে, যদি না) তাক্জিবুন (মিথ্যা হইবে, তোমরা অবিশ্বাস করিতেছ)।

প্ট যদিও তোমরা বলিতেছ একমাত্র মিথ্যা (কথা)।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াত হতে এটুকু বোঝা গেল যে, নবি-রসুলেরা কখনোই আমাদের মতো মানুষ নহেন, যদিও খাল্লাস-মিশ্রিত নফস তথা সাধারণ মানুষেরা তাদের মতো করেই ভেবে থাকে। শরীরের গঠন প্রকৃতি একই রকম হলেও অন্য কোনো দিক দিয়েই নবি-রসুলরা আমাদেরকে মতো নহেন। একমাত্র যারা কাকের এবং যারা নফস হতে খাল্লাসটিকে মুক্ত করতে পারে নাই তারাই তাদের মতো মানুষ মনে করবে। খাল্লাস হতে মুক্ত হতে চাইলে আত্মশুদ্ধির জন্য ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম নামক গুণগুলো কেবল থাকিলেই চলবে না, বরং নির্জনে একাকী বছরের পর বছর ধ্যানসাধনার মাধ্যমে খাল্লাস হতে মুক্তি লাভ করা যায়। তবে এখানে একটি সত্য থেকে যায় আর সেই সত্যটি হলো, আল্লাহর রহিম-রূপী দান। এখানে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ইত্যাদি শব্দগুলো ভেলকিবাজিতে পরিণত হয়ে যায়, যদি না ধ্যানসাধনায় মগ্ন হতে পারে। কারণ, মুখের কথায় চিড়া ভেঙ্গে না। চিড়া ভেজাতে হলে যেমন পানির প্রয়োজন, সেই রকম কতগুলো আদর্শ-মার্কা শব্দ মুখস্থ করে কথার নাগরআলি-সাগরআলি হওয়া যায়, কিন্তু আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না। ওলি হতে হলেই অবশ্য-অবশ্যই তাকে নির্জনে কিছুদিন ধ্যানসাধনাটি করতেই হবে।

দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রয়োজনটিকে অস্বীকার করছি না, কিন্তু এই প্রয়োজন যখন সীমা অতিক্রম করে বহুদূরে অবস্থান করে তখনই অধিকাংশ মানুষ আপন

নফসের নিকটে বাস করা খান্নাসের কুমন্ত্রণার মোহ-মায়ায় জড়িয়ে যায়। আত্মশুদ্ধি কথাটি শুনতে ভালোই লাগে। কিন্তু এই আত্মশুদ্ধির ব্যাখ্যাটি দিতে গিয়েই অনেকেই ভুল করে বসেন। কারণ, নিজেকে কোথা হতে শুদ্ধ রাখব? এই প্রশ্নটি নিজেকেই নিজে বারবার করতে হবে। নিজের সাড়ে তিন হাত দেহের অভ্যস্তরের রহস্যগুলোর বিকুবিসর্গ বুঝতে পারলাম না, অথচ অপরদেরকে আত্মশুদ্ধি, সংযম, ধৈর্য, ত্যাগ – শব্দগুলো শুনিতে দিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায়, কিন্তু পরিণামটি দাঁড়ায় একটি বিরাট শূন্য। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও একদির। এই চিল্লাচিল্লি, এই হাসি-কান্না, এই ত্যাগ-সংযমের বচন আণ্ডানো, এই মোহ-মায়ার ফাংফুং, সবই যদি না থাকত তা হলে আল্লাহর লীলাখেলাটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াত?

তাই ওই লোকালয়ের লোকগুলো রসুলদেরকে যা-তা বলতে লাগল। বলতে লাগল, কাল্পনিক বেহেশতের লোভ দেখিয়ে নিজেদের আসল উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যই তো তোমরা এসেছ। ধর্মের বিরুদ্ধে এ-রকম কথাটি প্রাচীনকাল হতে শুরু করে আজও এই একবিংশ শতাব্দীতেও সার্বজনীন একটি তিরস্কৃত্য বলে মনে করতে চাই। আরও মনে করতে চাই যে আমরা মোল্লা দিয়ে মুহম্মদ (স.)-কে বিচার করি, আমরা যাজক দিয়ে যিশু খ্রিস্টকে বিচার করি, আমরা খাদেম দিয়ে খাজা বাবাকে বিচার করি, আমরা পাণ্ডা-পুরোহিত দিয়ে ভগবান কৃষ্ণ আর মহাদেবকে বিচার করি। এই ভুলের বিচারটুকু না থাকলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৌন্দর্যমণ্ডিত লীলাখেলাগুলোর অবস্থানটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় অধম লিখকের জানা নাই।

১৬. কালু (রসুলেরা) বলিলেন) রাববুনা (আমাদের রব, আমাদের সদাপ্রভু, আমাদের প্রতিপালক) ইয়ালামু (জানেন, জ্ঞাত আছেন, বিদিত আছেন, অবগত আছেন) ইন্নুনা (নিশ্চয়ই আমরা) ইলা (দিকে, প্রতি, নিকটে, পর্যন্ত, নাগাদ, অবধি, টু, টুয়ার্ড, আপ টু, অ্যাজ ফার অ্যাজ, টিল, আনটিল) কুম (তোমরা, তোমাদের, তোমাদিগকে, তোমাদেরকে) লামুরসালুন (অবশ্যই আমরা প্রেরিত [পাঠানো বা পাঠিয়ে দেওয়া] রসুল)।

প্ট (রসুলেরা) বলিলেন, আমাদের রব জানেন, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে অবশ্যই পাঠানো রসুল।

১৭. ওয়া (এবং, আর, ও) মা (না, কি, যে, যাহা, নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত, যদি, যা, নাই, নি, নয়, কত, কোন) আলাইনা (আমাদের উপর) ইল্লা (ব্যতীত, বাদে, ছাড়া, তবে, যদি না, কিন্তু, একমাত্র, আনুলেস, একসেন্ট, ওনলি, বাট, নট, আনটিল) বালাপুল (পৌছাইয়া দেওয়া, পৌছানো, উপস্থিত করা) মুবিন (স্পষ্ট, সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য, নির্দোষ, নিখুঁত, দ্ব্যর্থহীন, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, প্রকাশিত)।

প্ট এবং (আর কিছু) নাই আমাদের উপর স্পষ্টভাবে পৌছাইয়া দেওয়া ছাড়া।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই মোমিন কথাটি তুলে ধরলাম, যদিও অনেকেই আমান এবং মোমিনকে না-বুঝে না-শুনে এক করে ফেলতে দেখি। ইহা একটি মারাত্মক ভুল এবং এই ভুলই জন্ম দেয় অপব্যখ্যার ব্যুড়ি। আর এই অপব্যখ্যার ব্যুড়ি একটি সুন্দর বিষয়কে বিতর্কিত করে ছাড়ে। আমার জানা মতে সমগ্র কোরান-এ মোমিন শব্দটি একশত একান্ন বার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে শুধু একটি কথাই বলতে চাই, আর সেই কথাটি হলো, হে ইমানদারেরা, আবার ইমান আনয়ন করো। প্রথমটি সাধারণ ইমান, দ্বিতীয়টি মোমিনের ইমান। এই দুই ইমানের মধ্যে বিরাট পার্থক্যই দেখতে পাই। এক কথায়, মোমিন সেই হয়েছেন যিনি আপন নফস হতে খান্নাসটিকে মুক্ত করতে পেরেছেন। সুতরাং, মোমিন ছাড়া নবি-

রসুলদেরকে নবি-রসুল বলে চিনে নেওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে। মোমিনের যে-ইমান সে-ইমান দ্বারাই নবি-রসুলদেরকে চেনা সম্ভবপর। ওই লোকালয়ের লোকদের কাছে এই তিনজন রসুল তাদের রেসালতের সম্মতি লাভ করতে অকৃতকার্য হয়ে বললেন, তোমরা মেনে না নিলে কী হবে, আসলে সত্যের হেদায়েত সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়াটাই আমাদের করণীয় কর্ম - মানুষেরা ইহা মেনে নিক চাই না নিক, সেই দায়িত্বটি আমাদের নাই। নবি-রসুলদের কথাগুলো যদি কেহই বুঝতে না পারে তা হলে উহা হয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয়। কারণ, একজনও যদি বুঝে নেবার মতো উপযুক্ত মোমিন না থাকে তা হলে সত্যের সম্মানটুকু কোথায় গিয়ে দাড়ায়, অধম লেখকের জানা নাই।

১৮. কালু ([লোকালয়ের লোকেরা] বলিল) ইননা (নিশ্চয়ই আমরা) তাতাইয়ারনা (পাখি অর্পণ করি [অশুভ বা অমঙ্গলের লক্ষণ বা পূর্বাভাস মনে করি, খারাপ ভবিষ্যদ্বাণী করি]) বিকুম (তোমাদের সঙ্গে)।

প্ট (লোকালয়ের লোকেরা) বলিল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সঙ্গে পাখি (অশুভ লক্ষণ) অর্পণ করি।

+ লায়িন্ (অবশ্যই যদি) লাম্ (না) তানতাহ্ (তোমরা ক্লান্ত [বিরত] হও) লানারজমাননাকুম্ (নিশ্চয়ই আমরা তোমাদেরকে পাখিরে আঘাতে মারিয়া ফেলিব) ওয়া (এবং) লাইয়ামাসাননাকুম্ (নিশ্চয়ই তোমাদেরকে স্পর্শ করিব) মিননা (আমাদের হইতে) আজাবুন (আজাব, শাস্তি, নিগ্রহ, দণ্ড, সাজা) আলিম্ (দুঃখজনক, কঠিন, মর্মান্তিক, বেদনাদায়ক, যন্ত্রণাদায়ক, শোচনীয়, কষ্টসাধ্য, পেইনফুল, একিং, খিভাস, স্যাড, সোর, হার্টিং)।

প্ট অবশ্যই যদি তোমরা ক্লান্ত (বিরত) না হও নিশ্চয়ই আমরা পাখিরে আঘাতে তোমাদেরকে মারিয়া ফেলিব এবং নিশ্চয়ই তোমাদেরকে স্পর্শ করিব আমাদের হইতে শোচনীয় আজাব।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে রসুলগণকে লোকালয়ের লোকেরা অশুভের প্রতিনিধি বলে চিহ্নিত করল এবং তাদেরকে এইরূপ রটনা করার অপরাধে আর বেশি দূর এগিয়ে যেতে মানা করে দিল। নিষেধটি যদি অবহেলা করা হয় তা হলে পাখিরে আঘাতে যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দিয়ে তাদেরকে হত্যা করার কথাটিও জানিয়ে দেওয়া হলো। এখানে দেখা যাচ্ছে, পাখির সঙ্গে অমঙ্গল চলে আসার প্রবাদটি সেই যুগেও প্রচলিত ছিল। সুতরাং, অমঙ্গলের বাণীটি পাখির সঙ্গে চলে আসবার কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধবিশ্বাসটি আরবদেশেও অবস্থান করত। আমাদের দেশেও পেঁটার ডাক এবং একসঙ্গে কয়টি কাকের কা-কা শব্দটি অমঙ্গলেরই লক্ষণ বলে আজও অনেকেই বিশ্বাস করে। সুতরাং, এই বিষয়টি কোনো নূতন বিষয় নয়। তবে ইহা বোঝা গেল যে, সেই যুগেও কোনো-কোনো পাখিকে অমঙ্গলের প্রতীক বলে বিবেচনা করা হতো। সুতরাং, সত্য প্রচারের প্রশ্নে যুগে-যুগে কালে-কালে নবি-রসুলদেরকে মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, বরং উল্টা অমঙ্গলের বাণীবাহক বলেই মনে করা হতো এবং কত ধরনের শাস্তি যে দেওয়া হতো সেটারও নিদর্শন আমরা দেখতে পাই।

পরিশেষে, একটি কথাই বারবার মনে পড়ছে যে, সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করাও যেমন বিপজ্জনক, তেমনি সমাজের বুকে প্রচার করাটাও বিপজ্জনক। সাধারণ মানুষেরা অনেকে জানে না যে, কোনো পাখি শুভ এবং অশুভ তথা ভালো-মন্দের কোনো বার্তাই বহন করতে পারে না। কারণ, কোনো পাখিকে নির্বাচন করার কোনো প্রকার ক্ষমতাই দেওয়া হয় নি, বরং প্রতিটি পাখি তাহিদের বাস করে।

১৯. কালু ([রসুলেরা] বলিলেন) তায়িরকুম্ (তোমাদের পাখি [অকল্যাণ, অশুভ, অমঙ্গল]) মাআকুম্ (তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের সাথে)।

প্ট (রসুলেরা) বলিলেন, তোমাদের পাখি (অকল্যাণ, অশুভ, অমঙ্গল) তোমাদের সঙ্গেই (রহিয়াছে)।

+ আয়িন (যদিও কি) জুক্কিরতুম (তোমরা জিকিরে আসিতে, তোমরা যোগাযোগে আসিতে, তোমরা সংযোগে আসিতে)।

প্ট যদিও তোমরা জিকিরে আসিতে।

+ বাল্ (বরং, তবে, পরন্তু, পরোক্ষ, অন্যদিকে, অপরপক্ষে, তাহা হইলে, অতঃপর, তাহার পর) আনতুম (তোমরা) কাওমুম (সম্প্রদায়, জাতি, কওম) মুসরিফুন (সীমালঙ্ঘনকারী, অপব্যয়ী, অমিতব্যয়ী, বাড়াবাড়িকারী, অপচয়কারী [মূলশব্দ 'ইশরাফ' হতে মুসরিফুন হয়েছে])।

প্ট বরং তোমরা অপব্যয়ী (সীমালঙ্ঘনকারী) কওম।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে বর্ণিত রসুলেরা সেই কওমের লোকদেরকে বললেন যে, তোমাদের পাখি তথা অকল্যাণ তথা অশুভ তোমাদের সঙ্গেই আছে। এই পাখি শব্দটি দিয়ে রসুলেরা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তোমাদের নফসের সাথেই খান্নাস-রূপী কুমন্ত্রণার রূপক পাখিটি আছে। এই খান্নাস-রূপী পাখিটিকে তাড়িয়ে দিতে না পারলে যত ভালো-ভালো কথাই উপদেশ দেই না কেন, উহা কাজের বেলায় ঠনঠনান। তোমরা আরও জেনে রাখো যে, যে-খান্নাস-রূপী পাখিটি তোমাদের মাঝে অবস্থান করছে উহা আমাদের মধ্যে নাই। কারণ, খান্নাস-রূপী পাখিটিকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে ফেলেছি তথা মুসলমান বানিয়ে ফেলেছি তথা একদম তাড়িয়ে দিয়েছি। আরও জেনে রাখো যে, তোমাদের পক্ষে এ-জন্যই সম্ভবপর হতে পারছে না যেহেতু খান্নাস-রূপী পাখির কুমন্ত্রণায় অশুভ কাজ-কামে তথা বখা কাজে এবং খান্নাস-রূপী পাখিটিকে তাড়িয়ে না দিয়ে বড়-বড় নীতিকথার বড়-বড় আদর্শের বুলি আওড়িয়ে একেকজন বড়-বড় দার্শনিক সেজে আছেন। ইহাতে তোমাদের জীবনযাপন আপাত সুখময় হতে পারে অথবা কারো মুখাপেক্ষী না হতে পারে, কিন্তু আসল এবং মূল বিষয়টি হলো আপন নফসের সাথে মিশে থাকা খান্নাস-রূপী অমঙ্গলের পাখিটিকে তাড়িয়ে দেওয়া। এই কাজটির কথা বলতে গেলেই তোমরা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠো এবং নানা প্রকার যুক্তি-তর্ক এবং বড়-বড় আদর্শের দর্শনগুলো দাঁড় করিয়ে আসল বিষয়টি হতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়ে আছ।

'মুসরিফ'-এর আসল অর্থটি হলো অপব্যয়ী তথা খরচ করার কোনো ধার ধারে না। খান্নাস-রূপী পাখিটিকে আপন নফসের মধ্যে বহাল তবিয়ে রেখে যত এবাদত-বন্দেগি করো না কেন, কোনো কাজে আসবে না। এখানে সেই পুরাতন কথাটি আবার বলতে হচ্ছে যে, ব্যয় করা, বস্তুবাদ, কর্ম করা ইত্যাদি বিষয়গুলো একেকটি এবাদত-বন্দেগি, কিন্তু যখনই ওই কর্ম, ওই ব্যয়, ওই বস্তুবাদের উপর খান্নাসের পাখিরূপী কুমন্ত্রণাটি জড়িয়ে যায় তখনই সব কিছু কলুষিত হয়ে যায়, দূষণীয় হয়ে যায়। কারণ, মূল এবং একমাত্র উপদেশটিই হলো, আপন-আপন নফসকে খান্নাসমুক্ত করা। পাখি যে-রকম হরেক রকমের ডাকে মানুষকে অভিভূত করে, সেই রকম খান্নাসরূপী পাখিটিও নিজের নফসের ভিতর অবস্থান করে (বাহিরে শয়তান থাকে না এবং থাকার আইন নাই) মোহ-মায়ার সুন্দর-সুন্দর আকর্ষণীয়, লোভনীয়, মায়াময় ডাকগুলো দিয়ে যায়, আর তোমরা সেই মোহনীয় ডাকের মাঝে ডুবে থেকে রসুলদেরকে অস্বীকার করছ এবং বলছ যে, আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ। হে কওম, হে সম্প্রদায়, হে হতভাগ্য জাতি, একটি কথা জেনে রাখো, কোনো নবি-রসুলই তোমাদের মতো মানুষ নহেন। যারা কাকের, যারা মূশরিক তারাই কেবল নবি-রসুলদেরকে তোমাদের মতো সাধারণ মানুষ জেনে আসছে এবং যুগে-যুগে জেনে আসবে। অবশ্য ইহাও আল্লাহর লীলাখেলী। কত ভঙ্গির কত নর্তনের কত ঝঙ্কার! কত শেলীর চোখ ধাকানো বিষয়গুলো না থাকলে আল্লাহর

লীলাখেলাটি অসীমের অভ্যন্তরে আবরণ তৈরি করে কি না অধম লিখকের জানা নাই।

২০. ওয়া (এবং, ও, আর) জুআ (সে আসিয়াছে, সে আসিল, আগমন করা, পৌছানো, উল্লেখ হওয়া, বর্ণিত হওয়া, কথিত হওয়া, সম্পন্ন করা, আনা, সম্মুখে আনা, উৎপন্ন করা, স্থাপন করা, সম্পাদন করা, ঘটানো, কাম, রিচ, গেট, অ্যারাইভ, ব্রিঙ ফোর্স, প্রডিউস, পারফর্ম, কমিট) মিন (হইতে, থেকে চেয়ে) আকসা (প্রান্ত, শেষভাগ, দূরতম, সর্বশেষ, দূরবর্তী, সর্বোচ্চ, চরম, ডিসটান্ট, রিমোট, ফারদার, আউটমোস্ট, এক্সট্রিম, ম্যাক্সিমাম) মাদিনাতি (নগর, শহর) বাজলুন (মানুষ, ব্যক্তি, লোক, জন) ইয়াসআ (ছুটিয়া আসিল, দ্রুতগতিতে আসিল, দোড়াইয়া আসিল) কালা ([তিনি] বলিলেন) ইয়াকাওমি (হে আমার কওম, হে আমার সম্প্রদায়, হে আমার জাতি) তাবিউন্ (তোমরা অনুসরণ করো) রসুললিন (রসুলগণ)।

প্ট এবং সে আসিল নগরের শেষ প্রান্ত হইতে, এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল, (সে) বলিল, হে আমার কওম, তোমরা রসুলগণকে অনুসরণ করো।

২১. আততাবিউ (তোমরা অনুসরণ করো) আন্ (যে) লা (না) ইয়াসয়ালুকুম (তোমাদের কাছে চায়) আজুরান (মজুরি, প্রতিদান, পুরস্কার, কর্মফল, শ্রমফল, পারিশ্রমিক, পারিতোষিক, বেতন, সম্মানী, প্রতিফল, সওয়াব) ওয়া (এবং, আর, ও) হম (তাহারা) মুহতাদুন (হেদায়েতপ্রাপ্ত, যাহারা হেদায়েত পাইয়াছে, যাহারা সঠিক পথে পাইয়াছে)।

প্ট তোমরা অনুসরণ করো যে তোমাদের কাছে মজুরি চায় না এবং তাহারা হেদায়েত পাইয়াছে।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতের প্রথমেই বলা হয়েছে যে, নগরের শেষ প্রান্ত হতে একজন ছুটে এসে বললেন, হে আমার কওম, এরা আল্লাহর রসুল, তারা কোনো রকম নিজেদের স্বার্থ লাভ করার তরে এখানে আসেন নাই, তারা কোনো প্রকার মজুরি অথবা প্রতিদানের আশায় আসেন নাই। তারা নিজেরাই সঠিক পথে অবস্থান করছেন এবং সেই কারণেই তোমাদেরকে সঠিক পথটি কেমন করে জানবে এবং শিখে নেবে সেই শিক্ষা দেবার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে তাদের এই আগমন। তাদের এই আগমনে তোমাদের কাছে তাদের কোনো চাওয়াও নাই, পাওয়াই নাই। কেবলমাত্র তোমাদেরকে সঠিক পথটিতে কেমন করে চলতে পারবে তারই উপদেশ, তারই শিক্ষাটি দিতে এসেছেন। যদিও যে-লোকটি তার কওমকে এ-রকম উপদেশ দিচ্ছেন তাকে স্লামিন না বলে একজন ব্যক্তি বলে কেন সম্বোধন করা হলো উহা আমার জানা নাই। কারণ, সেই ব্যক্তিটি যদি স্লামিনই না হয়ে থাকেন অথবা সঠিক পথটি না-ই পেয়ে থাকেন, তা হলে তিনি কেমন করে চিনতে পারলেন, বুঝতে পারলেন যে তারা আল্লাহর রসুল? কথায় বলে, সিংহের শরীরে কতটুকু শক্তি আছে সেটা বাঘেই বুঝতে পারে, কিন্তু একটি খরগোশের পক্ষে বোঝা সম্ভবপর নয়। ওই সম্প্রদায়ের মানবগুলো যদি মনোজগতের দৃষ্টিকোণ হতে খরগোশের মতো সামান্য শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে তা হলে সেই সম্প্রদায়ই বা কেমন করে আল্লাহর রসুলদেরকে চিনতে পারবে? দৈহিক শক্তি এবং মনোজগতের শক্তি কখনোই এক হতে পারে না। ওই সম্প্রদায়ের মানবগুলো দেখতে আল্লাহর রসুলের মতোই। অথচ মনোজগতের শক্তির প্রশ্নে আকীশ-পাতাল ব্যবধান। তাই অধম লিখকের মনে হয়, সেই লোকটি স্লামিন এবং নগরের শেষ প্রান্তে অবস্থান করেন। এই শেষ প্রান্ত বলতে বোঝানো হয়েছে যে, সেই লোকটি সমাজের কোনো হোমড়া-ডোমড়া ব্যক্তিবিশেষ নহে। তাই চিৎকার দিয়ে ওই লোকটি ঘোষণা করলেন : এই আল্লাহর রসুলদেরকে আপনারা অনুসরণ করুন। আপনারা অনুসরণ করুন। দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতায় ডুবে থাকুন, বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিন – এতে তথাকথিত আদর্শবাদীদের কাছে

খটকা মনে হতে পারে, কিন্তু আপন-আপন পবিত্র নফস হতে অপবিত্র খান্নাসটিকে কেমন করে এবং কীভাবে তাড়িয়ে দেওয়া যায় কেবলমাত্র সেই শিক্ষাটুকুই দিতে এসেছেন। হাস যেমন সারাদিন পুকুরের জলেই খেলা করে, কিন্তু সাঁঝের আগমনের আগে পুকুর হতে যখন উঠে আসে তখন সঙ্গে করে জল নিয়ে আসে না। বিষ্ঠ-বৈভব আর ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে ডুবে থাকুন, কিন্তু প্রাচুর্যের গোলামি না করে আল্লাহর গোলামি করতে শিখুন। কারণ, নফসও আপনার দেহের ভেতরে অবস্থান করছে, আবার খান্নাসিরূপী শয়তানটিও অবস্থান করছে। আবার জীবন-রণের নিকটেই আল্লাহ আমরা-রূপে অবস্থান করছেন। আপন নফস হতে খান্নাসটিকে মুক্ত করতে পারলেই আল্লাহ সেই নফসের উপর রহিম-রূপে ধরা দেন। এই মূল শিক্ষাটুকু দেবার তরেই আল্লাহর রসুলেরা এসেছিলেন।

লোকেরা খান্নাস-রূপী শয়তানের কুমন্ত্রণায় মোহ-মায়ায় জড়িয়ে পড়ে শয়তানের শিষ্যত্ব বরণ করে নেবার পরও এই রসুলেরা সামান্য একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য তথা তোহিদের রহস্যটি বুঝিয়ে দিতে এসেছিলেন। অনেকেই মনে করেন যে, তোহিদের শিক্ষাটি একটি বিরাট শিক্ষা, আসলে এই কথাটি একটি উঁহা মিথ্যা কথা। খান্নাসমুক্ত জীবনই তোহিদের জীবন। খান্নাসমুক্ত জীবনই বুঝতে পারে সব কিছুর এক হতে আগমন আবার একেরই মধ্যে প্রত্যাবর্তন। মেকি জ্ঞানীরা, মেকি বিদ্বানেরা, মেকি দার্শনিকেরা, মেকি হাড্ডি-পাতিলের জ্ঞান বিশেষজ্ঞরা এমন সব আড়ম্ব-ধাড়ম্ব দর্শনের কথাবার্তার মারপ্যাচ যুগে-যুগে, কালে-কালে এবং আজও প্রচার করে বেড়াচ্ছে এবং দলে-দলে লোকেরা তাদের নম্রস্য সাধুতার কাছে পরাজয় বরণ করে আত্মসমর্পণের মুরিদ হচ্ছে। ভেজাল আছে বলেই খাটির মর্যাদা, অন্ধকার আছে বলেই আলোর পরিচয়, মন্দ আছে বলেই ভালোর স্বীকৃতি - এ যে তারই লীলাখেলা। তাই তিনি জলজালানুহল ইকরাম তথা একটি মুহূর্তে কোটি-কোটি রূপদর্শন করাবার পর সেই রূপটি আর কোনো দিন কোনো কালেই দেখানো হয় না। তাই আল্লাহর আরেক নাম হলো কারামতওয়াল।

অধম লিখক এই রহস্যলোকের মাঝে ডুব দিতে পেরেছে কি না উহা তো আল্লাহই ভালো জানেন।

২২. ওয়া (এবং, আর, ও) মা (কি, না, যে, যাহা, নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত, যদি, যা, নাই, নি, নয়, কত, কোন) লিয়া (আমার জন্য) লা (না, নাই, নহে, নয়, নেই) আবুদু (আমি ইবাদত করি) -লাজি (যে, যিনি, যাহা, যা, যার, যাহার, যাহাকে, যাকে) ফাতারানি (তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মূলশব্দ 'ফাতরুন' অর্থ নাস্তি হইতে অস্তিত্বে আনা। অভিধানে ফাতারুন অর্থ বিদীর্ণ করা, ভাঙিয়া ছিন্নভিন্ন করা, ভাঙিয়া টুকরা-টুকরা করা, বিভক্ত করা, বিযুক্ত বা পৃথক করা, ফাতিয়া ফেলা, লম্বলম্বিভাবে কাটা, ফালি করা, স্পিট, ফাটানো, সবলে বিচ্ছিন্ন করা, বিচ্ছিন্ন হওয়া, ফাটিয়া যাওয়া, প্রকাশ, করা, ব্যক্ত করা, ক্রিড, ব্রেক) ওয়া (এবং, আর, ও) ইলাইহি (তাঁহারই [আল্লাহর] দিকে) তুরজাউন (তোমাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে [মূলশব্দ 'রাজউন', হইতে 'তুরজাউন'। 'রাজউন' অর্থ হইল : ফিরাইয়া দেওয়া, ফেরত, দেওয়া, ফিরাইয়া আনা, বারবার করা, বিপদে "ইল্লা লিল্লাহে ... রাজিউন" বলা])।

প্ট এবং আমার জন্য কি (যে) আমি এবাদত করিব না যিনি (আল্লাহ) আমাকে ভাঙিয়া টুকরা-টুকরা করিয়াছেন এবং তাহার (আল্লাহর) দিকে তোমাদেরকে ফিরাইয়া আনি হইবে।

২৩. আআততাখিজ্জ (আমি কি গ্রহণ করিব, আমি কি ধরিয়া লইব, আমি কি ধরিব, আমি কি বানাইব, আমি কি বাছিয়া লইব, আমি কি পছন্দ করিব, আমি কি গঠন করিব?) মিন (হইতে, থেকে, চেয়ে) দুনিহি (সে ব্যতীত, সে ছাড়া) আলিহাতান্ (বহু মাবুদ, মাবুদগণ, উপাস্যগণ, প্রভুগণ, দেবতাগণ) ইন্

(যদি, যদি না, না, অবশ্যই) ইউরিদ্নি (আমাকে চাহেন) রাহমান (রহমান, করুণাময়, দয়াময়, দয়ালু, দয়াপরবশ, অনুকম্পাশীল, অনুগ্রহশীল) বিদুরবিন (কোনো দুঃখ, কোনো দুর্দশা, কোনো দুরবস্থা, কোনো দারিদ্র, কোনো ক্লতি, কোনো অনিষ্ট, কোনো অপকার, কোনো বিপদ, কোনো কষ্ট, কোনো লোকসান, কোনো আঘাত, ড্যামেজ, হার্ম, ইনজুরি, হার্ট, লস) লা (না) তুগনি (কাজে আসিবে, তা যথেষ্ট বোধ করে) আননি (আমার জন্য) শাফাআতুহম (তাহাদের সুপারিশ, তাহাদের শাফায়াত, তাহাদের মধ্যস্থতা, তাহাদের চেষ্টা) শাইয়ান (কোনোরূপ, কিছুমাত্র) ওয়া (এবং, আর, ও) লা (না) ইউনকিজুন (তাহারা আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে, তাহারা আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহারা আমাকে পবিত্রাণ দিতে পারিবে, নিষ্কৃতি দিতে পারিবে, অব্যাহতি দিতে পারিবে, নিস্তার দিতে পারিবে)।

পঁট আমি কি ধরিব তাহাকে ছাড়া উপাস্যগণ হইতে, যদি আমাকে চাহেন রহমান কোনো দুর্দশা আমার জন্য কিছুমাত্র কাজে আসিবে না তাহাদের শাফায়াত এবং তাহারা আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

২৪. ইননি (নিশ্চয়ই আমি) ইজাল (সেই ক্ষেত্রে, তাহা হইলে, তখন, ওই সময়) লা (অবশ্যই) ফি (মধ্যে) দালালিন (বিদ্রাস্তি, দ্রষ্টতা, দ্রাস্তি, ধোকা, প্রতারণা, ব্যর্থতা) মুবিন (স্পষ্ট, সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য)।

পঁট নিশ্চয়ই আমি সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই সুস্পষ্ট বিদ্রাস্তির মধ্যে (পড়িব)।

২৫. ইননি (নিশ্চয়ই আমি) আমানতু (বিশ্বাস রাখি) বিরাববিকুম (তোমাদের রবের উপর) ফাসমাউন (সুতরাং তোমরা আমার কথা শোনো)।

পঁট নিশ্চয়ই আমি বিশ্বাস রাখি তোমাদের রবের উপর, সুতরাং তোমরা আমার কথা শোনো।

১ ব্যাখ্যা : এই বিশ হতে পঁচিশ নম্বর পর্যন্ত আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে দেখা যায় সেই নগরীর একপ্রান্তে একজন অতিনগণ্য মানুষ বলে সমাজে যিনি পরিচিত তিনি এই রসুলদের আগমনটি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আগমন সেই কথাটি বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে, আল্লাহ আমাকে ডেঙে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছেন। এই ডেঙে টুকরো-টুকরো বলতে কী বোঝানো হয়েছে? এখানে লোকালয়ের লোকজনকে নী ডেঙে আল্লাহ যে সেই মানুষটিকে ডেঙে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছেন সেই কথাটি জ্ঞানিয়ে দিলেন। আল্লাহর এই ভাঙা অথবা ছিন্নভিন্ন করে ফেলার কথাটি একশত ভাগ রূপক। প্রশ্ন আসতে পারে, সেই লোকটির কী-কী আল্লাহ কর্তৃক ভাঙা হয়েছে? জাগতিক দৃষ্টিতে (ফেনোমেনাল ভিশন-এ) ডেঙে ফেলার লক্ষণ পাওয়াটি তো দূরের কথা, বরং চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবার কথাটি আরও অবাক করে তোলে। যদিও সেই লোকটিকে কৌরান মোমিন বলে ঘোষণা করেন নি, তবুও ইহা অনেকটা নিশ্চিত যে, সেই লোকটি মোমিন। শয়তান যে কত রকম ডিজাইনের কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে তাহা মানুষ সহজে ধরতেই পারে না। প্রতিটি মানুষের সঙ্গেই শয়তান বিশেষ কয়েকটি রূপ ধরে মানুষকে শয়তানের মুরিদ বানিয়ে ফেলে। অথচ আমরা জানি যে আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে কেবলমাত্র জিনের অস্ত্র এবং মানুষের অস্ত্র ছাড়া শয়তানকে থাকার অথবা অবস্থান করার সামান্যতম ক্ষমতাও আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয় নাই। আল্লাহ কেবলমাত্র শয়তানের বাসস্থান হিসাবে দুইটি স্থানকে নির্বাচন করে দিয়েছেন : একটি স্থানের নাম হলো জিনের অস্ত্র এবং অপর স্থানটির নাম হলো মানুষের অস্ত্র। এই দুইটি স্থান ছাড়া শয়তানের থাকার আর কোনো জায়গাই সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে আল্লাহ রাখেন নাই এবং রাখার বিধানটিও দেওয়া হয় নাই। এই সামান্য কথাটুকু যারা বুঝতে পারেন নাই তারা কেমন করে ইসলামের চিন্তাবিদ, গবেষক, মোল্লা-মুফতি, পীর-ফকির হয় উহা অধম লিখকের জানা নাই। এ যেন অনেকটা একটা বাক্য লিখতে গিয়েই হিমশিম খায় অথচ একটা বিরাট

উপন্যাস লেখার মতো শোনায়। আর কোনো ব্যাপারে না হোক, কিন্তু ধর্মের বেলায় শয়তান যে কেবল জিন ও মানুষের অন্তর ছাড়া আর কোথাও বাস করতে পারে না এবং পারার বিধানটি সমগ্র কোরান-এর কোথাও একটি আয়াতেও নাই, এই সামান্য কথাটি অনেক ইসলামি চিন্তাবিদ বুঝতেই পারে না – অথচ তিনি ইসলামি চিন্তাবিদ! অথচ তিনি মোল্লা-মুফতি! অথচ তিনি পীর-ফকির! এই জাতীয় ভুলের জঙ্গলের আবর্জনা এত বেশি ইসলামের উপর পর্বতের মতো উঁচু হয়ে পড়ে আছে যে পাঠক আসল বিষয়টি ধরতেই পারে না। অবশ্য ইহা চিন্তাবিদেরও দোষ নহে এবং পাঠকেরও দোষ নহে। ইহা তকদিরের লীলাখেলা।

কথিত আছে যে পলাশির যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের সেনাবাহিনীর উপর নবাব সিরাজের সৈন্যবাহিনী যদি এক মুষ্টি করেও ধূলি নিক্ষেপ করত তা হলে ক্লাইভের সৈন্যরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হতো। কথিত আছে, সেই যুদ্ধের সময় আল্লাহর একজন মজুব ওলি দেখতে পেলেন যে ক্লাইভের সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে সবুজ পতাকা হাতে হজরত খিজির (আ.) এগিয়ে আসছেন। অবাক বিশ্বয়ে সেই মজুব ওলি হজরত খিজির আলাইহেঁস সালামত সালামকে প্রশ্ন করতে হজরত খিজির এই বলে উত্তর দিলেন যে, ইহাই তো তকদিরের লীলাখেলা। সুতরাং, এই তকদিরটিকে বিশ্বাস না করলেও বলার কিছু থাকে না, আবার বিশ্বাস করলেও বলার কিছু থাকে না। যা ঘটবে সেটা তো আল্লাহর প্রকাশিত এবং বিকশিত হুটে চলার মতো কেতাবে আগেই নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। এই কেতাব চামড়া, খেজুর পাতা, উটের হাড়, পরে মোটা কাগজ হতে আজকের আধুনিক অফসেট কাগজে কালিতে ছাপার অঙ্করের কেতাব নহে – ইহাকে অনেকটা কেতাবের ছবি হয়তো বলা যেতে পারে। ছবিতে হবহ বাঘ-সিংহ দেখা যায়, কিন্তু আসলেই কি উহা বাঘ-সিংহ? ছবিতে পিতা-মাতার রঙিন ছবি একদম হবহ, একদম জীবন্ত, কিন্তু এই ছবি কি পিতা-মাতার বাস্তব অবস্থান? বাস্তব অবস্থানটি তো দুই যুগ আগেই আজিমপুর কবরস্থানে অবস্থান করছিল এবং সেই কবর দুটিকে কুঁড়িয়ার কুমারখালির কবর-শিল্পীরা কোদাল মেরে যে একাকার করে ফেলেছে সেই হিসবিটুকু রাখি না এবং বুঝতেও চাই না। সুতরাং, শয়তানের সব রকম ধোকাবাজি এবং কুমন্ত্রণাগুলো কোথাও মোটা, কোথাও চিকন, কোথাও সুক্ষ্ম, কোথাও সুক্ষ্মেরও সুক্ষ্ম, যাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও ধরা যায় না। সমগ্র কোরান-এ শয়তান খান্নাসরুপি ধারণ করে যে কুমন্ত্রণা দান করে উহা মাত্র একবার বলা হয়েছে; তাও আবার কোরান-এর শেষ সূরা তথা একশ চোদ্দ নম্বর সূরা ‘নাস’-এর মধ্যে এই খান্নাসরুপি শয়তানের কথাটি জানতে পরি। তারপরে আসুন শয়তানের মরদুদরুপি ধোকা। এই মরদুদরুপি ধোকাটি সাধারণত মালপানির বিষয়ে ধোকা। সমগ্র কোরান-এ সম্ভবত মাত্র দুইবার বলা হয়েছে। তারপরে শয়তানের মতো পূর্ণ শয়তান বনে যাওয়াকে কোরান-এ খবিস বলা হয়েছে। খবিস মানুষটি শয়তানের একদম পরিপূর্ণ প্রতিমূর্তি। শয়তানের আইকন। শয়তানের এফিজি। শয়তানের স্ট্যাচু। সমগ্র কোরান-এ এই খবিস শব্দটি সম্ভবত সাত আয়াতে তের বার বলা হয়েছে। মানুষের মধ্যে অহঙ্কার, দস্ত, আফালন, হিয়া-হয়া যাদের মধ্যে বেশি দেখা যায় তাদেরকে ইবলিস বলা হয়েছে। ইবলিস অর্থটি হলো অহঙ্কারী। এই ইবলিস শব্দটি আবার আরবি শব্দ নয়, ইহা হিব্রু ভাষা হতে নেওয়া হয়েছে। মূল শব্দটি তথা মাজদার হলো ‘বালাসা’। আর এই ‘বালাসা’র অর্থই হলো অহঙ্কার। যে অহঙ্কার করে, যে দস্তের আফালন হুড়ে মারে তাকেই কোরান ইবলিস বলেছে। এই ইবলিস শব্দটি অধম লিখকের জানা মতে সম্ভবত এগারটি আয়াতে এগার বার বলা হয়েছে। তারপর আসে শয়তান। মানুষ প্রতিনিয়ত শয়তানের পাখরের আঘাত খেয়ে চলছে, অথচ বুঝতে পারে না। অনেকটা রোগীকে খেরাপি দেবার মতো। সেই শয়তানের কথাটি অধম লিখকের জানা মতে কোরান-এর সাতান্নটি আয়াতে চোষটিবার সম্ভবত বলা হয়েছে। কোরান-

এর যত প্রকার আদেশ-উপদেশ, যত প্রকার ভয়-ভীতি ইত্যাদি সব কিছু একমাত্র এই শয়তানটিকে তাড়িয়ে দিতে অথবা মুসলমান বানিয়ে ফেলতে দেওয়া হয়েছে। অন্য কোনো দ্বিতীয় আরেকটি আদেশ-উপদেশ সমগ্র কোরান-এ নাই এবং থাকতে পারে না এবং থাকার কোনো বিধান রাখা হয় নাই।

সুতরাং, যে-লোকটি বলছেন যে আল্লাহ তাকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছেন সেই লোকটি তো মোমিন, যদিও এই আয়াতে মোমিন শব্দটি পেলাম না। যদিও অধম লিখকের জানা মতে সম্ভবত কোরান-এর একশত একচল্লিশটি আয়াতে একশত একান্ন বার মোমিন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এই লোকটিকে কেন মোমিন বলে উল্লেখ করা হলো না বলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন তা হলে তা অধম লিখকের জানা নাই।

এই আয়াতে ‘আমরা’ না বলে ‘তোমাদেরকে’ কেন বলা হলো? কারণ, খান্নাসরুপী শয়তানমুক্ত মোমিন ব্যক্তির আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার বিষয়টি শেষ করে দিয়েছেন। এখানে ‘আমরা’ বললে সেই মোমিন ব্যক্তিটির নিজেরও লোকালয়ের কাকেরদের দলবর্তী হয়ে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার কথাটি বোঝানো হয়ে যায়। প্রতিটি মানুষের অন্তরে অনেক প্রকার দুর্বল ইলাহ তথা দুর্বল উপাস্যসমূহ অবস্থান করে। এই দুর্বল উপাস্যসমূহকে ভেঙে দিতে পারলেই

অন্তরের অভ্যন্তরে যে রবরুপী একমাত্র ইলাহটি অবস্থান করে উহা পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হয়ে যায়। তাই সেই মোমিন ব্যক্তিটি লোকালয়ের জনগণকে এই বলে সাবধান করে দিচ্ছেন যে, এই দুর্বল উপাস্যসমূহ তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। এই দুর্বল ইলাহসমূহ সুপারিশ করার তথা শাফায়াতের কোনো শক্তি বা অধিকার রাখে না এবং এই দুর্বল ইলাহগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদের পূজা করলে কখনই লাভবান হতে পারবে না। কারণ, এই দুর্বল ইলাহসমূহ তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। তারপর সেই মোমিন ব্যক্তিটি তার সম্প্রদায়কে এই বলে বারবার সাবধান করে দিলেন যে, যদি আমি এই ইলাহসমূহের পূজার মধ্যেই ডুবে থাকতাম তা হলে নিশ্চয়ই আমি স্পষ্ট বিভ্রান্তির সাগরে ডুবে যেতাম।

পরিশেষে সেই মোমিন ব্যক্তিটি ‘আমার রবের’ কথা না বলে বললেন, ‘তোমাদের রব’ তথা তোমাদের প্রতিজ্ঞের সঙ্গে আল্লাহ যে রবরূপে তোমাদের জীবন-রংগের নিকটেই অবস্থান করছেন – সেই রবের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসটি স্থাপন করতে পেরেছি বলেই তোমাদেরকে বারবার বলছি যে, আমার কথাটি শোনো, আমার কথাটি ধরো – যদি মুক্তি পেতে চাও।

২৬. কিলাদু (বলা হয়, বলা হয়েছে, বলা হবে, কথিত আছে) খুলিল (প্রবেশ কর, ভিতরে গমন কর, ঢুকিয়া পড়, অভ্যন্তরে যাও) জান্নাতা (জান্নাত, বেহেশত, স্বর্গ, উদ্যান, বাগান, বাগিচা, প্যারাডাইস, গার্ডেন)।

প্ট বলা হইল, জান্নাতের ভিতরে যাও।

+ কালা ([তিনি] বলিলেন) ইয়ালাইতা (যদি এমন হইত, উড গড ইফ ওনলি, আই উইশ ইট ওয়্যার) কাওমি (আমার জাতি, আমার সম্প্রদায়, আমার কণ্ঠ, আমার লোকালয়ের অধিবাসীরা) ইয়ালামুনা (যদি তাহারা জানিতে পারিত)।

প্ট (তিনি) বলিলেন, যদি এমন হইত, যদি আমার কণ্ঠ জানিতে পারিত।

২৭. বিম্বা (কীসের সাথে?, কীসের সঙ্গে?, ওই বস্তু হইতে, যাহা) গাফারালি (আমাকে ক্ষমা করিলেন, আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন, পারডন, ফরগিভনেস, রিমিশন) রাব্বি (আমার রব, আমার প্রতিপালক, আমার সদাপ্রভু) ওয়া (এবং, আর, ও) জাআলানি (আমাকে করিয়াছেন, আমাকে বানাইয়াছেন) মিনাল (হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্য হইতে, অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত, অপেক্ষা, দ্বারা, যাবৎ, এর, মধ্যস্থিত, অব, পাট অব, বিলংগিং টু, ফ্রম এমোং)

মুকুরাম্বিন (সুস্মানিত, মর্যাদাবান, গৌরবান্বিত, শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, মহিমাম্বিত, গরিমা, গর্বিত, মহান, মাননীয়, অনারবল, ডিসটিংগুইশড, এমিনেন্ট, রেসপেকটেবল, হাই র‍্যাংকিং, নোবল, ডিসেন্ট)।

প্ট কীসের সহিত আমার রব আম্মাকে করিয়াছেন মহিমাম্বিতদের অন্তর্ভুক্ত।

১ ব্যাখ্যা : ওই মোম্বিন ব্যক্তিটি নিজের কণ্ঠকে দুই-ধর্মের পবিত্র দাওয়াত দেবার নিয়তে অনেক রকম উপদেশের বাণী শোনালেন, কিন্তু কোনো উপদেশই সেই কণ্ঠ গ্রহণ করে নেওয়া তো দূরে থাক, বরং প্রকাশ্যে সবার সামনে এমন গণপিটনি দেওয়া হলো যে পেটের নাড়ি-ভুড়িগুলো পর্যন্ত পায়খানার রাস্তা দিয়ে বাহির হয়ে গেল এবং তিনি শহিদের মর্যাদা লাভ করে জাহান্নাতে প্রবেশ করলেন। সেই মোম্বিন ব্যক্তিটি হয়তো জানতেন না যে তার কণ্ঠের মানুষগুলো মানুষের সুরতে অসুর ছিল। অসুরেরা কোনোদিন কোনোকালেও আল্লাহর দুইনকে মেনে নেওয়া তো দূরে থাক, বরং তেলেবেগ্নে জ্বলে ওঠে এবং অনেক ক্রোড়ে মারমুখী হয়ে ওঠে। ওই নিরীহ মোম্বিন ব্যক্তিটিকে তারই কণ্ঠের হোমড়া-চোমড়া হাতে ছোট-বড় সবাই মিলে গণপিটনি দিয়ে শহিদ করে ফেলল। সুগন্ধ নেবার নিয়তে কেহ যদি গরুর নাকের উপরে ফুলটি ধরে তা হলে গরু লম্বা জিহ্বা বের করে উহা খেয়ে ফেলে। ওই মোম্বিন ব্যক্তির হতভাগ্য সম্প্রদায়টিও গোলাপের সুগন্ধ নেবার যোগ্যতা থাকা তো দূরে থাক, বরং গরুর ভূমিকা পালন করে গেল। তাই আল্লাহর অনেক ওলিরা বলে থাকেন যে, এই দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বড় ত্যাগটি তোম্মাকে উপহার দেবে সবচেয়ে বড় শাস্তি তথা মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুর পূর্ব মূহর্ত পর্যন্ত ওই মোম্বিন লোকটি দুঃখ করে বলে গেলেন, 'হায় রে আমার কণ্ঠের লোকেরা, তোরা যদি এই কথাগুলোর মূল্য দিতে পারতি! কিন্তু মূল্য দিতে পারে নাই। কেন পারে নাই? অসুরেরা কোনোদিন কোনোকালেও আল্লাহর নির্বাচিত মোম্বিনকে গ্রহণ করে নিতে পারে নাই। আমরা কেবলমাত্র কোরানুল হাকিম-এই এ-রকম বেদনাদায়ক দুঃখজনক ঘটনাগুলো দেখতে পাই না, বরং অনেক ধর্মেই এ-রকম ভুরি-ভুরি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

অবশেষে ওই মোম্বিন মানুষটি মৃত্যুর আগে শেষ কয়টি কথা জানিয়ে দিলেন এই বলে যে, আমার প্রতিপালক আম্মাকে রহিম-রূপে বিশেষ ক্রমাটি করলেন এবং মর্যাদার প্রশ্নে সুউচ্চ গৌরবে গৌরবান্বিত এবং মহিমাম্বিত করলেন।

২৮. ওয়া (এবং, আর, ও) মা (না) আনজালনা (আমরা পাঠাই, আমরা প্রেরণ করি, আমরা অবতীর্ণ করি, আমরা নাজিল করি [মূল শব্দ 'ইনজাল' হতে] আমরা হ্রাস করি, আমরা নিচে ফেলি, আমরা নিক্ষেপ করি) আলা (উপরে, উর্ধ্বে, প্রতি, দিকে, অভিমুখে, বিষয়ে, সম্পর্কে, যুক্ত হইয়া, ভিত্তি করিয়া, অগ্রসর হইবার ভাবসূচক, ততোধিক, অধিকন্তু, উচ্ছে, অধিকতর উচ্চ, উর্ধ্বদিকে, বিষয়ে, সম্পর্কে, অন, আপঅন, ওভার, এবাভ) কাওম্বিহি (তাহার কণ্ঠের, তাহার জাতির, তাহার সম্প্রদায়ের, তাহার লোকালয়ের অধিবাসীদের) মিম্বাদিহি (তাহার পরে, হইতে পরে, পরে, পরবর্তীতে) মিন (হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্য হইতে, অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত, অপেক্ষা, দ্বারা, যাবৎ, এর, মধ্যস্থিত, অব, পার্ট অব, বিলংগিং টু, ফ্রম এম্মাং) জুনদিন (সেনা, সেনাদল, সৈন্য, সৈন্যবাহিনী, লঙ্কর, সাহায্যকারী, সোলজার্স, আর্মি) মিনাস (হইতে, থেকে, চেয়ে) সাম্মায়ি (আকাশ, গগন, আসমান, উর্ধ্বলোক, হেভেন, ফ্লাই, ফার্মামেন্ট) ওয়া (এবং, ও, আর) মা (না) কুননা (আমরা হই, আমরা ছিলাম [বহুবচনে বলা হয়েছে]) মুনজিলিন (অবতীর্ণকারী, নাজিলকারী, প্রেরণকারী, বর্ষণকারী)।

প্ট আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] পাঠাই না তাহার কণ্ঠের উপরে তাহার পরে আকাশ হইতে কোনো সৈন্য এবং আমরা হই না অবতীর্ণকারী।

২৯. ইন্ (যদি, যদি না, অবশ্যই, না, নিশ্চয়ই, নহে) কানাত্ (ছিল হওয়া, থাকা, ঘটা, হয়, আছে) ইন্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত, বাদে, ছাড়া, তবে, যদি না, আনলেস, একসেস্ট, ওনলি, বাট, নট, আন্টিল) সাইহাতান্ (বক্তৃৎস্বনি, চিৎকার, ভয়ঙ্কর শব্দ, ভয়ঙ্কর আওয়াজ, বিকট শব্দ, গর্জন, উচ্চ আওয়াজ, হাতির চিৎকার, বিলাপ, ফ্রাই, শাউট, স্ক্রিম, ভয়ে আতঁনাদ করা, ইয়েল) ওয়াহিদাতান্ (একা, একলা, একটি, একটিমাত্র, অ্যালোন, সিংগেল, ইনডিভিডুয়াল, ওনলি, ইউনিক, আনইকুয়ালড, ইনকম্পেয়ারেবল) ফাইজা (সুতরাং যখন) হম্ (তাহারা) খামিদুন্ (নিশ্চয়, শাস্ত, নিঃসন্দেহ, নীরব, অচঞ্চল, নিবৃত্ত, প্রশমিত, হ্রাসপ্রাপ্ত, অ্যাবেইটিং, কাম, ট্রাংকউল, স্টিল, কোয়ায়েট)।

প্ট একমাত্র ধ্বংসধ্বনি ছাড়া কিছুই ছিল না সুতরাং যখন তাহারা নিখর-নিশ্চয় (হইয়া গেল)।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াত দুটোর সামান্য বাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই একটি কথা সুস্পষ্ট দলিলরূপে পেলামি আর তা হলো আল্লাহও ‘আমরা’-রূপটি ধারণ করে মানবীয় সুরতে উপস্থিত হতে পারেন। আমরা এতকাল জানতাম যে ফেরেশতারা হবই মানবের আকার ধারণ করে, এমনকি বস্তু পরিহিত অবস্থায় অনেক সাহাবাই দেখেছেন, যদিও এই ফেরেশতারা মানবীয় গুণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ, ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ নফসও দান করেন নাই এবং রুহও দান করেন নাই এবং নফস দান করতে গেলে ফেরেশতাদের অন্তর থাকার কথা এবং সেই অন্তরও দান করা হয় নাই। কারণ, এই আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে যে আকাশ হতে কোনো সেনাবাহিনী পাঠানো হয় নাই। যদি ধরে নেই, এখানে আকাশ মানে রহস্যপূর্ণ একান্ত গোপনীয় বিষয়, তা হলেও সেখান থেকে কোনো সৈন্যই পাঠানো হয় নাই। এই কথাটি প্রথমে বলা হলো এবং তারপরই বলা হলো যে, আমরাও প্রেরিত হই নাই তথা প্রেরিত হতে গেলেই আকার ধারণ করতে হয় এবং সেই আকারটি মানুষের আকারই হোক অথবা আল্লাহর অন্য যে-কোনো পছন্দনীয় আকারই হোক না কেন। কিছু উহাও পাঠানো হয় নাই। ওই কণ্ঠটি আল্লাহর একজন খাস বান্দা তথা মোমিনকে একদম অন্যায়াভাবে হত্যা করার পর আল্লাহ আকাশ হতে কোনো সৈন্যবাহিনী অথবা ‘আমরা’ রূপটি ধারণ করে তথা মানব-আকার ধারণ করে আগমন করেন নাই। কারণ, ওই কণ্ঠটি এমনই জঘন্য অন্যায়া কাজটি করেছে যে যার জন্য কেবলমাত্র একটি ধ্বংসধ্বনির দ্বারাই সমস্ত কণ্ঠটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিলেন। সীমাহীন সীমা-লঙ্ঘনকারীদের জন্য এ-রকম ব্যবস্থাপত্রটি যুগে-যুগে, কালে-কালে সুনির্দিষ্ট করে রেখেছেন। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। কেউ ফালত তর্কে লিপ্ত হয়, কেউ দর্শনের গুরুগম্ভীর প্যাচ-মারা দার্শনিক ডুগডুগি বাজায়। ওই কণ্ঠটিকে আল্লাহ সবচাইতে কঠিন শাস্তিটি এই জন্যই দিলেন যে, একটি মানুষও জীবিত থেকে যেন বাগবিতণ্ডা, যুক্তি-তর্ক এবং তর্জন-গর্জন করার কোনো চিন্তাই আর না থাকে।

৩০. ইয়া হাস্রাতান্ (হায় আফসোস, হায় হায়, হায় রে আক্ষেপ, পরিতাপ, মনস্তাপ) আলাল্ (উপর, উর্ধ্বে, প্রতি, দিকে, অভিমুখে, বিষয়ে, সম্পর্কে, যুক্ত হইয়া, ভিত্তি করিয়া, ততোধিক, অধিকতর, উর্ধ্বে, উর্ধ্বদিকে, বিষয়ে, সম্পর্কে, আন, আপঅন, ওভার, এবাড) ইবাদি (তাঁহার বান্দাগণ, তাঁহার দাসগণ)।

প্ট হায় আফসোস, তাঁহার বান্দাগণের উপর।

+ মা (না) ইয়াতিহিম্ (তাহাদের কাছে আসিয়াছে, তাহাদের নিকট আসিয়াছে) মিন্ (হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্য হইতে, অন্তর্গত, অব, পার্ট অব, বিলংগিং টু, ফ্রম এমাং) রাসুলিন্ (রসুল, দূত, বার্তাবাহক, সংবাদবাহক) ইন্লা (ব্যতীত, বাদে, ছাড়া, তবে, যদি না, কিছু, একমাত্র, আনলেস, একসেস্ট, ওনলি, বাট, নট আন্টিল) কানু (ছিল, আছে, হয়) বিহি (ইহা দিয়া, তাহার

সঙ্গে, উহার দ্বারা) ইয়াসতাহজিউন্ (তাহারা হাসিঠাট্টা করে, তাহারা উপহাস করে)।

স্ট তাহাদের কাছে আসে নাই রসুলদের মধ্য হইতে (এমন কেহ) যাহার সঙ্গে তাহারা হাসিঠাট্টা (করা) ব্যতীত ছিল।

৩১. আলামইয়ারাও (তাহারা কি দেখে নাই, তাহারা কি দেখে না, তাহারা কি জানে না, তাহারা কি লক্ষ করে না) কাম্ (কত, কয় জন, কতগুলো, কতখানি, কতটুকু, হাউ মাচ, হাউ মেনি) আহলাক্না (আমরা ধ্বংস করিয়াছি, আমরা সংহার করিয়াছি, আমরা বিনাশ করিয়াছি, আমরা বিলোপ করিয়াছি) কাব্লাহম্ (তাহাদের আগে, তাহাদের পূর্বে, তাহাদের অতীতে) মিনান্ (হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্য হইতে, অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত, অপেক্ষা, দ্বারা, যাবৎ, এর, মধ্যস্থিত, অব, পার্ট অব, বিলংগিং টু, ফ্রম এমাং) কুরুনি (মানবগোষ্ঠী, জাতিসমূহ, কণ্ঠমণ্ডলি, সম্প্রদায়গণ) আননাহম্ (নিশ্চয়ই তাহারা, নিঃসন্দেহে তাহারা) ইলাইহিম্ (তাহাদের দিকে, তাহাদের প্রতি, তাহাদের নিকটে) লা (না, নাই) ইয়ারজিউন্ (ফিরিয়া আসিবে)।

স্ট তাহারা কি দেখে নাই, তাহাদের আগে কণ্ঠমণ্ডলির মধ্য হইতে কতগুলিকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি? নিশ্চয়ই তাহারা তাহাদের দিকে ফিরিয়া আসিবে না।

৩২. ওয়া (এবং, ও, আর, অধিকন্তু) ইন্ (যদি, যদি না, অবশ্যই, না, নিশ্চয়ই, নহে) কুললুন্ (প্রত্যেক, যা কিছু, সব, সকল) লাম্মা (যখন, যেহেতু, তবে, ব্যতীত, ছাড়া নাই, নি) জামিউন্ (সকলে, সবাই) লাদাইনা (আমাদের কাছে, আমাদের নিকটে) মুহদারুন্ (উপস্থিত করা হইবে, হাজির করা হইবে, সমবেত করা হইবে)।

স্ট এবং অবশ্যই সকলের প্রত্যেককে যেহেতু আমাদের কাছে উপস্থিত করা হইবে।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াত তিনটির প্রথমই একটি সার্বজনীন কথা বলা হয়েছে, আর সেই কথাটি হলো, এই দুনিয়াতে যত নবি-রসুলই আগমন করেছেন তারা কম-বেশি ঠাট্টা-বিদ্বপের শিকারে পরিণত হয়েছেন। যারা মানুষের সুরতে অসুর তথা যারা আপন-আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে তাদের কাছে নবি-রসুলদের বাণীগুলো তথা কথাগুলো মনের মতো হবার কথা নয়। তাই বাংলায় একটি প্রবাদ আছে যে, অসুরেরা কোনোদিন কোনো কালেও দেবতাদেরকে গ্রহণ করে নিতে পারে নি এবং পারবেও না। কেবলই কি ঠাট্টা-বিদ্বপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, নাকি দৈহিক নির্যাতনের অনেক করুণ দৃষ্টান্তগুলো আমরা নবি-রসুলদের বেলায় দেখতে পাই? মহানবির বেলায়ও তায়েফের ময়দানের নির্মম ঘটনাটি কি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় না যে ঠাট্টা-বিদ্বপ হতে দৈহিক নির্যাতন কোনটাই-বা এই অসুরেরা না করেছে?

তারপর আল্লাহ বলছেন যে, এই জাতীয় মানুষরূপী অসুরদের কত সম্প্রদায়কে সম্মুখে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কত যে দৃষ্টান্ত মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে বাহির করে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কত সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস হতে আমরা এই মূল্যবান শিক্ষাগুলো গ্রহণ করে নিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে চলছি। এখন সবচাইতে বড় প্রশ্নটি হলো, একটি মানুষ কেন অসুরের রূপ ধারণ করে? এর সোজা উত্তর হলো, আপন নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি অনেক রকম কুমন্ত্রণা দিয়ে শয়তানের চেষ্টাতে পরিণত করে ফেলে। এই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে কেমন করে তাড়িয়ে দিতে হবে অথবা কেমন করে খান্নাসটিকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতে হবে সেই শিক্ষাটি দেবার জন্যই আল্লাহর তরফ থেকে নবি-রসুল-মুনি-খাম্বি-সাধু-সন্ত-ওলি-গাউস-কুতুব-আবদালদেরকে পাঠানো হয়ে থাকে। দুনিয়ার

বুকে যত রকম বুট-ঝামেলা আমরা দেখতে পাই সেই বুট-ঝামেলার মন্বণাদাতা হলো খাল্লাসরূপী শয়তান।

৩৩. ওয়া (এবং, আর, ও) আয়াতুন (নিদর্শন, চিহ্ন, শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, নমুনা, আদর্শ, অলৌকিক বস্তু, মোজেজা, [কোরান-এর] আয়াত, সাইন, মিরাকিল, ভার্গ, একজাম্পল) লাহমুল (তাহাদের জন্য) আরুদ (জমি, মাটি, পৃথিবী, দেহ, ভূখণ্ড, দেশ, আর্থ, ল্যান্ড, কার্গু, রিজিয়ন, এরিয়া, গ্রাউন্ড, সয়েল) মাইতাত (মৃত, নিশ্চরণ, নিজীব, প্রাণহীন, মৃতব্যক্তি, লাইফলেস, ইন্যানিমেট, ডেড, ডিসিজড)।

ঈ এবং মৃত পৃথিবী তাহাদের জন্য আয়াত।

+ আহইয়াইনাহা (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] উহাকে জীবিত করি) ওয়া (এবং, ও, আর) আখ্বাজনা (আমরা বাহির করি) মিনহা (উহা হইতে) হাব্বান (শস্যদানা, শস্য, বীজকণা, বীজ, বিচি, গ্রেইন, সিরিয়াল, কর্ন, সিড) ফামিনহ (সুতরাং উহা হইতে) ইয়াকুলনা (তাহারা খায়)।

ঈ আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] উহাকে জীবিত করি এবং আমরা বাহির করি শস্যদানা উহা হইতে, সুতরাং উহা হইতে তাহারা খায়।

৩৪. ওয়া (এবং, আর, ও) জাআলনা (আমরা করিয়াছি, আমরা পরিণত করিয়াছি, আমরা নিযুক্ত করিয়াছি, আমরা নির্দিষ্ট করিয়াছি, আমরা নির্ধারণ করিয়াছি, আমরা প্রদান করিয়াছি, আমরা সরবরাহ করিয়াছি, আমরা গঠন করিয়াছি, আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, আমরা তৈরি করিয়াছি, আমরা রাখিয়াছি, আমরা মনে করিয়াছি, আমরা ধারণা করিয়াছি, আমরা আরম্ভ করিয়াছি) ফিহা (উহার মধ্যে) জান্নাতিন (বাগানগুলি) মিন (হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্য হইতে, অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত, অপেক্ষা, দ্বারা, যাবৎ, এর, মধ্যস্থিত, অব, পার্ট অব, বিলংগিং টু, ফ্রম এমাং) নাখিলিন (খেজুর) ওয়া (এবং, আর, ও) আনাবিন (আঙুর) ওয়া (এবং, আর, ও) ফাজ্জরিনা (আমরা প্রবাহিত করি) ফিহা (উহার মধ্যে) মিনাল (হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্য হইতে, অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্গত, মধ্যস্থিত, অপেক্ষা, দ্বারা, যাবৎ, অব, পার্ট অব, বিলংগিং টু, ফ্রম এমাং) উইউন (ঝরনাগুলি, প্রস্রবণসমূহ, চক্কুগুলি, কুপসমূহ, স্প্রিং, ফর্টিনটেন, আই, সোর্স)।

ঈ এবং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তৈরি করিয়াছি উহার মধ্যে আঙুর এবং খেজুরের বাগানগুলি এবং আমরা প্রবাহিত করি উহার মধ্যে ঝরনাগুলি।

৩৫. লিয়াকুল (যাহাতে তাহারা খাইতে পারে) মিন (হইতে) সাম্মারিহি (উহার ফলসমূহ)।

ঈ যাহাতে তাহারা খাইতে পারে উহার ফলসমূহ হইতে।

+ ওয়া (এবং, আর, ও) না (না) আম্মিলাতহ (উহা সৃষ্টি করা, উহা তৈরি করা) আইদিহিম (তাহাদের হাতগুলি)

ঈ এবং উহা সৃষ্টি করে না তাহাদের হাতগুলি।

+ আফালা (তবুও কি না) ইয়াশকুরুনা (তাহারা শুকুর করে, তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে)।

ঈ তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না?

১ ব্যখ্যা : এই আয়াত তিনটির ব্যখ্যা লিখতে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে, যদি কেউ বলে যে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবার পর আবার কেমন করে বিচার ও শাস্তির জন্য হাজির করা হতে পারে, তা হলে তাদের জন্য একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো যে এই মৃত পৃথিবী হতে কেমন করে শস্যভাণ্ডারে ভরে তোলে। বর্ষিক বর্ষণের মাধ্যমে শুকনো এবং উর্বরতাবিহীন মাটিকে উর্বর করে তোলে এবং সবুজ গাছপালা জীবিত হয়ে উঠবার জীবনী শক্তিটি লুকিয়ে থাকে। আল্লাহ বলছেন, উহাতে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানি সঞ্জন করি এবং সেই সঙ্গে নদী-নালা ও ঝরনাগুলো তো আছেই। উহাতে অনেক রকম শস্য ও অনেক রকম

ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। মরা মাটিতে বৃষ্টির পানি বর্ষণের দ্বারা যেমন জীবনের অস্তিত্ব দেখতে পাই তেমনি মৃত মানুষকে সে-রকমভাবেই আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুসারে পুনরায় জীবন দান করা হয়। খেয়ে বেচে থাকবার উপকরণ হিসেবে প্রথমে খাদ্যশস্যের কথাগুলো বলা হয়েছে এবং পরে আনন্দ ও ভোগ-বিলাসের জন্য অনেক রকম ফলমূলের কথা বলা হয়েছে। একটি লক্ষ্য করার বিষয়টি হলো যে, মানুষ জমি চাষ করে বীজ বপন করে থাকে, কিন্তু উৎপাদন করার শক্তি সৃষ্টি করানি মানুষের হাতের কাজ নয় তথা ইহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের প্রতিপালকের রহমানরূপী দান হতে উহা উৎপন্ন হয়। কেমন করে বীজের ভেতর জীবনী শক্তিপ্রবেশ করে শস্য এবং ফসলসমূহ উৎপন্ন হচ্ছে সেই গোপন জীবনী শক্তিটি নব-নব রূপে উদ্ভাবন করার শক্তিটি দেওয়া হলেও আসল এবং গোপনীয় জীবনী শক্তিটির কেমন করে এবং কোথা হতে আগমন ঘটল এই প্রশ্নের উত্তরটি অজানাই থেকে যায়।

৩৬. সুবহানা (মহিমাময়, প্রশংসিত, মহাপবিত্র, গুণবান, মহিমাম্বিত, গৌরবাম্বিত, মহান, প্রেইজড, গ্লোরিফাইড) আল্লাজি (যিনি) খালাকা (সৃষ্টি করিয়াছেন) আজওয়াজা (জোড়ায়-জোড়ায়, যুগলবদ্ধ করা, মিলিত করা, মিলন ঘটানো, বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করা, টু পেয়ার, কাপল, টু ডাবল, টু ম্যারি) কুললাহা (সব কিছু, সর্ববিষয়, সমগ্র জগৎ, সকল কিছু, প্রত্যেকটি) মিম্মা (যাহা) তুম্বিতুল (তাহা উৎপাদিত হয়, তাহা জন্মায়, উৎপন্ন করা) আরদু (জমি, মাটি, দেহ, পৃথিবী, ভূখণ্ড, দেশ, আর্থ, ল্যান্ড, কার্গি, রিজিয়ন, এরিয়া, গ্রাউন্ড, সয়েল) ওয়া (এবং, আর, ও) মিন্ (হইতে, থেকে, চেয়ে) আনফুসিহিম্ (তাহাদের নফসসমূহ [নফসের বহুবচন। এখানে তাহাদের 'রুহগুলি' বলা হয় নাই] তাহাদের প্রাণগুলি) ওয়া (এবং, আর, ও) মিম্মা (যাহা) লা (না) ইয়ালামুন (তাহারা জানে)।

ঈ যিনি মহিমাম্বিত (তিনি) সৃষ্টি করিয়াছেন সব কিছু জোড়ায়-জোড়ায়, যাহা জন্মায় জমিতে এবং তাহাদের নফসসমূহ [রুহ বলা হয় নাই] হইতে এবং যাহা তাহারা জানে না।

৩৭. ওয়া (এবং, ও, আর) আয়াত্ (নিদর্শন, চিহ্ন, শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, নমুনা, আদর্শ, অলৌকিক বস্তু, মোজেজা, [কোরান]-এর আয়াত, সাইন, মিরাকিল, ভার্গ, একজাম্পল) লাহমুল (তাহাদের জন্য) লাইলু (রাত্রি)।

ঈ এবং তাহাদের জন্য রাত্রি (একটি) আয়াত।

+ নাস্লাখ (আমরা টানিয়া আনি, আমরা অপসারিত করি, আমরা চামড়ার মতো খসাইয়া দেই, আমরা পৃথক করিয়া ফেলি) মিনহ (উহার মধ্যে, উহা হইতে, উহা থেকে) নাহারা (দিনকে) ফাইজা (সূতরাং যখন) হম্ (তাহারা) মুজলিমুন (অন্ধকারাচ্ছন্ন, আধারে ঢাকা, অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, তিমিরাচ্ছন্ন)।

ঈ আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] অপসারিত করি উহা হইতে দিনকে সূতরাং যখন তাহারা অন্ধকারে ডুবিয়া যায়।

৩৮. ওয়া (এবং, ও, আর) শামসু (সূর্য) তাজরি (প্রবাহিত হয়, চলিতেছে, জারি রহিয়াছে, হয়, সংঘটিত হয়, সম্পন্ন হইতেছে, অনুষ্ঠিত হইতেছে, ফ্লা, ফ্লাক্স, স্ট্রিম) লিমুস্তাকার (স্থায়ী নিবাসের জন্য, বসবাসের জায়গার জন্য, বাসস্থানের জন্য, অবস্থানস্থলের জন্য, বিশ্রামস্থলের জন্য, অবস্থানের জন্য, আবাসের জন্য) লাহা (তাহার)।

ঈ এবং সূর্য তাহার অবস্থানের জন্য চলিতেছে।

+ জালিকা (ওইটা, ওই, উহা, ওইটি, দ্যাট, দ্যাট ওয়ান) তাকদিরুল (তকদির, ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট, প্রিডেস্টিনেশন, ফেইট, ডেসটিনি, লট) আজিজিল (মহাপরাক্রমশালী, শক্তিশালী, প্রতাপশালী, বিক্রমশালী) আলিম্ (সর্বজ্ঞাত, মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, ওমনিসিয়েন্ট)।

প্ট ওইটাই মহাজ্ঞানী মহাপরাক্রমশালী (নির্ধারিত) তকদির।

৩৯. ওয়াল (এবং) কামারা (চন্দ্র, চাঁদ) কাদ্দারুনাহ (আমরা হিসাব করিয়া নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি, আমরা বণ্টন করিয়া দিলাম, হিসাব করিয়া নির্ধারণ করিলাম) মানাজিলা (মজিলসমূহ, অবতরণের জায়গাসমূহ) হাততা (যতক্ষণ পর্যন্ত, যে পর্যন্ত, যখন, এমনকি) আদা (ফিরিয়া আসা, প্রত্যাবর্তন করা, সংঘটিত হওয়া, সংশ্লিষ্ট হওয়া, সম্পৃক্ত হওয়া, ফিরিয়া গেল, আবার আসিল, চলিয়া গেল) কার্ণউরজুনি (খেজুর শাখার মতো, খেজুরের ডালের মতো) কাদিম (পুরাতন, পুরানো, আদিকালের, প্রাচীন, সনাতন, চিরন্তন, চিরস্থায়ী, অবিদ্বন্দ্ব, ওল্ড, অ্যানশিয়েন্ট, অ্যান্টিক, একজিস্টিং ফ্রম টাইম ইম্মেমোরিয়াল, ইটারনালি প্রি-একজিস্টেন্ট)।

প্ট এবং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] হিসাব করিয়া নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি চন্দ্রকে (উহার) মজিলসমূহ, যতক্ষণ পর্যন্ত পুরাতন খেজুর ডালের মতো প্রত্যাবর্তন করে।

১ ব্যাখ্যা : এই চারটি আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে দেখতে পাই, প্রথমেই বলা হয়েছে যে যিনি তথা আলাহ সৃষ্টি করেছেন সব কিছু জোড়ায়-জোড়ায়। এই জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করার মধ্যে যোনিরহস্যের লীলাখেলাটি নীরবে বোবার মতো চলছে। এই লীলাখেলা কেবলমাত্র মানুষের মাঝেই নয়, বরং প্রাণীজগতে এবং বৃক্ষলতা এমনকি ফলমূলের মধ্যেও রয়েছে যা আমরা প্রাণী-বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে কিছুটা হলেও জানতে পারি। এই উদ্ভিদ উৎপাদনের মাঝেও যে যোনিরহস্যটি পৃথিবীর বুকে নীরবে কাজ করে চলছে উহা সাধারণ মানুষ জানে না অথবা বুঝতে পারে না।

মানুষের নফসগুলো একই প্রক্রিয়ার অধীন। একট লক্ষ করার বিষয়টি হলো, এখানে কিছু রুহ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। কারণ, রুহ জন্ম দেয় না, জন্মগ্রহণ করে না এবং রুহের বহুবচনও হয় না। নফসের বহুবচন 'আনফস' হয়, কিছু রুহ এক, একক এবং অখণ্ড। সুতরাং, রুহের বহুবচন হবার প্রশ্নই ওঠে না। জড়-জগতের মধ্যে যোনিরহস্যের লীলাখেলাটি না থাকতে পারে, কিছু বিদ্যুৎ, এটম, আলো ইত্যাদিতে আমরা দুটো জিনিস দেখতে পাই - একটি নেগেটিভ এবং অপরটি পজিটিভ। এই নেগেটিভ আর পজিটিভের মিলনেই জড় জগতের রহস্যটি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায়। 'আজওয়াজ' শব্দটির অর্থ করা হয় - সঙ্গী, সাথী, সহচর। এই সঙ্গী, এই সাথী সর্বপ্রথম আমরা দেখতে পাই, আদিপিতা আদমের সঙ্গে আদিমাতা হাওয়াকে।

অন্য কোরান বলছে, ওয়া মিন্ কুললি শাইয়িন খালাকনা জাওজাইনি লা আল্লাকুম তাজাক্কারুন - অর্থাৎ, 'আমরা প্রত্যেক জিনিস জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছি। সম্ভবত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে।' তারপর সাইব্রিশ নহর আয়াতে বলা হয়েছে, একটি আয়াত তথা নিদর্শন অথবা সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত। এ-জন্য রাতকে একটি রহস্যপূর্ণ আয়াত তথা নিদর্শন বলছি যে, মহানবি (সা.)-এর যে মেরাজের ঘটনাটি ঘটেছিল উহা দিনের বেলায় ঘটে নি, বরং রাতেই ঘটেছিল। তা ছাড়া বরাতের দিন, কদরের দিন বলে এমন কিছু উল্লেখ করা হয় নি। কেন?

'লাইলাতুল বরাত' তথা বরাতের রজনী, 'লাইলাতুল কদর' তথা কদরের রাত্রি - এই কথাগুলো দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতের মাঝে প্রবেশ করার অনেকগুলো ইশারা পাই। তাই বলা হয়েছে, যখনই দিনটিকে টেনে নেওয়া হয় তখনই রাতের অন্ধকার দেখা দেয়। মানবীয় জীবনটিকেও কি এই দিন আর রাত্রির মতো আলো-অন্ধকারের দোলনায় সারাটি জীবন দু'লে যেতে হয়?

কোরান অন্যত্র বলছে, ইউবশি লাইলান্ নাহারাহ ইয়াতলুবুহ হাসিসা - অর্থাৎ, 'রজনী দিবসটিকে ঢাকিয়া ফেলে এবং রজনী দিবসটিকে তাড়াতাড়ি

ডাকে।' এই আয়াতটির বহুমুখী ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু আর এগিয়ে গেলাম না।

আটত্রিশ নম্বর আয়াতে বর্ণিত এই বিশাল সূর্যটি যাহা এই পৃথিবী নামক গ্রহটি হতে তের লক্ষ গুণ বড়, অর্থাৎ তের লক্ষ পৃথিবী একত্র করলে সূর্যের সমান হয়, সুতরাং এই বিশাল সূর্যটি তাহার অবস্থানের জন্য আপন কক্ষপথে অবিরাম ছুটে চলছে এবং এই বিষয়টি কি একটি যেনতেন বিষয়, নাকি 'ওইটাই মহাপরাক্রমশালীর (নির্ধারিত) তকদির?'

মানুষের অতি ক্ষুদ্র নফসটির সঙ্গে প্রতিপালকরূপে রব অবস্থান করার দরুনই এইসব বিশাল ব্যাপার-স্যাপারগুলো বুঝতে না পারলেও মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারি। এত ক্ষুদ্র মনুষ্যজীব হয়েও যে এই বিশাল-বিশাল বিষয়গুলোর ধারণা করার শক্তি ও সামর্থ্য দেওয়া হয়েছে উহাও আল্লাহরই দান। বিজ্ঞানীরাও যে নতুন-নতুন রহস্যের বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারছেন তাও তো আল্লাহরই দান - তা সেই বিজ্ঞানী আল্লাহর দান বলে মানুষ চাই না মানুষ, তাতে আল্লাহর কিছুই যায় আসে না। এক নাস্তিক আশিটি বছর আল্লাহর নেয়ামতসমূহ ভোগ করে গেল, কিন্তু নেয়ামতের কথা তো দূরে থাক, বরং নেয়ামতদাতা তথা আল্লাহই নাই বলেছে। তারপর দাওয়াতে ভোজন করতে গিয়ে আল্লাহর নাম না নেওয়ার অপরাধে খাবার বাসনটি টেনে নেবার পর সেই নাস্তিক আশ্তিকে পরিণত হয়ে বলে ফেলল, এই বলে যে, আশিটি বছর তুমি আছ বলে মেনে নেই নাই, কিন্তু নেয়ামতের খানাপিনা হতে বঞ্চিত করে নাই, আর মাত্র এক বেলা দাওয়াত খেতে এসে তোমার নাম না নেওয়া দরুন খাবার বাসনটি টেনে নিয়ে যায়! কী প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ওই বৃদ্ধ নাস্তিক। মাত্র একটি ধাক্কাতেই আল্লাহর উপর ইমান এনে ফেলল। সুতরাং, এই কথাটি কি বলা যায় না যে, আল্লাহ ধনীকে গরিব করতে পারেন, গরিবকে ধনী করতে পারেন এবং আরও অনেক কিছু করতে পারেন?

উনচল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, চাদের জন্য যে বিভিন্ন মঞ্জিল নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে উহার মাধ্যমে চান্দ্রমাস গণনা করা যায়। সংখ্যা এবং হিসাব স্থির করার জন্যই চাদের এই মঞ্জিলসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। চান্দ্রমাসের শেষের দিকে চাদ ছোট হতে থাকে এবং এক সময় শুকনো বাকু খেজুরের ডালের মতো আকার ধারণ করে। এর রহস্যপূর্ণ ব্যাখ্যাগুলো যদি কারিগর জ্ঞানবার আগ্রহটি একান্তই থাকে তা হলে সেই পাঠককে অনুরোধ করব শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি-রচিত কোরান দর্শন নামের তিন খণ্ডে রচিত কোরান-তফসিরটি পড়ে দেখতে পারেন।

৪০. লা (না) শামসু (সূর্য) ইয়াম্বাগী (বিদ্রোহ করিয়া, হইতে পারে, ক্ষমতা রাখে) লাহা (উহার জন্য) আন (যে, এই যে, হইতে, বিষয়ে, সম্পর্কে) তদরিকাল (ধরিয়া ফেলিবে, নাগাল পাইবে, পাইয়া গিয়াছে) কাম্বারা (চন্দ্র, চাদ) ওয়া (এবং, আর, ও) লা (না) লাইল (রাত্রি) সাবিকুন (অগ্রগামী হওয়া, সামনে বাড়ান, অতিক্রম করা, সামনে আসা) নাহারি (দিন)।

সূর্য সূর্য ক্ষমতা রাখে না উহার জন্য যে চন্দ্রকে ধরিয়া ফেলিতে পারে এবং রাত্রি দিনকে অতিক্রম করিতে পারে না।

+ ওয়া (এবং, আর, ও) কুললুন (প্রত্যেক, প্রতিটি, সর্ব, সব, সমগ্র, সমুদয়, সমস্ত, সকল) ফি (মধ্যে, মাঝে, অভ্যন্তরে, ভিতরে, অভিমুখে, ইন, উইদিন, অ্যাম্মাং, নিয়ার) ফালাকিন (পরিভ্রমণ পথ, কক্ষ, অরবিট, প্রদক্ষিণ পথ, সার্কিট) ইয়াস্বাহন (সাতার কাটে, দ্রুতগতিতে চলে, সঞ্চার করে)।

সূর্য এবং প্রতিটি কক্ষপথের মধ্যে সাতার কাটিয়েছে।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, কোরান-এর এই আয়াত প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বলা হয়েছে, যখন বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থাটিও বিরাজ করত না। সেই অন্ধকার যুগে গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয়গুলো কী নির্ভুলভাবে কাজ করে যাচ্ছে তার বর্ণনাটি

পড়ে অবাক হবারই কথা। সেই প্রাচীন যুগে গ্রহ-নক্ষত্রের এমন সূক্ষ্ম ও নিখুঁত বর্ণনাগুলো আজও বিজ্ঞানীদেরকে বিস্মিত করে তোলে। সূর্যকে তার আপন কক্ষপথেই চলতে হয়, তাই চন্দ্রকে ধরে ফেলবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, চন্দ্র একটি উপগ্রহ। এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ আপন-আপন কক্ষপথে ছুটে চলছে এবং কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা রাখা হয় নি। তা ছাড়া সূর্য এবং চন্দ্র এবং সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র তোহিদ্দে বাস করে তথা নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতাটি কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। প্রকৃতির নিয়ম, যে-নিয়মটি আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া হয়েছে সেই নিয়ম ভঙ্গ করে রাগ্নি দিনের অগ্রবর্তী হতে পারে না এবং হবার বিধানটি রাখা হয় নি। সবাই তথা নভোমণ্ডলের যা-কিছু আছে সবই আপন-আপন কক্ষপথে সাতার কাটছে তথা দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে। দেড় হাজার বছর আগের ভাষাগুলো দিয়ে মূল বিষয়টি তুলে ধরার জন্য রূপক শব্দগুলো ব্যবহার করতে হয়েছে। তা না হলে প্রাচীন যুগের মানুষেরা এইসব নভোমণ্ডলের রহস্যগুলো ধারণায়ও আনতে পারত না। আধুনিককালের বিজ্ঞানীরা কোরান-এর মাঝে খুঁত ধরতে গিয়ে সব কিছু একদম নির্ভুল পেয়ে অবাক বিস্ময়ে পরম শ্রদ্ধাভরে কোরান-এর বাণীগুলো মাথায় তুলে রেখেছে।

৪১. ওয়া (এবং, আর, ও) আয়াতুন (নিদর্শন, চিহ্ন, শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, নমুনা, আদর্শ, অলৌকিক বস্তু, মোজ্জাজা, [কোরান-এর] আয়াত, সাইন, মিরাকিল, ভাঙ্গ, একজাম্পল) লাহম (তাহাদের জন্য) আননা (যে আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে], নিশ্চয়ই আমরা, অবশ্যই আমরা) হামালনা (আমরা আরোহণ করিয়াছি, আমরা উর্ধ্বে গমন করিয়াছি, আমরা উপরে উঠিয়াছি, আমরা বহন করিয়াছি, আমরা গর্ভধারণ করিয়াছি, গর্ভবতী হওয়া, ফল ধারণ করা, চাপাইয়া দেওয়া, আরোপ করা, কাধে তুলিয়া লওয়া, দায়িত্ব অর্পণ করা, বোঝাই করা, ক্যারি, বিয়ার, টু বি প্রেগন্যান্ট, টু বিয়ার ফুট, ইমপোজ) জুরিয়্যা তাহম (তাহাদের সন্তান-সন্ততি, তাহাদের বংশধর, তাহাদের আওলাদ) ফিল (তে, এ, মাঝে, মধ্যে, অভ্যন্তরে, ভিতরে, বিষয়ে, সম্বন্ধে, কালে, সময়ে, ইহাতে, অভিমুখে, প্রতি, ইন, উইদিন, অ্যামাং, নেয়ার) ফুলকি (নোয়ান, কিশতি, জাহাজ, পাত্র, আরোহণ করিবার আধার) মশহন (বোঝাইকৃত, ভর্তি, ভরা, পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ)।

প্ট এবং তাহাদের জন্য আয়াত, আমরা যে আরোহণ করাইয়াছি তাহাদের আওলাদদেরকে বোঝাই করা নৌকার মধ্যে।

১ ব্যাখ্যা : এই ছোট্ট আয়াতটির সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হচ্ছে যে, 'ফিল ফুলকি' বা 'নৌকার মধ্যে' শব্দটিকে কেমন করে জাহাজ বলা হয় তা আমার জানা নাই। কারণ, যে-ঘটনাটির কথা বলতে হয়েছে, উহা যদি নুহ নবি (আ.)-এর সময়ের হয়ে থাকে তা হলে তো জাহাজ শব্দটি ব্যবহার করা মোটেই সঠিক বলে মনে করি না। আর যদি মহানবি (সা.)-এর জামানায়ও বলতে হয় তা হলেও জাহাজ শব্দটি ব্যবহার করে মনের তৃপ্তি লাভ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, জাহাজ চালাতে হলে তেলের প্রয়োজন আর সেই তেল থাকে মাটির তলে। আর মাটির তলে যে-তেল থাকে উহাকে কুণ্ড অয়েল বলা হয় এবং উহা রিফাইনারি হতে রিফাইন করে বাহির করা হয়। উহার দ্বারাই জাহাজ চলে। অথচ, তেলের নাম-গন্ধটি পর্যন্ত সেই যুগে জানাই ছিল না। তা হলে কেমন করে জাহাজ শব্দটি ব্যবহার করা হয়? নৌকা, তারপর বড় নৌকা, তারপর খুব বড় নৌকা বলা চলে, অথচ জাহাজ লিখে কী যে মনে আনন্দ পায় উহা অধর্ম লেখকের জানা নাই।

৪২. ওয়া (এবং, আর, ও) খালাকুনা (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] সৃষ্টি করিয়াছি) লাহম (তাহাদের জন্য) মিন্ (হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্য হইতে, অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত, অপেক্ষা, দ্বারা, যাবৎ, এর, মধ্যস্থিত, অব, পার্ট অব,

বিলংগিঃ ট, ফ্রম এমাঃ) মিস্লিহি (তদনুরূপ, অনুরূপ, উদাহরণ, উপমা, সদৃশ, সমকক্ষ) মা (যাহা) ইয়ার্কাবুন্ (তাহারা আরোহণ করে)।

প্ট এবং তাহাদের জন্য আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] সৃষ্টি করিয়াছি তদনুরূপ হইতে যাহাতে তাহারা আরোহণ করে।

৪৩. ওয়া (এবং) ইন্ (যদি, যদি না, অবশ্যই, না, নিশ্চয়ই, নহে) নাশা (আমরা [বহুবচনে] ইচ্ছা করি, আমরা চাই) নুগরিকহম্ (তাহাদেরকে আমরা নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারি, তাহাদেরকে আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] ডুবাইয়া দিতে পারি) ফালা (সুতরাং না) সারিখা (ফরিয়াদ, সাহায্যকারী, চিৎকার, আর্তনাদ) লাহম্ (তাহাদের জন্য) ওয়া (এবং, আর, ও) না (না) হম্ (তাহাদের) ইয়ুনকাজুন্ (তাহারা পরিব্রাণ পাইবে না, তাহারা নাজাত পাইবে না, তাহাদেরকে ছাড়াইয়া আনা যাইবে না, তাহাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে না)।

প্ট এবং যদি আমরা চাই তাহাদেরকে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারি আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] সুতরাং তাহাদের জন্য সাহায্যকারী (পাইবে) না, এবং তাহারা পরিব্রাণ পাইবে না।

৪৪. ইল্লা (ব্যতীত, বাদে, ছাড়া, তবে, যদি না, কিছু, একমাত্র, আনলেস, একসেপ্ট, ওনলি, বার্ট, নট আনটিল) রাহমাতান্ (রহমত, অনুগ্রহ, দয়া, মেহেরবানি, অনুকম্পা, করুণা, ক্রমাশীলতা, দরদ, মমতা) মিন্না (আমাদের নিকট হইতে, আমাদের পক্ষ হইতে) ওয়া (এবং, আর, ও) মাতাতান্ (ভোগের সামগ্রী, জীবন উপভোগ, সামগ্রী, সম্পত্তি, আসবাবপত্র, সুখ, যে সমস্ত জিনিস কাজে লাগে, স্বামীর অবস্থানুযায়ী জামা-কাপড়-দোপাট্টা দেওয়া, প্রয়োজনীয় জিনিস, কাজে লাগে এমন জিনিস, উপকারের জন্য) ইল্লা (দিকে, প্রতি, নিকটে, পর্যন্ত, নাগাদ, অবধি, টু, ট্যার্ড, আপট) হিন্ (কিছুকাল, সময়, ক্রণ, সঠিক সময়, উপযুক্ত সময়, লগ্ন, মুদত, কোনো বস্তু লাভ করার সময়কে বলা হয়)।

প্ট কিছু আমাদের [বহুবচনে বলা হয়েছে] নিকট হইতে রহমত এবং কিছুকাল পর্যন্ত জীবন উপভোগ (করিতে দেওয়া হয়)।

১ ব্যাখ্যা : এই তিনটি আয়াতের কথাগুলো রহস্যপূর্ণ এবং রূপক ভাষার আবরণে সত্যকে মণ্ডিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই আয়াত তিনটির বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি জ্ঞানবার আশ্রয় থাকলে অনুরোধ করব শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি-রচিত কোরান দর্শন নামক তিন খণ্ডে রচিত কোরান-এর তফসিরটি পড়ে দেখতে পারেন। এ-জন্যই বললাম যে, এই তিনটি আয়াতের উপর নির্ভর করে অনেক তফসিরকারক নূহ নবির কিসতির কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং মহাপ্রাবনের ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেছেন যে সেই যুগের সমস্ত মোমিন মুসলমানদেরকে নৌকায় ওঠানো হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, পৃথিবীর যত বকম পশু-পাখি আছে সব কিছু জোড়ায়-জোড়ায় ওঠানো হয়েছিল। ধরে নিলাম, নূহ নবির কিসতিটি বিরাট-বিশাল একটি কিসতি, কিছু এ-কিসতির মধ্যে কেমন করে বাঘ-বাঘিনী, সিংহ-সিংহী, হরিণ-হরিণী, গজার-গজারনি - এভাবে জোড়ায়-জোড়ায় নৌকাটিতে স্থান দিতে গেলে সেই নৌকার আয়তন কমপক্ষে পঞ্চাশ লাখ টনের নৌকা হতে হয়। কারণ, এত দিনের মহাপ্রাবনে সিংহ-বাঘের খাদ্য মাংস, অন্যান্য জীব জন্তুদের খাদ্য ঘাস ও বনলতা ইত্যাদি রাখার কথা। পঞ্চাশ লক্ষ টনের জাহাজ বানানো তো দূরে থাক, সেই দিনে সেই যুগে কাঠের টুকরা দিয়ে এক হাজার টনের জাহাজ বানানো যায় কি না তাহা পাঠকের বিবেকের কাছে তুলে দিলাম। যদি বলা হয় - যায়, তা হলে বলার কিছু নাই। আর যদি বলা হয় - ইহা অসম্ভব, তা হলেও বলার কিছু নাই। শুধু একটি কথাই বলতে চাই যে, কোরান-এর এই তিনটি

আয়াত কী গভীর রহস্যপূর্ণ কথাগুলো বলছে আর সেই কথার সঙ্গে নূহ নবির কিসতিটিকে এনে যত রকম গোজামিলের ব্যাখ্যা দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। তফসিরকারকেরা একবার ভুলেও মুখ দিয়ে বলতে চাইল না যে, এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাটি আমাদের জানা নাই। সুতরাং, অধম লিখক অকপটে স্বীকার করে নিলাম যে, এই তিনটি আয়াতের ব্যাখ্যাটি আমার জানা নাই।

৪৫. ওয়া (এবং, আর, ও) ইজা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) কিল্লা (বলা হয়) লাহমুত (তাহাদেরকে) তাকু (তোমরা ভয় কর) মা (যাহা) বাইনা (মধ্যে, মাঝে, দুইটি বস্তুর মধ্যে অবস্থা বর্ণনা, মাঝখানে, মধ্যবর্তী স্থানে, মধ্যবর্তী সময়ে, দুইয়ের মধ্যে, পরস্পরের মাঝে, বহুর মধ্যে, অভ্যন্তরে, ভিতরে, বিটুইন, এমাং, অ্যামিডুস্ট), আইদিকুম (তোমাদের হস্তসমূহ [‘আইদি’ শব্দটি বহুবচন, একবচনে ‘ইয়াদ’। ইয়াদ অর্থ হাত, হস্ত, হাতল, আঙ্গিন, ক্রমতা, নিয়ন্ত্রণ, দখল, আয়ত্ত, সাহায্য, সমর্থন, ভূমিকা, (ঘড়ির) কাটা, হ্যান্ড, হ্যান্ডেল, পাওয়ার, কন্ট্রোল, ইনফুয়েন্স, অথরিটি, হেল্প, এইড]) ওয়া (এবং, আর, ও) মা (যাহা) খাল্ফাকুম (তোমাদের পিছনে, তোমাদের পশ্চাতে) লাহল্লাকুম (যাহাতে তোমরা, যেন তোমরা) তুরহামুন (রহমত পাইতে পার, তোমাদের উপর রহম করা হইবে, তোমাদের উপর রহম করা হউক)।

প্ট এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, তোমরা ভয় করো যাহা তোমাদের হস্তসমূহের মধ্যে এবং যাহা তোমাদের পিছনে (আছে), যাহাতে তোমরা রহমত পাইতে পারো।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতে আল্লাহর রহমত পাওয়ার আশা থাকলে অতীত এবং ভবিষ্যতের চিন্তাভাবনা করার কথাটি বলা হয়েছে। ভবিষ্যতের ভাবনায় সঠিক পথে চলার জন্য সাবধান থাকতে বলা হয়েছে এবং অতীতের ভুল-ভ্রান্তি গুলি আবার না আমলের মধ্যে এসে পড়ে সেই বিষয়টিতেও সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। অতীতের অনেক রকম সুখের এবং দুঃখজনক অভিজ্ঞতাগুলো যেন প্রথম সোপান। এই প্রথম সোপান হতে অভিজ্ঞতার শিক্ষাটি গ্রহণ করে পুনরায় ভুল-বিচ্যুতি হতে সাবধান থাকতে হবে। না হলে আল্লাহর রহমত পেয়ে মুক্তিলাভ করার সম্ভাবনাটি থাকবে না।

৪৬. ওয়া (এবং) মা (না) তাতিহিন্ম (তাহাদের কাছে আসে) মিন্ (হইতে) আয়াতিহ্ম (আয়াত, চিহ্ন, শিক্ষা, দৃষ্টান্ত, নমুনা, আদর্শ, মোজ্জেজা, সাইন, মিরাকল ভার্গ, একজাম্পল) মিন্ (হইতে, থেকে, চেয়ে) আয়াতি (নিদর্শনাদি, আয়াতসমূহ) রাব্বিহিন্ম (তাহাদের রবের) ইল্লা (ব্যতীত, বাদে, ছাড়া, তবে, যদি না, কিন্তু, একমাত্র, আনলেস, একসেপ্ট, ওনলি, বার্ট, নট আনটিল) কান্ (ছিল, আছে, হয়) আনহা (তাহা হইতে, তাহার নিকট হইতে, তাহার উপর) মুরিদিন্ (মুখ ফিরাইয়া লয়, বিমুখ, পরিহারকারী, বিরত, স্পৃহাহীন, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, উপেক্ষাকারী, প্রত্যাবৃত্ত, নিরস্ত)।

প্ট এবং তাহাদের কাছে আয়াত হইতে আসে না আয়াতসমূহের মধ্য হইতে তাহাদের রবের, একমাত্র তাহারা ছিল তাহার উপর উপেক্ষাকারী।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে বলতে হয় যে মানুষের জন্য সহজসাধ্য হয়ে ওঠে না কেবলমাত্র আপন রবের পরিচয়টি জানবার অভাবেই এবং সুপথে সহজেই পরিচালিত হওয়া যায়, কিন্তু সুপথ হতে সঠিক পথটি বেছে নেওয়া আর সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সুতরাং, সুপথ এবং সঠিক পথ এই দুইটি শব্দের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। যদিও সুপথ এবং সঠিক পথ দুটো শব্দই শুনতে ভালো লাগে, কিন্তু পার্থক্যটুকু বের করতে না পারলে রবের পরিচয়টি পাওয়া অনেকটা মুখের বিষয়ে পরিণত হয়। মুখের কথা আর চোখের দেখা এই দুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। এটা তখনই একজন সাধক বুঝতে পারে যখন সাধকটি কিছু দিন ধ্যানসাধনায় ডুবে থাকে। সাধনার নদীতে ডুব না দিলে কতগুলো কথাই কেবল আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু রবের পরিচয়-দর্শনটির কিছুই

বোঝা যায় না। সুতরাং, ধ্যানসাধনাটি হলো রবের পরিচয়ের বাস্তব সত্য আর পক্ষান্তরে মুখে-মুখে রবের পরিচয় জানার বিষয়গুলো অবাস্তব। এই অবাস্তব কথাগুলোর যারী নাগরআলি আর সাগরআলি তারা সুপথে আসে বটে, কিন্তু সঠিক পথটির পরিচয় জানতে পারে না। এ বড়ই সূক্ষ্ম বিষয়, সূক্ষ্ম ধোঁকাবাজি। এবং সুপথ বলাটি যে এদের একটি সূক্ষ্ম ধোঁকাবাজি তা তখনই মর্মে-মর্মে বুঝতে পারে যখন সাধক কিছুদিন ধ্যানসাধনায় রত থাকেন। এই রবের পরিচয়টি বাহিরে থাকে না, বরং আপন দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ের মাঝে অবস্থান করে। সূক্ষ্ম খান্নাস সূক্ষ্ম ধোকার দেয়ালটি নফস এবং রবের মাঝে দাড় করিয়ে রাখে। যখন সাধক এই সূক্ষ্ম খান্নাসের দেওয়া দেওয়ালটিকে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে এবং দ্বায়েমি সালতের মধ্যে ডুবে থেকে ছিন্ন করতে পারে তখনই রবের পরিচয়টি পরিপূর্ণরূপে ধরা দেয়। তাই বলা হয়ে থাকে, মান আরাফা নাফসাহ ফাকাহ আরাফা রাব্বাহ - তথা, যিনি তার আপন নফসটির পরিচয় জানতে পেরেছেন তিনিই রবের পরিচয়টি জেনে ফেলেছেন।

সুতরাং, আপন নফসের সঙ্গে অবস্থান করা আপন রবটির পরিচয়টি জানা যায় না, যতক্ষণ না ধ্যানসাধনার মাধ্যমে খান্নাসের দেওয়া অতিসূক্ষ্ম দেওয়ালটিকে ভেঙে ফেলতে পারে। এই জাতীয় লোকেরাই রবের পরিচয় জানার বিষয়টি হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তথা এরাই উপেক্ষাকারী, এরাই স্পাহীন, এরাই বিমুখ।

৪৭, ওয়া (এবং, আর, ও) ইজা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) কিল্লা (বলা হয়) লাহম (তাহাদেরকে) আনফিক (তোমরা ব্যয় করো, তোমরা খরচ করো) মিম্মা (যাহা, যাহা হইতে, কী হইতে, কীসের) রাজাকাকুমুল্লাহ (আল্লাহ তোমাদেরকে রেজেক দিয়াছেন)।

ঈ এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, তোমরা খরচ করো যাহা আল্লাহ তোমাদেরকে রেজেক দিয়াছেন।

+ কালা (বলে) লাজিনা (যাহারা) কাফার (কুফরি করিয়াছে, কাফের) লিল্লাজিনা (তাহাদের জন্য) আম্মান (ইমান আনিয়াছে) আনুতইম্ম (আমরা কি খাওয়াইব) মান (যে, কেউ, কাহারও) লাও (যদি) ইয়াশাউ (ইচ্ছা করেন) আল্লাহ (আল্লাহ) আত্‌আম্মাহ (তাহাকে খাওয়াইবেন, তাহাকে খাওয়াইতে পারেন)।

ঈ যাহারা কাফের (তাহারা) যাহারা ইমান আনিয়াছে (তাহাদেরকে) বলে, আমরা কি খাওয়াইব যাহাকে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন (তাহা হইলে) তাহাকে খাওয়াইতে পারেন।

+ ইন (যদি, যদি না, অবশ্যই, না) আনতম্ম (তোমরা) ইল্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত) ফি (মধ্যে, তে, এ, মাঝে, অভ্যন্তরে, ভিতরে, বিষয়ে, সম্বন্ধে, কালে, সময়ে, ইহাতে, অভিমুখে, প্রতি, ইন, উইদিন, অ্যাম্মাং, নেয়ার) দালালিন (বিদ্বান্দি, দ্রষ্টতা, দ্রাষ্টি, ভুল, ধোঁকা, প্রতারণা, ব্যর্থতা, টু লুস ওয়ান্স ওয়ে, গো অ্যাসট্রে, টু আর, টু মিসলিড, লিড অ্যাসট্রে, মিসগাইড, টু ডিলিউড, ডিসিড) মুবিন (স্পষ্ট, সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য)।

ঈ যদি না তোমরা একমাত্র সুস্পষ্ট বিদ্বান্দির মধ্যে (আছ)।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াতটির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই রেজেক সম্বন্ধে বলতে হয়। কারণ, আল্লাহর রেজেক দু'রকম হতে পারে। প্রথমটি অপরিবর্তনীয় রেজেক। এই রেজেক আল্লাহ নিজেই তার খাস বান্দাদেরকে দিয়ে থাকেন এবং অপর রেজেকটি হলো পরিবর্তনীয় রেজেক। এই রেজেক মানুষের মাধ্যমে অথবা সমাজের দ্বারা বিলিবর্টন করা হয়। কাফেররা আসল বিষয়টি বুঝেও নিজেদের হীনস্বার্থের প্রশ্নে বলে থাকে যে যারা গরিব লোক তাদেরকে তো আল্লাহই খাওয়াতে পারেন এবং কারো উপর ভরসা করার দরকার হয় না। কাফেরদের এই ধরনের মনোবৃত্তির উপর আল্লাহ বলছেন যে, কাফেরদের এ-রকম প্রকাশভঙ্গিটি একদম বিদ্বান্তিকর তথা যাহা শুনতে ভালো লাগে অথচ

ভেতরে প্রতারণার ফাঁদটি লুকিয়ে থাকে। তা ছাড়া কাফেরেরা ইমানদারদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করছে বলে সাব্যস্ত করতে চায়। যে-সকল কাফেরেরা সম্পদশালী তারা ধনৈশ্ব্যের অহংকারের আফালনটি করে যায়। কারণ, বিস্ত-বৈভবের মাঝে অহংকার, উদ্ধত এবং ইমানদারদের বিরুদ্ধে এভাবেই নিজেদের মতামত জাহির করে। যুগে-যুগে, কালে-কালে এবং আজও ধনসম্পদের এ-রকম অমার্জনীয় ধৃষ্টতার আচরণগুলো সমাজের বুকে প্রতিনিয়ত ফুটে ওঠে।

৪৮. ওয়া (এবং, আর, ও) ইয়াকুলনা (তাহারা বলে) মাতা (কখন, কবে, যখন, হোয়েন, অ্যাট হোয়াট টাইম) হাজা (ইহা, এই, এইটি, এইজন, ইনি, দিস ওয়ান, দিস) ওয়াদ (ওয়াদা, অস্বীকার, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, প্রমিজ, পুজ) ইন (যদি, যদি না, অবশ্যই, না, নিশ্চয়ই, নহে) কুনতুম (তোমরা ইও) সাদিকিন (সত্যবাদী, সৎ, সত্য, খাটি, প্রকৃত, আন্তরিক, ঠু, ঠুখফুল, সিনসিয়ার, একজাক্ট, অথেনটিক)।

প্ট এবং তাহারা বলে, কখন এই ওয়াদা (পূর্ণ হইবে?) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৪৯. মা (না, কি, যে, যাহা, নহে, যতক্ষণ, যদি, যা, নাই, নি, নয়, কত, কোন) ইয়ানজুরনা (তাহারা অপেক্ষা করে, তাহারা দেখে) ইল্লা (ব্যতীত, বাদে, ছাড়া, তবে, যদি না, কিছু, একমাত্র, আনলেস, একসেপ্ট, ওনলি, বাট, নট আনটিল) সাইহাতান (বিকট আওয়াজ, প্রচণ্ড শব্দ, শোনা যায় নাই এমন শব্দ করিয়া মারা যাওয়া, ট ডাই আনহার্ড, চিংকার, ক্রাই, আউটক্রাই, শাউট) ওয়াহিদাতান (একটি, একটিমাত্র) তাখুজ্জহম (তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে, তাহাদেরকে পাকড়াও করিবে, তাহাদিগকে আঘাত হানিবে) ওয়া (এবং, আর, ও) হম (তাহারা) ইয়াখিসিসিমুন (বাগবিতণ্ডা করিবে, বিতর্কে লিপ্ত থাকিবে)।

প্ট তাহারা অপেক্ষা করে না একটিমাত্র প্রচণ্ড আওয়াজ ছাড়া (যাহা) তাহাদিগকে আঘাত হানিবে এবং তাহারা বিতর্কে লিপ্ত থাকিবে।

৫০. ফালা (সূতরাং না) ইয়াস্তাতিউনা (তাহারা সমর্থ হইবে, তাহারা সক্ষম হইবে) তাওসিয়াতান (উইল, অসিয়ত, সুপারিশ, উপদেশ, পরামর্শ, আদেশ) ওয়া (এবং, আর, ও) লা (না) ইলা (দিকে, প্রতি, নিকটে, পর্যন্ত, নাগাদ, অবধি, ট, টুয়ার্ড, আপ ট, টিল, আনটিল) আহলিহিম (তাহাদের পরিবার-পরিজন) ইয়ারজিউন (তাহারা ফিরিয়া যাইতে পারিবে, তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারিবে)।

প্ট সূতরাং তাহারা সমর্থ হইবে না অসিয়ত করিতে এবং তাহাদের পরিবার-পরিজনের দিকে তাহারা ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।

১ ব্যাখ্যা : এই তিনটি আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় যে কাফেররা কেবল আল্লাহর বিরোধিতাই করে না, বরং আত্মঅহংকারের অনেক রকম বাক্যের আঘাতে ইমানদারদেরকে বিভ্রান্ত তথা সঠিক পথে অবস্থান করছে না বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কাফেরদের মতে, নবি-রসুলদের বাণীর উপর ইমানদারেরা একটা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে আছে। এই জন্য কাফেরেরা ঠাট্টা-বিদ্বেষের অনেক রকম কুৎসিত বাক্যবাণে ইমানদারদেরকে প্রতিনিয়ত জর্জরিত করে, এমনকি কাফেরেরা ইমানদারদের উদ্দেশ্য করে বলে থাকে, যদি তোমাদের কথা অনুসারে পরকাল বলে কিছু থেকেই থাকে তবে সেই পরকালটি কখন হবে এবং কেমন করে হবে ইহী আমাদেরকে বলে দাও। কাফেরদের এই কথার জবাবে কোরান বলছে যে, ইহা একটি আকস্মিক মৃত্যুঘণ্টা। এই মৃত্যুঘণ্টা তাদের কাছে সহসা এমন এক পরিস্থিতিতে আগমন করবে যখন তাদের মনের বিরোধসমূহের অবসান করতে পারবে না। মতবিরোধ এবং সংশয়-সন্দেহের তর্ক-বিতর্কের মাঝেই তাদের মন তখনও লিপ্ত হয়ে থাকবে। যখন এই ধ্বংসাত্মক মৃত্যুঘণ্টাটি উপস্থিত হবে তখন

তারা অসিয়ত করার বাক্যটি উচ্চারণ করার সময়টুকুও পাবে না। তারা অনিচ্ছায় মরণকে বরণ করে নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তাদের নিজেদের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে পারবে না। 'সাইহাতাও ওয়াহেদাতান' শব্দটি কোরান-এ বেশ কয়েকবার উল্লেখ হয়েছে। উহার আভিধানিক অর্থ হলো, একটি ধ্বনি। অনুবাদে ইহার অর্থ লেখা হয় 'মহা একটি নিপাত', 'একটি ধ্বংসধ্বনি', 'মৃত্যুঘণ্টা' অথবা 'মরণাঘাত'। আবার ইহাও অনুবাদ করা হয় যে, ইহার শাব্দিক অর্থটি হলো প্রবল ঝড় অথবা ভূমিকম্প, কানকে বধির করার প্রচণ্ড শব্দ এবং ইত্যাদি। আসলে এই 'একটি ধ্বনি' কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? ইহা একটি মৃত্যুপথযাত্রী নফসের জন্য কর্ণবধিরকারী ভয়ঙ্কর একটি শব্দ অথবা প্রচণ্ড একটি আঘাত। দুনিয়ার কোনো প্রচণ্ড শব্দের বিস্ফোরণে আমাদের কান যেমন বধির হয়ে যায়, তেমনি মৃত্যুপথযাত্রী নফসের উপর ভয়ঙ্কর একটি শব্দ ঘটে থাকে। মৃত্যুপথযাত্রী নফসের উপর যে-প্রচণ্ড আঘাতটি ঘটে থাকে উহাকে মরণাঘাত বলা হয়। কারণ, এই মরণাঘাতের মাধ্যমেই একটি নফসের সব রকম কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটে। এই মৃত্যুঘণ্টার শব্দের নিকট প্রত্যেকটি জীবের যত রকম শব্দ থাকে সব কিছু নীরব-নিখর হয়ে যায়।

তবে সাধারণ মানুষের জন্যও সাধারণ ব্যাখ্যাটি অবশ্যই থাকতে হবে। কারণ, সবার পক্ষে সব কিছু বুঝে ওঠা সম্ভবপর নয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে হজরত ইসরাফিল যে আল্লাহর হুকমে শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন সেই ফুঁ-টি লম্বা হবে তথা দীর্ঘ হবে। হজরত ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুঁংকার শুনে মাটিতে অবস্থান করা পা দুটো আকাশের দিকে উঠে যাবে এবং মাথাগুলো নিচে নেমে যাবে। লেলিহান এক প্রজ্বলিত আগুনের তাড়া খেয়ে সবাই কেয়ামতের মাঠে একত্রিত হবে এবং সেই প্রজ্বলিত আগুন চারদিক থেকে সবাইকে ঘিরে ফেলবে। এই জাতীয় অনেক কথাই পাঠকদের সামনে তুলে ধরা যায়, কিন্তু এত রূপকের ছড়াছড়ির মধ্যে না গিয়ে আসল যে উলঙ্গ সত্যটি উহা হলো, একটি ব্যক্তির মৃত্যুকেই বলা হয় কেয়ামতে সগিরা তথা ছোট কেয়ামত। এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে জড়ানো মোটেই ঠিক হবে না। কারণ, প্রত্যেক আল্লাহর ওলি ভালো করেই জানেন যে পুনর্জন্মবাদটিতে অনেক রকম রূপকতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। সুতরাং, যে যতটুকু বুঝে বা বুঝতে পারে তার উপর আঘাত করা সঠিক নয় বলে মনে করতে চাই।

৫১. ওয়া (এবং, ও, আর) নুফিখা (ফুংকার দেওয়া হইবে, বোয়িং আপ) ফি (মধ্যে, মাঝে, তে, এ, অভ্যন্তরে, ভিতরে বিষয়ে, সম্বন্ধে, কালে, সময়ে, ইহাতে, অভিমুখে, প্রতি, ইন, উইদীন, অ্যামাং, নেয়ার) সুরি (শিঙ্গা) ফাইজা (সুতরাং যখন, সুতরাং ওই সময়, সুতরাং হঠাৎ) হম্ (তাহরা) মিনাল্ (হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্য হইতে, অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত, অপেক্ষা, দ্বারা, যাবৎ, এর, মধ্যস্থিত, অব, পাট অব, বিলংগিং টু, ফ্রম এমাং) আজ্দাসি ('আজ্দাস' অর্থ সেই কবর, অর্থাৎ সেই মানবদেহ যাঁহা পুনরায় জীবন লাভ করেছে। জন্মপ্রাপ্ত একটি কবরকে আজ্দাস বলে। এই আজ্দাস হতে মরণের আঘাতটির দ্বারা পুনরায় রবের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, আপন রব-সাধনাটিকে বৈষয়িক জীবনে পুনরায় পাঠানো হয়। সেই নফসটির খান্নাসমুক্ত হওয়ার তরে এবং খান্নাসমুক্ত হতে হলে পুনরায় ধ্যানসাধনার মাধ্যমে শোধনক্রিয়াটি সম্পাদন করতে হয়। এখানে কবর শব্দটি ব্যবহার না করে তাই আজ্দাস বলা হয়েছে। তা ছাড়া কবর শব্দটির আসল অর্থটি হলো মাটির দেহ, যেখানে নফস বসবাস করে। অনুবাদে অনেকেই আজ্দাস শব্দটিকে কবর অনুবাদ করে থাকেন) ইলা (দিকে, প্রতি, নিকটে, পর্যন্ত, নাগাদ, অবধি, টু, টুয়ার্ড, আপটু, টিল, আনটিল) রাব্বিহিম্

(তাহাদের রব, তাহাদের প্রতিপালক, তাহাদের সদাপ্রভু) ইয়ানসিলুন (দ্রুত ছুটিয়া আসিবে, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিবে)।

ঈ এবং শিকার মধ্যে ফু দেওয়া হইবে সুতরাং যখন তাহারা আজাদাস হইতে তাহাদের প্রতিপালকের দিকে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিবে।

৫২. কালু (তাহারা বলিবে) ইয়াওয়াইলানা (হায় আমাদের জন্য পরিতাপ, হায় আমাদের দুঃখ, হায় আমাদের দুর্দশা) মাম (কে) বাআসানা (আমাদেরকে উঠাইল, আমাদেরকে উখিত করিল, আমাদেরকে পুনরুখিত করিল, আমাদেরকে পুনর্জীবিত করিল, আমাদেরকে জাগ্রত করিল) মিম্মারকাদিনা (মরকদ হইতে মরকদের অর্থটি হলো পাপীদের দেহ-কবর। যারা খান্নাস-মুক্তির চেষ্টা করে কিছুটা খান্নাসটিকে দুর্বল করতে পেরেছে অথচ মুক্তিলাভ করে জাল্লাতে যাবার যোগ্যতাটি অর্জন করতে পারে নাই, তারাই খান্নাসমুক্ত জীবন লাভ করবে। এটাই আল্লাহর বিধান। এখানে সং জীবনযাপন এবং চরিত্রের উন্নতি বলতে খান্নাস হতে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টাকেই বোঝানো হয়েছে)।

ঈ তাহারা বলিবে, হায় আমাদের জন্য পরিতাপ! কে আমাদিগকে আমাদের মরকদ হইতে উঠাইল?

+ হাজা (ইহা, এই, এইটা, এইজন, ইনি, দিস ওয়ান, দিস) মা (যাহা, যে,) ওয়াদা (ওয়াদা, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা, প্রমিষ্ট, প্রেরণ) রাহমান (রহমানের) ওয়া (এবং, আর, ও) সাদাকা (সত্য বলিয়াছে, সত্য কাজ দেখাইয়াছে, যথার্থ বলিয়াছে, প্রকৃত কথা বলিয়াছে, খাটি কথা বলিয়াছে) মুরসালুন (রসুলেরা, রসুলগণ)।

ঈ এইটাই যাহা রহমানের ওয়াদা এবং রসুলেরা সত্য বলিয়াছেন।

১ ব্যাখ্যা : মৃত্যু-নামক ঘটনাটি যখন দেহের মধ্যে ফুৎকার দেওয়া হয় তখন দেহ হতে নফসটি বাহির হয়ে পড়ে তথা দেহের সঙ্গে আর নফসের কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং আপন প্রতিপালকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এ-রকম পরিস্থিতিতে পরিস্কার বোঝা যায় যে, খান্নাস জড়ানো নফসটি বলে, আমাদের দুর্ভাগ্য এই খান্নাস-মিশ্রিত দেহ হতে কে আমাদেরকে আলাদা করে নিয়ে যাবে? দুনিয়ার জীবনে এতটি দিন খান্নাসকে রেখেই এই দেহঘরে আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। তখন বলা হবে, তোমাদের এই দুনিয়ার জিন্দেগিতে রহমান হতে নবি-রসুলেরা বারবার সাবধান করে দেবার পরও উহাতে তোমরা কর্ণপাত তথা সত্য বলে জেনেও কাজ করার বেলায় সত্যটিকে অনুসরণ করো নাই। সুতরাং, রসুলেরা যে সত্য কথাগুলো তোমাদেরকে বারবার শুনিয়েছিলেন উহা এখন পরিস্কারভাবে বুঝে নাও। প্রতিটি নফসের দুনিয়ার জিন্দেগির কর্মফলের উপর ভিত্তি করেই ন্যায়-অন্যায় বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। ইহাই আল্লাহর আইন। এই আইন, এই বিধান বদলানো হয় না। তাই কোরানুল করিম বারবার বলে দিয়েছে এই বলে যে, সুলতান্লাহি লা তাবদীলা - তথা, আল্লাহর আইন কখনোই বদল করা হয় না।

৫৩. ইন (না, নহে, যদি, যদি না, অবশ্যই, নিশ্চয়ই) কানাত (হওয়া, ঘটা, ছিল, আছে, থাকা, হবে) ইল্লা (ব্যতীত, বাদে, ছাড়া, তবে, যদি না, কিন্তু, একমাত্র, আনলেস, একসেপ্ট, ওনলি, বাট, নট আনটিল) সাইহাতান (বিকট আওয়াজ, প্রচণ্ড শব্দ, শোনা যায় নাই এমন শব্দ করিয়া মারা যাওয়া, ট ডাই আনহাউ, চিৎকার, ক্রাই, শাউট, আউটক্রাই) ওয়াহিদাতান (একটি, একটিমাত্র, ওনলি ওয়ান) ফাইজা (সুতরাং যখন, সুতরাং ওই সময়, সুতরাং হঠাৎ) হম (তাহারা) জামিউন্ (সকলে, সবাই, সব কিছু, একত্রে, ইন এ বডি, অলটগেদার, ওয়ান অ্যান্ড অল, অল অব দেম, এনটায়ারলি, হোললি, টোটালি) লাদাইনা (আমাদের নিকট, আমাদের কাছে, ইন ফুন্ট অব আস, বিফোর আস, নেয়ার আস, ক্রোজ টু আস) মুহদারুন (ওই সমস্ত লোক যাহাদেরকে হাজির করা হইবে, উপস্থিত, সামনাসামনি আনিত)।

প্ট একটিমাত্র বিকট আওয়াজ ছাড়া (আর কিছু) হইবে না, সুতরাং যখন তাহাদের সকলকে আমাদের নিকট [বহুবচনে বলা হয়েছে] হাজির করা হইবে।

১ ব্যাখ্যা : ‘সাইহাতাও ওয়াহিদাতান’ তথা একটিমাত্র বিকট আওয়াজ বলতে দেহ হতে নফসকে আলাদা করে দেবার শব্দ তথা মরণ বাণির সুর বোঝানো হয়েছে। এরই ফলে আমাদের নিকট তথা আল্লাহর নিকট মানুষ পুনরায় এসে হাজির হয়। সম্পূর্ণরূপে খাল্লাসমুক্ত না-হওয়া পর্যন্ত তথা একটি পরিপূর্ণ নফস বারবার ফিরে আসবার ব্যবস্থাপত্রটি রাখা হয়েছে। মান আরাফা নাফসাহ ফাকাহ আরাফা রাববাহ – তথা, যে তার নফসকে চিনতে পেরেছে তথা নফস সম্পূর্ণরূপে খাল্লাস হতে কলুষমুক্ত হতে পেরেছে সে-ই কেবল রবকে তথা প্রতিপালককে চিনতে পেরেছে। খাল্লাস হতে নফস সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বারবার আগমনের কথাটি বলা হয়েছে।

৫৪. ফালইয়াওমা (সুতরাং সেই দিন, সুতরাং সেই সময়, সুতরাং আজ, টুডে) লা (না) তুজ্জাম্ম (জুলুম করা হইবে, অত্যাচার করা হইবে, উৎপীড়ন করা হইবে, জ্বরদস্তি করা হইবে) নাফসুন (প্রাণ, প্রাণী, ব্যক্তি, মানুষ, নফস [এখানে রুহ শব্দটি ব্যবহার করা হয় নাই। রুহের প্রতিশব্দ বাংলাতেও নাই এবং ইংরেজিতেও নাই। তবে হিন্দু ধর্মে রুহকে পরমাত্মা বলা হয়। নফসকে হিন্দু ধর্মে জীবাত্মা বলা হয়। আসলে নফস কেবলমাত্র প্রাণ। ইহা মোটেও আত্মা নহে। তবে জীবের সঙ্গে যুক্ত করে জীবাত্মা বলা হয় বোঝানোর জন্য। এই জন্য আমরা যেখানে নফস শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাই সেখানে রুহ শব্দের ব্যবহারটি পাই না বলেই বারবার পাঠকদের সামনে তুলে ধরি। কারণ, বারবার একটি বিষয় তুলে ধরলে ভুলের আবরণটি কেটে যাবার সম্ভাবনাটি থাকে।) শাইয়ান (কিছু, বস্তু, জিনিস) ওয়া (এবং, আর, ও) লা (না) তুজ্জাওনা (বদলা দেওয়া হইবে, প্রতিদান দেওয়া হইবে, প্রতিফল দেওয়া হইবে, পরিশোধ করা হইবে) ইল্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত, ছাড়া, তবে, যদি না, আনলেস, একসেপ্ট, ওনলি, বাট, নট আনটিল) মা (যাহা, যে, না, কি, নহে, নাই, নয়, কত, কোন) কুনতুম (তোমরা ছিলে, তোমরা হও) তামালুন (আমল করিয়াছ, কাজ করিয়াছ)।

প্ট সুতরাং আজ জুলুম করা হইবে না কোনো নফসের উপর এবং প্রতিফল দেওয়া হইবে না তোমরা যে আমল করিয়াছ তাহা ছাড়া।

১ ব্যাখ্যা : আজ এই সময়ে কোনো নফসের উপর কোনো রকম অবিচার হবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, সেই বিবর্তনকালের মাঝে (ট্রানজিশনাল পিরিয়ড) অতীত নিখুঁত বিচারের ধারা অনুসারে যার যে-রকম কর্ম তিক তার কর্মফলও সে-রকমই দেওয়া হবে। এই কর্মফলটি ভালোও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে পূর্বজন্মের কর্মফলের নিখুঁত বিচারের মাধ্যমে। হিন্দুধর্মে কর্মফল ভোগ করাটি অবশ্যস্বাভাবী। এবং ইহাতে সামান্যতম ছাড় দেওয়া হবে না। বৌদ্ধধর্মে কর্মফল বিষয়ে একই রকম কথা বলা হয়েছে। তারপর প্রাচীন জৈন ধর্মেও কর্মফলের প্রশ্নে নিখুঁত বিচারের কথাটি বলা হয়েছে। তাই এই আয়াতে বলা হচ্ছে যে, প্রতিদান পাবার বিষয়ে নফসের উপর কোনো প্রকার এদিক-সেদিক করা হয় না। একটি নফস তথা একটি প্রাণ তথা একটি মানুষ অনুশোচনার তাপদাহে জর্জরিত হতে পারে, কিন্তু পুরস্কার এবং শাস্তি কর্মফল অনুযায়ী দেওয়া হবে।

৫৫. ইননা (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে) আস্হাবা (অধিবাসীরা, বাসিন্দারা, নিবাসীরা) জান্নাতিল (জান্নাতের, বেহেশতের) ইয়াওমা (দিন, সময়) ফি (মধ্যে, মাঝে, অভ্যন্তরে, ভিতরে, বিষয়ে, সম্বন্ধে, কালে, তে, এ, ইহাতে, অভিমুখে, প্রতি, ইন, উইদিন, অ্যামাং, নেয়ার) শুগুলিন (কর্মচালন্য, কাজের ব্যস্ততা, সক্রিয়তা, কর্মতৎপরতা, কাজকর্ম, ফ্রিয়াকলাপ, কৃতকর্ম,

ওয়ার্ক, অ্যাকটিভিটি) ফাকিহন (আনন্দিত, প্রফুল্ল, অহ্লাদিত, হুঁট, প্রসন্ন, সহাস্য, সন্তুষ্ট)।

স্ট নিশ্চয়ই (এই) দিনে জ্ঞানাতের অধিবাসীরা কাজের মধ্যে আনন্দিত থাকিবে।

১ ব্যাখ্যা : খান্নাসমুজ্ঞ নফস জ্ঞানাতেই অবস্থান করে। তখন এই দুনিয়ার পার্থিব জীবনটাও জ্ঞানাতের মধ্যেই অবস্থান করে। জ্ঞানাত অর্থ যেমন সুখের স্থান তেমনি বাগান বা উদ্যানকেও জ্ঞানাত বলা হয়। খান্নাসমুজ্ঞ একটি জীবন এই সম্ভ্রাতযুক্ত দুনিয়ার মাঝেও আপন ভাবের মধ্যে ডুবে থেকে আপন জ্ঞানাত নামক বাগান বা উদ্যানে অবস্থান করে। তাই জ্ঞানাত কাজ করার কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাজগুলো কী কী কাজ হতে পারে তা অধম লিখকের জানা নাই। তবে কোরান-এর তফসির হতে বহু রকম কথা শোনানো যেত। তবে একটি কথা বলে রাখতে চাই যে, কোনো কাজই দোষণীয় অথবা কলুষিত হয় না যখন খান্নাসমুজ্ঞ একটি নফস কর্মগুলোর মাঝে নিয়োজিত থাকে। নফস কর্মগুলোকে কলুষিত করে না, বরং নফসের সঙ্গে যখন খান্নাসটি অবস্থান করে তখনই কর্মগুলো কলুষিত হয়ে যায়। সুতরাং, খান্নাসমুজ্ঞ নফসগুলোর কাজের মধ্যে আনন্দিত থাকার কথাটি বলা হয়েছে।

৫৬. হম্ম (তাহারা) ওয়া (এবং, আর, ও) আজওয়াজুহম্ম (তাহাদের স্বীগণ, তাহাদের মহিলাগণ, তাহাদের সঙ্গিনীগণ, তাহাদের সঙ্গী-সঙ্গিনীগণ) ফি (মধ্যে, মাঝে, অভ্যন্তরে, ভিতরে, বিষয়ে, সম্বন্ধে, কালে, সময়ে, ইহাতে, তে, এ, অভিমুখে, প্রতি, ইন, উইদীন, অ্যাম্মাং, নেয়ার) জিলালিন্ (ছায়াসমূহ, শ্যাডো) আলা (উপরে, দিকে, উর্ধ্বে, প্রতি, অভিমুখে, বিষয়ে, সম্পর্কে, যুক্ত হইয়া, ভিত্তি করিয়া, তদধিক, অধিকন্তু, উচ্চে, অধিকতর উচ্চে, অনি, আপঅন, ওভার, এবাড) আরাযিকি (সিংহাসন, উচ্চাসন, সুসজ্জিত আসন, গদি, এমন সজ্জিত কাঠ যাহাতে পরদা লাগানো আছে, পালকী) মুততাকিউন (হেলান দিয়া বসিবে, হেলান দিয়া থাকিবে, যাহারা গদি বা বিহীনায় মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করে, লাঠির উপর ভর করিয়া চলাচল করে যারা, ভেসদাতাগণ)।

স্ট তাহারা এবং তাহাদের সঙ্গিনীরা ছায়ার মধ্যে সিংহাসনের উপরে হেলান দিয়া থাকিবে।

১ ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে জ্ঞানাতের অনেক কুমারী নারীদের নিয়ে আম্মোদ-আহ্লাদে ডুবে থাকবে এবং অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে সঙ্গীদের মূর্তনায় উৎসবে মেতে থাকবে। সেই সকল কুমারী নারীদের রূপের আকর্ষণে আনন্দ উৎসবের মাত্রাগুলো বেড়ে যেতে থাকবে এবং সেই সকল কুমারী নারীদেরকে নিয়ে আনন্দের বন্যায় ডুবে থাকবে। সঙ্গে বহুবিবাহ করে থাকলে বহু স্বীরা অথবা যার এক স্বী আছে সেই স্বীও সঙ্গে থাকবে। তবে স্বীকে অবশ্যই জ্ঞানাত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, নতুবা কোনো স্বীরই থাকার কথা নয়। কারণ, স্বীরা অথবা একজন স্বী যদি জুহিন্মামি হয় তা হলে তাদের বা তার অবশ্যই জ্ঞানাতে থাকার কথা নয়। এই কুমারী নারীদেরকেই হর বলা হয়ে থাকে। এই হরদের রূপলাবণ্য এতই আকর্ষণীয়, এতই অভাবনীয় যাহা জ্ঞানাতবাসীরা কোনোদিনও দেখেন নাই। তাই গদিওয়াল সিংহাসনে অথবা সুসজ্জিত খাটের উপর হেলান দিয়ে হরদের রূপলাবণ্য ও বাদ্যযন্ত্রের নানা রকম সুরমূর্তনায় বিভোর হয়ে থাকবে। তারপরের কথাটি হলো, জ্ঞানাতবাসীরা এতই সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ প্রথমেই তাদেরকে সালাম জানাবেন, জ্ঞানাতবাসীরা তথা বেহেশতবাসীরা কুমারী নারীদের তথা হরদের নিয়ে ভোগবিলাসে এতই নিমগ্ন থাকবে যে সহসা তারা জ্ঞানাতের উপর একটি অতি উজ্জ্বল আলো দেখতে পাবে। তখন তারা তাদের রবের দর্শনটি লাভ করবেন, তবে যতক্ষণ আল্লাহকে দেখতে থাকবে ততক্ষণ জ্ঞানাতের কুমারী নারীদের তথা হরদের

রূপলাবণ্য, সুস্বাদু ফলসমূহ এবং নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্রের বাদ্যবাজনার সুরলহরি একদম ভুলে গিয়ে আল্লাহর দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকবেন। এই জাতীয় অনেক রকম সুন্দর-সুন্দর কথাগুলো লিখে পাঠকদেরকে জানিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু কেন যেন অধম লিখকের নিকট মনে হয়, এই কথাগুলো রূপকের চাকচিক্যময় আবরণে আবরিত বর্ণনা। তাই আর অগ্রসর হতে চাইলাম না। কারণ, অতি সাধারণ মানুষকে বোঝাতে গেলে রূপকের আশ্রয় নিতে হয়, নতুবা আসল বিষয়টি সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝাটা বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, নবি-রসুলেরা সবার জন্য। সুতরাং, সবাইকে বোঝাতে গেলে রূপকের আশ্রয় ছাড়া বোঝানোটি বড়ই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

দার্শনিকের সম্ভাবনাত্মক আছে, বিজ্ঞানীর বলয় আছে, জ্ঞানীর প্রাচীর আছে, কিন্তু আল্লাহর নবি-রসুলদের বেলায় সবাইকে যার-যার বুঝ ও জ্ঞানের মাপকাঠির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হয়। তাই আল্লাহর নবি-রসুলদের বাণীর মাঝে উচ-নিচ ধাপগুলো দেখতে পাই এবং এই ধাপগুলো নবি-রসুলদের সৌন্দর্য এবং ইহাই মহিমাম্বিত করে রাখা হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনেরও গুরু আল্লাহর নবি-রসুলেরা, তোমনি বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনের গুরু এই নবি-রসুলেরা, উচ্চশিক্ষিত, মধ্য শিক্ষিত, গণমুখ, গবেষ্ট, ইন্ডিয়ট, স্যাডেজদেরও গুরু এই নবি-রসুলেরা। সুতরাং, সবাইকে বুঝাতে গেলে কখনোই এক রকম কথা হতে পারে না, বরং কথার গুজনের মাপকাঠি অনেক রকম হতে বাধ্য। এইটুকু বুঝতে না পারলেই সংশয় আর জিজ্ঞাসার প্রশ্নগুলো উদ্ভিত হয়। সুতরাং, কেরিনির্ল হাকিম এবং হাদিস গ্রন্থসমূহের মাঝে বিন্দুমাত্র বিরোধ নাই, থাকে না, এবং থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

৫৭. লাহম (তাহাদের জন্য) ফিহা (উহার মধ্যে) ফাকিহাতুন (ফলমূল, রসিক, যিনি মজা করিয়া ও খামিয়া-খামিয়া কথাবার্তা বলেন, খুব হাস্যোজ্জ্বল, কৌতুকপ্রিয়) ওয়া (এবং, আর, ও) লাহম (তাহাদের জন্য) মা (যাহা, যে, না, কি, নহে, যতক্ষণ পর্যন্ত, যদি, নাই, কত, কোন) ইয়াদদাউনা (তাহারা চাইবে, তাহারা আকাঙ্ক্ষা করিবে)।

প্ট তাহাদের জন্য উহার মধ্যে ফলমূল (রহিয়াছে) এবং তাহাদের জন্য যাহা তাহারা চাইবে।

৫৮. সালামুন (শান্তি, নিরাপত্তা, নিরাপদ) কাওলান (কথা, বাক্যলাপ, শব্দ, হকুম, বাণী, আটারেস, রিমার্ক, ওয়ার্ড, প্রনাইসমেন্ট, ডিকটাম) মির (হইতে, থেকে, চেয়ে, মধ্য হইতে, অন্তর্গত, অন্তর্ভুক্ত, অপেক্ষা, দ্বারা, যাবৎ, এর, মধ্যস্থিত, অব, পাট অব, বিলংগিং ট, ফ্রম এমাং) রাববি (রবের, প্রতিপালকের, সদাপ্রভুর) রহিম (রহিম [রহিম এবং রহমান দুটি শব্দের অর্থই হলো দয়াময়। তবে রহমান তথা দয়াময় শব্দটির দ্বারা সর্বসাধারণের প্রতি দয়াময় বোঝায়, কিন্তু খান্নাস হতে মুক্তিলাভের ক্ষমাপ্রাপ্তদের জন্য রহিম-রূপী দয়াময় তথা বিশেষ রূপে দয়াময়])।

প্ট শান্তি - রহিমরূপী রব হইতে কথা।

৫৯. ওয়া (এবং, আর, ও) ইমতাজুল (তোমরা পৃথক হইয়া যাও, তোমরা আলাদা হইয়া যাও, তোমরা চিহ্নিত হইয়া যাও, তোমরা দূর হইয়া যাও) ইয়াওমা (আজ) আইউহা (ওহে, হে) মুজরিমুন (অপরাধীরা, গুনাগারেরা, পাপীরা, দোষীরা)।

প্ট এবং আজ তোমরা আলাদা হইয়া যাও, হে অপরাধীরা।

৬০. আলাম (দেই নাই কি) আহাদ (ওয়াদা, তাগিদ, প্রতিশ্রুতি) ইলাইকুম (তোমাদের দিকে, তোমাদের প্রতি, তোমাদের নিকটে) ইয়াবানি (হে সন্তানেরা) আদামা (আদমের) আন (যে, এই যে) লা (না) তাবুদু (তোমরা

এবাদত করো, তোমরা উপাসনা করো, তোমরা দাসত্ব করো) শাইতানা (শয়তানের)।

প্ট তোমাদের দিকে দেই নাই কি তাগিদ, হে আদমের সন্তানেরা যে তোমরা দাসত্ব করিও না শয়তানের? [শয়তান জিনজাতি হতে আগমন করেছে। পূর্বে শয়তানের নাম ছিল আজাজিল। যেহেতু শয়তান জিনজাতি হতে আগমন করেছে সেই হেতু শয়তানকে গালমন্দ করা যায় অথবা আরও কিছু বলা যায়। কিন্তু সমগ্র জিনজাতিকে গালি দেওয়া যায় না। কারণ, জিনদের মাঝেও আল্লাহর অনেক গুণি আছেন, আবার মন্দও আছে। ভালো-মন্দ মিশিয়ে যেমন আদম-জাতি তথা মনুষ্যজাতি, সে-রকম ভালো-মন্দ মিলেই জিনজাতি। সুতরাং, পাইকারিভাবে সমগ্র জিনজাতিকে দোষারোপ করাটা মোটেই সঠিক বলে মনে করতে চাই না। কারণ, আবু লাহাব আবু জাহেল-এর মতো মানুষের কারণে সমগ্র মানবজাতিকে দোষারোপ করাটা মোটেই সঠিক বলে মনে করতে চাই না।]

+ ইব্রাহীম (নিশ্চয়ই সে [শয়তান]) লাকুম (তোমাদের জন্য) আদুউন্ (শত্রু, দুশমন, বৈরী, বিপক্ষ, এনিমি) মুবিন্ (প্রকাশ্য, খোলাখুলি, দৃশ্যমান)।

প্ট নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

১ ব্যাখ্যা : সাতান্ন নব্বুর আয়াত হতে ষাট নব্বুর আয়াত পর্যন্ত চারটিতে একই কথা, একই দর্শন ভিন্ন-ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, জান্নাতের অধিবাসীরা জান্নাতের সব রকম ফলমূল হতে শুরু করে যেটাই চাইবে সেটাই পাবে। জানি না এই ফল কথাটি রূপক করে বলা হয়েছে কি না। উহা কি কেবলই ভুক্তযোগ্য ফল, নাকি জান্নাতবাসীদের কর্মফল উহা অধম লিখকের জানা নাই। জান্নাতের ফলগুলো কি কেবল আশুর-বেদনা, খেজুর-খোরমা, আপেল-কমলালেবু, নাকি দৃশ্যমান দুনিয়াতে যত রকম ফল আছে সবই, নাকি আরও অনেক রকম ফল যা দুনিয়ার মানুষ দেখে নাই? তবে জান্নাতে পরিচিত এবং অপরিচিত সব রকম ফলই আছে এবং চাইবার সাথে-সাথে উহা পাওয়া যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পরের আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে, সালাম তথা শান্তি। খেয়াল করুন, এই শান্তি দয়াল রহমান হতে আসার কথাটি বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে, দয়াল রহিমরূপী রব হতে তথা প্রতিপালক হতে আসবে। কারণ, শান্তির প্রশ্নে মানুষ কি এই দুনিয়াতে সত্যিই শান্তিতে বাস করছে? আমরা তো দেখতে পাই, দুনিয়া একটি অশান্তির স্থান।

চাওয়া-পাওয়া, লোভ-লালসা, হিংসা-প্রতিহিংসা, আত্মমর্যাদার লড়াই ইত্যাদি প্রতিনিয়ত বিরাজ করছে। তা হলে দুনিয়ার জীবনে শান্তির অবস্থানটি কোথায়? প্রকৃতপক্ষে, আপন নফসের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে থাকা খান্নাসের মোহ-মায়ার বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করাটাই হলো শান্তি। এই মোহ-মায়ার বন্ধন হতে মুক্ত হতে চাইলে ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদাটি অবশ্যস্বাভাবিক। কারণ, মহানবি হেরাওহায় যে-পনেরটি বছর ধ্যানসাধনাটি করেছেন উহা মোটেও মহানবির নিজের জন্য নয়, বরং তাঁর উম্মতদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য যে, আসল

শান্তিটি তথা প্রকৃত শান্তিটি তখনই পাওয়া যাবে, যখন আপন নফসটি খান্নাসের বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করতে পারবে। ধ্যানসাধনা মুক্তিলাভ করার কেবলমাত্র পরিবেশটি তৈরি করতে পারে এবং এ-রকম পরিবেশে অবস্থানের যোগ্যতাটি প্রতিপালকরূপী আল্লাহ যখন গ্রহণ করে নেন তখনই রহিম-রূপ ধারণ করে সাধককে খান্নাসমুক্ত করে দেন। সুতরাং, খান্নাসমুক্ত জীবনই হলো প্রকৃত শান্তির জীবন এবং এই প্রকৃত শান্তিটি আল্লাহ রহমান-রূপে দান না করে রহিম-রূপে দান করেন। তাই কোরান-এর কোথাও বলা হয় নি গফুর রহমান, বরং বলা হয়েছে গফুর রহিম। দুনিয়ার জীবনে আরাম বলে কিছু

আছে কি না উহা পাঠকের হাতেই তুলে দিলাম। কেননা দুনিয়ার জীবনে শান্তি বলে কিছু আছে কি না অধম লিখকের জ্ঞান নাই।

তারপরেই বলা হয়েছে, যারা অপরাধ করেছে তাদেরকে আলাদা হয়ে যাবার তিরস্কার করেছেন। এই তিরস্কারটি ধর্মক আর উম্মার তিরস্কার নয়, বরং আফসোস এবং আক্ষেপের তিরস্কার। খেয়াল করুন, এখানে অপরাধীদেরকে তথা পাপীদেরকে মানুষরূপে ডাকা হয় নাই, বরং ডাকা হয়েছে আদম সন্তানরূপে তথা ভালোবাসায় মিশ্রিত দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, তোমরা আদম

সন্তান হয়েও কেমন করে অপরাধী হলে? আদি পিতা আদমের অনুশোচনাটি কি তোমাদের মনে ছিল না? শয়তান যে আদি পিতা আদমকে মর্যাদার আসন হতে নামিয়ে দিয়েছিল সেটা কেমন করে ভুলে গেলে? তোমরা কি জানো না যে, তোমাদেরকেও শয়তান খান্নাসরূপ ধারণ করে তোমাদের মাঝে অবস্থান করে তোমাদেরকেই প্রতারণা করবে - এই কথাটুকু কি একবারও মনে করে সাবধান হতে পারো নাই? তোমরা কি জানতে না যে, শয়তানই হলো তোমাদের একমাত্র এবং প্রকাশ্য শত্রু?

৬১. ওয়া (এবং, আর,ও) আনি (যে) বুদুনি (তোমরা আমারই এবাদত কর, তোমরা আমারই দাসত্ব কর)।

প্ট এবং যে তোমরা আমারই এবাদত করো (দাসত্ব করো)।

+ হাজ্জা (ইহা, এই, এইজন, এইটি) সিরাতুম্ (পথ, রাস্তা, পন্থা, সড়ক, মার্গ, সরণি) মুস্তাকিম্ (সঠিক, নির্ভুল, যথার্থ)।

প্ট এইটাই নির্ভুল (সঠিক) পথ।

৬২. ওয়া (এবং, আর, ও) লাকাদু (নিশ্চয়ই, নিঃসন্দেহে, অবশ্যই) আদাল্লা (সে বিপথগামী করে, সে পথভ্রষ্ট করে, সে গোমরাহ করে) মিন্কুম্ (তোমাদের মধ্য হইতে) জিবিল্লান্ (বিরাট দল, স্বভাব, প্রকৃতি, সৃষ্টি, বীড় জামাত) কাসিরান্ (অনেক, বহু)।

প্ট এবং নিশ্চয়ই সে তোমাদের মধ্য হইতে অনেক দলকে বিপথগামী করে।

+ আফালাম্ (তবুও কি না) তাকুনু (তোমরা হও, তোমরা হইতেছ, তোমরা হইবে) তাকিলুন (তোমরা বোঝ, তোমরা বুঝিবে, তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিবে, তোমাদের বিবেক আছে)।

প্ট তবুও কি তোমরা বোঝ নাই?

৬৩. হাজ্জিহি (ইহাই, ইহা, এই সেই, দিস ওয়ান, দিস) জাহান্নামু (জাহান্নাম, দোজখ, নরক) আল্লাতি (যে, যাহা, যাহাকে, যিনি, যা, যাহার, যার, যাকে) কুনতুম্ (তোমরা, তোমাদের) তুআদুন (ওয়াদা দেওয়া হয়, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, অঙ্গীকার করা হয়, কথা দেওয়া হয়, প্রতিজ্ঞা করা হয়)।

প্ট এই সেই জাহান্নাম যাহার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হইয়াছিল।

৬৪. ইস্লাওহাল্ (উহাতে প্রবেশ করো, উহার ভিতরে যাও, তোমরা তাহাতে প্রবেশ করো) ইয়াওমা (দিন, আজ, সময়, যেদিন, ডোর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়) বিম্মা (যাহা, ওই বস্তু হইতে, কিসের সাথে, কিসের সঙ্গে?) কুনতুম্ (তোমরা, তোমাদের) তাকফরুন (তোমরা কুফরি করো, তোমরা কুফরি করিবে, তোমরা অবিশ্বাস করিয়াছিলে, তোমরা অস্বীকার করিয়াছিলে)।

প্ট আজ উহাতে প্রবেশ করো যাহাকে তোমরা অস্বীকার করিয়াছিলে।

১ ব্যাখ্যা : একষটি নম্বর আয়াত হতে চোষটি নম্বর আয়াতের সামান্য ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে বলছি যে, মানুষকে শয়তানের পথ হতে ফিরে আসার জন্য আল্লাহ বলছেন যে, হে মানুষ, তুমি আমার এবাদত করো তথা দাসত্ব করো। কারণ, আল্লাহর এবাদত তথা দাসত্ব করাটাই হলো সঠিক পথ তথা সিরাতুম্ মুস্তাকিম্। এই সঠিক পথটি কেমন করে পাওয়া যায়, চেনা যায়, জানা যায়

উহাই প্রথমে যাচাই-বাছাই করে নিতে হয়। এই যাচাই-বাছাইকে গবেষণা করাও বলা হয়। তাই সর্বপ্রথমে সঠিক পথটি জেনে নিতে না পারলে উল্টাপাল্টা এবাদত-বন্ধেগি করাটা সঠিক হয় না। সর্বপ্রথমে সঠিক পথটি চিনে নিতে যত সময়েরই প্রয়োজন হোক না কেন এবং কাঁধের উপর যে-কোনো ধর্মের অথবা যে-কোনো ফেরকাবাজির সাইনবোর্ডই ঝুলতে থাক না কেন, উহা ফেলে দিতে হয়। তারপর যখন সঠিক পথটির সন্ধান পাওয়া যাবে কামিয়াব হবার জন্য তথা আল্লাহর মহাসত্যের মাঝে নিজেকে তথা নফসটিকে ডুবিয়ে দিতে হবে। ইহাই মান আরাফা নাফসাহ ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ – তথা, যে তার নফসটিকে চিনতে পেরেছে সে তার আপন বুকে চিনে ফেলেছে। আপন নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসরূপী শয়তান সঠিক পথ হতে মোহ-মায়ার কুমন্ত্রণা দিয়ে সরিয়ে রাখে এবং খান্নাসের দেওয়া মোহ-মায়ার কুমন্ত্রণার খপ্পরে পড়ে বেশিরভাগ মানুষই বিপথগামী হয় এবং হয়েছে। তাই আল্লাহ বলছেন এই বলে যে, এর পরেও কি তোমরা বুঝতে পারো না? তাই কোরান-এর আয়াতের মানদণ্ডে দেখতে পাচ্ছি যে অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামের দিকে ধাবিত হয় এবং হচ্ছে। যারা খান্নাসরূপী শয়তানের পায়েরি কুরে তথা যারা তাকে অনুসরণ করে তাদের জন্য তো জাহান্নামে যাবার ওয়াদাটি আগেই করে রাখা হয়েছে। সুতরাং, যারা তোমাদের মধ্যে কুফরি করে তথা অস্বীকার করে তথা অবিশ্বাস করে তাদের পরিণামের ঠিকানাটি হলো জাহান্নাম। সুতরাং, পরিশেষে একটি কথাই বোঝা গেল যে, খান্নাসরূপী শয়তানের মোহ-মায়ার কুমন্ত্রণা পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র আল্লাহর এবাদত তথা দাসত্বটি বরণ করে নিতে পারলেই জাহান্নামের জজ্ঞাল হতে মুক্তিলাভ করা যায়। আনুষ্ঠানিক এবাদত-বন্ধেগির প্রয়োজন আছে, কিন্তু দায়েমি সালাতের মাধ্যমে তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে বিরাট ধৈর্যধারণ করে একাগ্রমনে আল্লাহর পথে অগ্রসর হতে পারলে আল্লাহ রহিম-রূপ ধারণ করে উদ্ধার করে নেন। ইহাই আল্লাহর স্বতঃসিদ্ধ বাণী। এই স্বতঃসিদ্ধ বাণীটির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যাটি হলো কোরান এবং হাদিসের বাণীগুলো। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির। সুতরাং, চরম পর্যায়ে কোনো গালি থাকে না। চরম পর্যায়ে যে গালি থাকে না এই কথাটিও অনেক দিনের ধ্যানসাধনা, জ্ঞান-গবেষণার পর বোঝা যায়।

৬৫. আলইয়াওমা (আজ, এই কালে, এই সময়ে, সেই দিন, দ্যাট ডে, টডে) নাখতিম্ব (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] মোহর মারিয়া দিব, আমরা খুতম করিয়া দিব, সিল দিয়া দিব, আমরা শেষ করিয়া দিব, ট সিল, ট স্ট্যাম্প, ট সিল অফ, ক্রোজ, কনকুড, টারমিনেট, ফিনিশ, কমপ্লিট) আলী (উপরে, উর্ধে, প্রতি, দিকে, অভিমুখে, বিষয়ে, সম্পর্কে, যুক্ত হইয়া, ভিত্তি করিয়া, অধিক, অধিকন্তু, উর্দে, অন, আপঅন, ওভার, এবাভ) আফওয়াহিহিম (তাহাদের মুখগুলির উপর) ওয়া (এবং, আর, ও) তকাল্লিম্বনা (আমাদের সাথে কথা বলিবে) আইদিহিম্ব (তাহাদের হাতগুলি) ওয়া (এবং, ও, আর) তাশুহাদু (সাক্ষ্য দিবে) আরজুলহম্ব (তাহাদের পাগুলি) বিম্বা (সেই বিষয়ে, ওই বিষয়ে, যাহা, ওই বস্তু হইতে, কিসের সঙ্গে, কিসের সাথে) কানু (ছিল, আছে, হয়) ইয়াকসিবুন (তাহারা অর্জন করিয়াছে বা করে, তাহারা কামাই করিয়াছে বা করে বা করিবে, তাহারা উপার্জন করিয়াছে বা করে)।

প্ট আজ আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাদের মুখগুলির উপর মোহর মারিয়া দিব এবং তাহাদের হাতগুলি আমাদের সাথে কথা বলিবে এবং তাহাদের পাগুলি সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে (যাহা) তাহারা অর্জন করিয়াছিল।

১ ব্যাখ্যা : যারা কুফরি করেছে তথা অস্বীকার করেছে সেই রকম পাপীদের হাত-পাগুলো তাদের কাজ-কাম এবং চাল-চলনের সব রকম গতিবিধির সাক্ষ্য দেবে। অবশ্য কোরান-এর অন্যত্র মুখও যে সাক্ষ্য দেবে উহাও

বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে মুখের সাক্ষ্যটি দেবার কথা বলা হয় নাই। যারা কুফরি করেছে তাদের কুফরি জাতীয় পাপের জঘন্য রূপগুলো দেখে নিজের পক্ষ হতে সমর্থনের কোনো প্রকার অজুহাত দাড় করাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে হতভম্ব হয়ে পড়বে। তখন হতবাক হয়ে আপন কৃতকর্মের দহনে নিজেই জ্বলতে থাকবে। কারণ, তাদের হাত-পা তাদের আকাম্ম-কুকাম্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। কারণ, মানবদেহটি মুসলমান, কিন্তু খান্নাসম্মিশ্রিত অস্ত্রটি তথা মনটি মুসলমান নয়। দুনিয়ার আদালতেও মুখের কথার সাক্ষ্য ছাড়াও অনেক রকম আলামতের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সে-রকম মনে হয় হাত-পাগুলো আলামত রূপ ধারণ করে আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দেবে। আমরা সাক্ষ্য বলতে মুখের কথাগুলোকেই মনে করে থাকি, কিন্তু আলামতগুলোও যে সাক্ষ্য দেবার জন্যে যথেষ্ট হয়ে দাঁড়ায় সেই কথাটি এখানে বলা হয়েছে বলে মনে করতে চাই।

৬৬. ওয়া (এবং, আর, ও) লাও (যদি, হয়, কী ভালোই না হইত) নাশাউ (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] ইচ্ছা করি, আমরা চাই) লাতাম্মাসুনা (অবশ্যই আমরা মুছিয়া দিয়াছি, অবশ্যই আমরা আলোহীন করিয়া দিয়াছি, অবশ্যই আমরা নিভাইয়া দিতে পারি, অবশ্যই আমরা চক্রগুলি বিনাশ করিয়া দিতাম, আমরা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতাম, মিটাইয়া দিতাম) আলা (উপরে, উর্ধ্বে, প্রতি, দিকে, অভিমুখে, বিষয়ে, সম্পর্কে, যুক্ত হইয়া, ভিত্তি করিয়া, ততোধিক, অধিকতর, উচ্চে, অধিকতর উচ্চে, উর্ধ্বদিকে, অন, আপন, ওভার, এবাড) আইউনিহিম্ (তাহাদের চক্রসমূহ, তাহাদের দৃষ্টিশক্তি) ফাস্তাবাকু (সুতরাং তাহারা উদ্দেশ্যহীন ছোট্টাছুটি করিত, সুতরাং তাহারা সকলে দৌড়াইত) সিরাতা (পথ, রাস্তা, সড়ক, মার্গ, সরণি, ঠায়ে) ফাআননা (সুতরাং কীভাবে, সুতরাং কেমন করিয়া) ইউবসিরুন্ (তাহারা দেখিবে, তাহারা দেখিতে পাইত)।

প্ট এবং যদি আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] চাইতাম (তবে) অবশ্যই আমরা তাহাদের চক্রসমূহের উপর মুছিয়া দিতে পারিতাম, সুতরাং তাহারা পথে উদ্দেশ্যহীন ছোট্টাছুটি করিত, সুতরাং কেমন করিয়া তাহারা দেখিতে পাইত?

৬৭. ওয়া (এবং, আর, ও) লাও (যদি, হয়, কী ভালোই না হইত) নাশাউ (আমরা ইচ্ছা করি, আমরা চাই) লাম্মাসখনাহম্ (আমরা তাহাদের চেহারা বা আকৃতি বিকৃত করিয়া দিয়াছি, আকৃতি পরিবর্তন করিয়া দিতাম; আদত, অভ্যাস বা আকৃতির পরিবর্তন করিয়া দেওয়া) আলা (উপরে, উর্ধ্বে, প্রতি, দিকে, অভিমুখে, বিষয়ে, সম্পর্কে, যুক্ত হইয়া, ভিত্তি করিয়া, ততোধিক, অধিকতর, উচ্চে, অধিকতর উচ্চে, উর্ধ্বদিকে, অন, আপ অন, ওভার, এবাড) মাকানাতিহিম্ (তাহাদের জায়গা, তাহাদের অবস্থান) ফাম্মা (সুতরাং না) ইস্তাতাত (তাহারা সামর্থ্যবান হইয়াছে, তাহারা সমর্থ হইবে, তাহারা করিতে পারিয়াছে, সক্ষম হইয়াছে, উপযুক্ত হইয়াছে, যোগ্য হইয়াছে, কর্মক্ষম হইয়াছে) মুদিয়ান্ (আগে যাইতে, অগ্রবর্তী হইতে, গত হইয়া যাওয়া, চলিয়া যাওয়া) ওয়া (এবং, আর, ও) লা (না) ইয়ারজিউন্ (প্রত্যাবর্তন করা, ফিরিবে, পিছনে ফেরা)।

প্ট এবং যদি আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] চাইতাম তাহাদের আকৃতি বিকৃত করিয়া দিতাম তাহাদের অবস্থানের উপর, সুতরাং তাহারা আগে যাইতে পারিত না এবং পিছনে ফিরিত না।

১ ব্যাখ্যা : আল্লাহরই বিশেষ দান হলো মানুষের এই স্বভাব তথা বৃত্তি তথা প্রবণতাগুলি। মানুষের এই স্বভাবের উপর আল্লাহ সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দান করেছেন। তাই এই স্বভাবের উপর স্বাধীনতা দেবার পর হস্তক্ষেপ করেন না। সুতরাং, এই স্বভাব ভালোও করতে পারে, আবার মন্দও করতে পারে -

যদিও সকল কার্যকারণের মূল হোতা হলেন আল্লাহ। মহৎ আমল তথা সং আমল করে আল্লাহর ওলি হবার জন্যই এই বৃত্তিসমূহ দান করেছেন। এই সং আমলসমূহের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আপন স্বভাবের মাঝেই লুকিয়ে থাকা খান্নাসরূপী শয়তানের বহুবিধ কুমন্ত্রণা। মুখের কথায় খান্নাসের কুমন্ত্রণা হতে মুক্তি চাই বললেই মুক্তি পাওয়া যায় না, বরং নিজের স্বভাব-চরিত্র পুতঃপবিত্র করার তরে সদাসর্বদা সজাগ থাকতে হয়। মানুষ যদি খান্নাসের কুমন্ত্রণায় খারাপ পথে যায় তা হলে এই স্বাধীনতার উপর আল্লাহ সহজে হাত বাড়ান না। যদি আল্লাহ জোর করে খারাপ রাস্তা হতে বিরত করতে চান তা হলে তারই দেওয়া স্বভাবের স্বাধীনতাটুকু ফেরত নিয়ে নিতে হয় এবং যদি আল্লাহ ফেরতই নিয়ে যেতেন তা হলে কুপথ আর সুপথ বলে কোনো কথাই থাকে না। ফেরেশতাদের এ-রকম ভালো-মন্দ করার বৃত্তিসমূহ দান করা হয় নাই। সুতরাং, কুপথ আর সুপথের প্রশ্নটি ফেরেশতাদের বেলায় খাটে না।

আকৃতি বিকৃত করে দেওয়ার অর্থটি হলো একটি নফসের মনোবাঞ্ছাগুলো নিম্নমানের করে দেওয়া। এই ভালো-মন্দ করার ইচ্ছাশক্তিটি কেবলমাত্র জিন এবং মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। তাই জিন এবং মানুষেরই আল্লাহর ওলি হওয়ার যোগ্যতাটি অর্জন করার সুযোগটি রাখা হয়েছে। এক জীবনে এগিয়ে গিয়ে কামিয়াব হওয়ার সৌভাগ্য নী হলেও বারবার এই দুনিয়ার জীবনে ফিরে আসতে পারবে এবং ভালো আমলের দ্বারা আল্লাহর দিকে অগ্রসর হতে পারবে। এটাই মানুষের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ। সুতরাং, ফিরে আসবার সুযোগ দানের বিষয়টিও আল্লাহরই দেওয়া একটি বিশেষ রহমত। 'ইয়ারজিউন' শব্দটির অর্থ হলো ফিরে আসা। মৃত্যুর পরে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা।

খান্নাসের দেওয়া লোভ-মোহ-মায়ার বন্ধনগুলো এক জনমে ছিন্ন করতে না পারলেও কয়েক জনমে যখন মোহের বন্ধনগুলো হতে ছিন্ন করে মুক্ত হতে পারবে সে-দিনই মুক্তিলাভ করে আল্লাহর ওলিতে পরিণত হবে।

৬৮. ওয়া (এবং, আর, ও) মান (যে, কেউ, কাহারও) লুআম্মিরহ (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহার বয়স বাড়াইয়া দেই, আমরা তাহাকে দীর্ঘজীবন দান করি, আমরা তাহাকে দীর্ঘজীবী করি, আমরা তাহাকে লম্বা আয়ু দেই) নুনাক্কিসহ (আমরা উল্টা করিয়া দিয়া থাকি তাহাকে, আমরা তাহার অবনতি ঘটাই, আমাকে তাহাকে বার্ষক্যে উপনীত করি, আমরা তাহাকে স্থবির করিয়া দেই, আমরা প্রকৃতিগতভাবে তাহার অবনতি ঘটাই, আমরা তাহার স্বাভাবিক গঠনের অবনতি ঘটাই, বাতিল করিয়া দেওয়া, বিপরীতমুখী করা, টার্ন আপসাইড ডাউন, ডু এনিথিং ইন রিভার্স অর্ডার) ফিল (মধ্যে, মাঝে, তে, এ, অভ্যন্তরে, ভিতরে, বিষয়ে, সম্বন্ধে, কালে, সময়ে, ইহাতে, অভিমুখে, প্রতি, ইন, উইদিন, অ্যামাং, নেয়ার) খাল্কি (সৃষ্টি, রচনা, নিৰ্মাণ, উদ্ভব)।

প্ট এবং যাহাকে আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] বয়স বাড়াইয়া দেই তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে বার্ষক্যে উপনীত করি।

+ আফালা (তবুও কি, না) ইয়াকিলুন (তাহারা বুদ্ধি খাটায়, তাহারা জ্ঞান প্রয়োগ করে, তাহারা কৌশল খাটায়, তাহারা বুঝিতে পারে, মনের যে-বৃত্তির দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহারা তাহাকে ব্যবহার করে)।

প্ট তবুও কি তাহারা বুদ্ধি খাটাইবে না?

৬৯. ওয়া (এবং, আর, ও) মা (না) আললামনাহ (আমরা শিখাইয়াছি তাহাকে) শিরা (কবিতা) ওয়া (এবং) মা (না) ইয়াম্বাগী (উচ্চিৎ হইবে, ঠিক হইবে, শোভনীয়, উপযুক্ত, যথাযথ) লাহ (তাহার জন্য)।

প্ট এবং আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাকে কবিতা শিখাই নাই এবং তাহার জন্য (তাহা) শোভনীয় নহে।

+ ইন্ (অবশ্যই, নিশ্চয়ই, যদি, যদি না, না, নহে) হওয়া (সে, তিনি, ইহা, উহা, তাহা) ইল্লা (একমাত্র, কিছু, ব্যতীত, বাদে, ছাড়া, তবে, যদি না,

আনলেস, একসেন্ট, ওনলি, বাট, নট আনটিল) জিকরুন (জিকির, সংযোগ. যোগাযোগ, স্বরণ, উপদেশ, বয়ান, আলোচনা, রিকালেকশন, রিমেমব্রান্স, মেমরি) ওয়া (এবং, আর, ও) কুরআনুম (কোরান), মুবিন (স্পষ্ট, সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য, খোলাখুলি, প্রকাশিত, কিছু গোপন নাই এমন)।

প্ট নিশ্চয়ই উহা একমাত্র জিকির এবং স্পষ্ট কোরান।

৭০. লিইউনজিরা (সাবধান করিবার জন্য, সতর্ক করার জন্য, ভয় দেখাইবার জন্য) মান (যে) কানা (হয়) হাইয়ান (জীবিত) ওয়া (এবং, আর, ও) ইয়াহিককাল (সত্য হওয়ার জন্য, প্রমাণিত হওয়ার জন্য) কাওলু (কথা, বাণী, বাক্য) আলাল (উপর) কাফেরিন (কাফেরদের)।

প্ট যে (ব্যক্তি) জীবিত তাকে সাবধান করিবার জন্য এবং কাফেরদের উপর (সেই) কথা সত্য হইবার জন্য।

১ ব্যাখ্যা : এখানে, আটমটি নম্বর আয়াতে বর্ণিত সৃষ্টির মাঝে যাদের বয়সটি বাড়িয়ে দেওয়া হয় তারা তো বার্ষিক্যে উপনীত হবেই - ইহা তো কল্পবেশি সবারই জ্ঞানা থাকার কথা। কিন্তু বলা হলো বুদ্ধি খাটাবার কথাটি। এখানে কীসের এবং কেমন বুদ্ধি খাটাবার কথাটি বলা হলো? ধ্যানসাধনার মাধ্যমে তথা দায়েমি সালাতে অবস্থান নিয়ে খান্নাসমুজ্জ হতে জ্ঞানময় জিন্দেগি কেমন করে লাভ করা যেতে পারে সেই কথাটি এখানে বলা হয়েছে। নাসেক অর্থটি হলো উল্টিয়ে দেওয়া অথবা বিপরীতমুখী করা অথবা বাতিল করে দেওয়া। আপন নফস হতে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে উল্টিয়ে দেবার প্রচেষ্টায় রত থাকলে আল্লাহর রহিম-রূপী ক্বমার দ্বারা নফসটিকে বাতিল করে দেওয়া হয় তথা বিপরীতমুখী করে দেওয়া হয়। আপন নফসটি তখন আর আপন প্রবৃত্তির ইচ্ছামতো আপন খেয়াল-খুশির দিকে পরিচালিত হয় না। তখন নফসটিকে রব-রূপী আল্লাহর দেওয়া এলহামের প্রত্যক্ষ সংযোগটি দান করা হয়ে থাকে। এখানে একটু লক্ষ করার বিষয় হলো, যারা ধ্যানসাধনার শিক্ষায় রত থাকেন কেবল তাদেরকেই আধ্যাত্মিক জীবনের দীর্ঘায় দান করা হয়। এই মহা অনুগ্রহটি সবাই বুঝতে পারে না। তাই এই মহা অনুগ্রহটি বুঝবার জন্য মানুষকে বলা হয়েছে এই বলে যে, বুদ্ধি খাটানোটি কি উচিত নহে?

তারপরের দুটো আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, তার হাবিবকে তথা মহানবিকে কবিতা শেখানো হয় নি, বরং আল্লাহর জাত-নুর হতে নুরি কোরান দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ তথা সংযোগ রেখেই এই নুরি কোরান দেওয়া হয়েছে। আসলে নুর, কিছু ভাষার শব্দাকারে লিখিত আকারে যে-কোরান আমরা পাই উহাও কোরান, তবে একটি নুরের কোরান অপরটি ভাষায় লিখিত কোরান। নুরি কোরান-কে পবিত্র না হয়ে কারও পক্ষে স্পর্শ করারও ক্ষমতা নাই। কারণ, খান্নাসমুজ্জ হতে না পারলে নুরি কোরান-এর রহস্যটি রহস্যই থেকে যায়।

নফসের সঙ্গে খান্নাসটিকে রেখেই কবিতা রচনা করা যায়। এই কথাটি যে-কেউ বুঝতে পারে। কবিতার মাঝে ভালো-মন্দ থাকতে পারে, এবং ইহাই একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু মহানবিকে যে-বিশেষ রহস্যটি দেওয়া হয়েছে উহা হলো নুরি কোরান এবং এই নুরি কোরান-এর রহস্য খান্নাসমুজ্জ হতে না পারলে বুঝবার কোনো উপায় থাকে না। যদিও কোরান সার্বজনীন, কিছু ইহার রহস্য বুঝতে হলে প্রথমে আমানু হতে হবে তথা ইমানদার হতে হবে। এই আমানু হতে হলে ধ্যানসাধনাটি প্রয়োজন। কারণ, মহানবির কাছে যে নুরি কোরান-টির আগমন হয়েছিল উহা জাবালুন নুর পর্বতের নির্জন অন্ধকার হেরাণ্ডহাতেই হয়েছিল। সুতরাং, যারা কোরান-এর রহস্য সামান্য কিছুটা বুঝবার ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষাটি রাখে তাদেরকে অবশ্যই কিছু দিনের জন্য নির্জনে ধ্যানসাধনাটি করা অত্যাৱশ্যক। নামাজ তথা সালাত হলো বেহেশতের চাবি - এই বলে

বাক্যটি তথা হাদিসটি শেষ করে দেওয়া হয় নি, বরং তারপরেই বলা হয়েছে নামাজের চাবিটি হলো তাহারত তথা পবিত্রতা। তা হলে অনায়াসে বলা যায় যে নামাজের চাবিটি হলে পবিত্রতা তথা তাহারত এবং তাহারতের নামাজই হলো বেহেশতের চাবি। একটির সঙ্গে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনেকটা, এটা হলে ওটা হবে এবং ওটা হলেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। নুরি কোরান পাঠ করা তো দূরে থাক, বরং স্পর্শ করার ক্ষমতটুকুও কানেক্টে দেওয়া হয় নাই। লা ইয়াম্মাস্সাহ ইল্লাল মুত্তাহারুন - তথা, কেহই স্পর্শ করতে পারে না একমাত্র পবিত্র ছাড়া। আবার, অন্যত্র বলা হয়েছে, দোজখে ওই ব্যক্তিটি প্রবেশ করবে না যার মধ্যে এক সরিষা পরিমাণ ইমান আছে এবং ওই মানুষটি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যার মধ্যে এক সরিষা পরিমাণ অহংকার আছে। সুতরাং, ইমান এবং অহংকার যদিও দুটোই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, কিন্তু এখানে দুটোকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে বোঝানো হয়েছে।

৭১. আও (অথবা, ইচ্ছামাফিক, বা, কিংবা, নতুবা, যদি না, যদিও, কি, যতক্ষণ না, অর, আনলেস, হোয়েদার) লাম্ (নহে, নী, নাই, নি, নট) ইয়ারাও (তাহারা দেখে) আননা (অবশ্যই আমরা, নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে]) খালাকনা (আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, আমরা বানাইয়াছি) লাহম্ (তাহাদের জন্য) মিম্মা (যাহা, যাহা হইতে, কী হইতে, কীসের) আমিলাত্ (বানাইল, তৈরি করিল, কাজ করিল, করিল, আমল করিল) আইদিনা (আমাদের হাতগুলি) আনআমান্ (গৃহপালিত পশু) ফাহম্ (সুতরাং তাহারা) লাহা (উহার উপর, সেইগুলির, এইগুলির) মালিকুন (মালিক, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব, অধিকারী, স্বামী, প্রভু)।

স্ট তাহারা কি দেখে না যে আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের জন্য যাহা তৈরি করিয়াছি আমাদের হাতগুলি গৃহপালিত পশু, সুতরাং তাহারা উহার উপর মালিক (হইয়াছে)।

৭২. ওয়া (এবং, আর, ও) জাল্লাল্‌নাহা (আমরা উহাদিগকে অধীনস্থ করিয়া দিয়াছি, আমরা উহাদিগকে দুর্বল বা অসহায় করিয়া দিয়াছি, আমরা উহাদিগকে অনুগত করিয়া দিয়াছি, আমরা উহাদিগকে আয়ত্তাধীন করিয়াছি, আমরা উহাদিগকে বাধ্য করিয়া দিয়াছি, বশীভূত করিয়াছি) লাহম্ (তাহাদের জন্য) ফামিন্‌হা (সুতরাং সেইগুলির মধ্যে) রাকুবুহম্ (তাহাদের সওয়ার করা, তাহাদের আরোহণ করা, তাহাদের বাহন) ওয়া (এবং, আর, ও) মিন্‌হা (ওইগুলির মধ্য হইতে) ইয়াকুলুন (তাহারা আহার করে, তাহারা খাইয়া থাকে)।

স্ট আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাহাদের জন্য উহাদিগকে অনুগত করিয়া দিয়াছি, সুতরাং সেইগুলির মধ্যে তাহাদের বাহন এবং ওইগুলির মধ্য হইতে তাহারা খাইয়া থাকে।

৭৩. ওয়া (এবং, আর, ও) লাহম্ (তাহাদের জন্য) ফিহা (উহার মধ্যে) মানাফিউ (লাভ, ফায়দা, লাভসমূহ, উপকার, সুবিধা, মুনাফা, আর্থিক লাভ, আয়, সুযোগ, উপযোগিতা, ব্যবহার, প্রয়োগ, কার্যকারিতা, কল্যাণ, হিত, প্রফিট, ইউজ, বেনিফিট, গেইন, অ্যাডভান্টেজ) ওয়া (এবং, আর, ও) মাশারিবু (পান করা, পানীয়, পানযোগ্য, পেয়, পান করা হয় এমন, পান করার জায়গা, পানশালা, ঘাট, ঝরনা, কুয়া, গাভীর স্তন)।

স্ট এবং উহার মধ্যে তাহাদের জন্য (রহিয়াছে) উপকারিতা এবং পানীয়।

+ আফালা (সুতরাং কি না) ইয়াশকুরুন (তাহারা কৃতজ্ঞ হইবে, তাহারা শোকর করিবে, তাহারা উপকারীর উপকার স্বরণ রাখিবে ও স্বীকার করিবে)।

পঁ সুতরাং তাহারা কি কৃতজ্ঞ হইবে না?

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াত তিনটিতে বৈষয়িক বিষয়সমূহের উপর আল্লাহর যে-অনুগ্রহ দান করা হয়েছে উহা সবাই কমবেশি পরিষ্কার বুঝতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীর উপরে যে পুরস্কার ও শাস্তি দুটোই কার্যকর হতে চলছে সেই সূক্ষ্ম বিষয়গুলি সবাই বুঝতে পারে না। আল্লাহর এই বাণীসমূহের মাঝে এই কথাটুকুই মূল বিষয়রূপে তুলে ধরা হয়েছে। গৃহপালিত পশুগুলোর মানুষের পক্ষে সৃষ্টি করাটি অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আল্লাহর এই সৃজিত পশুগুলি হতে গোশত খাওয়া যায়, দুধ পান করা যায়, বোঝা বহন করানো যায়, ছাড়া-চামড়া দিয়ে অনেক রকম জিনিস তৈরি করা যায়। তাই যে-বিষয়টি সবাই বুঝতে পারে, জানতে পারে, সেই বিষয়টি তুলে ধরে আল্লাহ বলছেন, গৃহপালিত পশুসমূহ যে তাঁরই অফুরন্ত দান সেই পরিচয় পাবার পরও কি মানবজাতি আল্লাহর এই অফুরন্ত দানের প্রতি সামান্য কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করবে না? এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো আর তা হলো, গৃহপালিত পশুগুলোর আমানতদাররূপে বলা হয় নাই, বরং কোরান মালিক বলে ঘোষণা করেছে। অথচ আমরা জানি, সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। তারপরেও মানুষকে যে গৃহপালিত পশুগুলোর উপর মালিকানার কর্তৃত্বটি ঘোষণা করা হয়েছে উহা যে কত বড় এবং অফুরন্ত দান ইহাও অনেকেই বুঝেও না বোঝার ভান করে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ না করে সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রশ্নে মুখ ফিরিয়ে নেয়। গৃহপালিত পশুগুলোর যেমন নফস আছে তথা প্রাণ আছে সে-রকম অন্যান্য সকল জীবেরই নফস আছে, কিন্তু রুহ নাই। নফস আছে, কিন্তু প্রাণীকুলের নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটি নাই। তাই জগতের যত প্রকার প্রাণী আছে সবাই তোহিদে বাস করে এবং যারা তোহিদে বাস করে তাদের পক্ষে শেরেক করার প্রশ্নই ওঠে না। মানুষ এবং জিনের নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে এবং ইহাকেই বলে সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি দান করা। আবার জিন ও মানুষের সঙ্গে নফস আছে, সঙ্গে খান্নাস আছে – তাই নির্বাচন করার অধিকার আছে এবং সেই সঙ্গে আছেন আল্লাহ স্বয়ং রুহরূপ ধারণ করে। তাই কোরান বলছে যে, নাহনু আকরাবু ইলাইহি মিন হাবলিল ওয়ারিদ – তথা, আমরা তোমার জীবন-রগের নিকটেই অবস্থান করি।

যেহেতু আল্লাহ মানুষের জীবন-রগের অতি নিকটে অবস্থান করেন সেই হেতু মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। প্রতিটি ফেরেশতা একেকটি বহু গুণের ভাণ্ড বা পাত্র। অথচ সেই ফেরেশতাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বলে কোরান-এ একটিবারও ঘোষণা করা হয় নাই।

৭৪. ওয়া (এবং, আর, ও) ইত্তাখাজু (গ্রহণ করিয়াছে, ধরিয়া, লইবে, গ্রহণ করিবে, ধর, বানাও, বাছিয়া লওয়া, পছন্দ করা, বানানো, গঠন করা) মিনদুনিলাহি (আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহ ব্যতীত, আল্লাহ বাদে, আল্লাহ বিনা) আলিহাতান (অনেক ইলাহ, অনেক উপাস্য [এখানে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহরূপে মেনে নেবার পরও অন্যান্য সাময়িক শক্তিসমূহ এবং বিভ্র-বৈভবের দাসত্ব করাটাকেই বোঝানো হয়েছে তথা আলিহাতান রূপে তথা বহু ইলাহর কথাটি বলা হয়েছে]) লা আল্লাহম্ (যাহাতে তাহারা) ইউনসারুন (সাহায্য) পাইতে পারে, তাহারা সাহায্য করিবে, তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে)।

পঁ এবং আল্লাহ ছাড়া অনেক ইলাহ তাহারা গ্রহণ করে যাহাতে তাহারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়।

৭৫. লা (না) ইয়াসতাতিউনা (তাহারা সক্রম হইবে, তাহারা সমর্থ হইবে, তাহারা ক্রমতাবান, তাহারা ক্রমতা রাখে, তাহারা করিতে পারে) নাস্‌রাহ্ম (তাহাদের সাহায্যে করিতে)।

প্ট ইহারা তাহাদেরকে সাহায্য করিতে সক্রম হইবে না।

+ ওয়া (এবং, আর, ও) হম্ম (তাহারা) লাহম্ম (তাহাদের জন্য) জন্দুম্ম (সেনাবাহিনী, সৈন্যদল) মুহ্দারুন্ (হাজির, উপস্থিত, আনয়ন করা হইবে, আনীত হইবে)।

প্ট এবং তাহাদের জন্য ইহারা সেনাবাহিনী (রূপে) আনীত হইবে।

৭৬. ফালা (সুতরাং না) ইয়াহজুনকা (আপনাকে চিত্তাক্লিষ্ট করে, আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে, আপনাকে দুঃখ দেয়, আপনাকে পীড়া দেয়, কষ্ট দেয়, শোকগ্রস্ত করে, বিষাদ জাগায়, বিষন্ন করে, ক্ষুব্ধ করে) কাওলুহম্ম (তাহাদের কথা)।

প্ট সুতরাং তাহাদের কথা আপনাকে (যেন) দুঃখ না দেয়,

+ ইন্ননা (নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে]) নালাম্ম (আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] জানি, আমরা অবগত আছি, আমরা জ্ঞাত আছি) ম্মা (যাহা) ইউসিরুনা (তাহারা গোপন করে, তাহারা লুকাইয়া রাখে, তাহারা আড়াল করে তাহারা এড়াইয়া যায়, তাহারা আবৃত করে, তাহারা ঢাকিয়া রাখে) ওয়া (এবং) ম্মা (যাহা) ইউলিনুন্ (তাহারা প্রকাশ করে, তাহারা ব্যক্ত করে, তাহারা জাহির করে, তাহারা জানাইয়া দেয়)।

প্ট নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] জানি যাহা তাহারা গোপন করে এবং যাহা তাহারা প্রকাশ করে।

১ ব্যাখ্যা : এখানে বলা হয়েছে আল্লাহকে একমাত্র প্রণেতারূপে মুখে-মুখে মনে নিলেও ইমান ও আমলের মাঝে বৈষয়িক নানা রকম বিষয়গুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করে নেওয়ার অর্থটিই হলো মিন দুনিলাহি আলিহাতান। যদিও অনেকেই লিখে থাকেন : আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যসমূহ। জীবন বাঁচানোর প্রস্নে যে-সকল বৈষয়িক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হতে হয় সেগুলোর কিছু কোনো শক্তি থাকে না যে মানুষকে খান্নাসরূপী শয়তানের মোহ-মায়া হতে তথা জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ তথা নিষ্কৃতি পাবার জন্য সহায়কের ভূমিকা পালন করে। ইহাদের মাঝে নির্মিত যে-সকল গুণাবলি রয়েছে উহা সাময়িক এবং উহা আল্লাহরই দেওয়া বৈশিষ্ট্য অথবা ক্রমতা। এই নির্মিত ক্রমতাগুলো মানুষকে খান্নাসের মোহ-মায়ার বাঁধন হতে মুক্ত করতে পারে না। এই নির্মিত গুণ ও ক্রমতা আল্লাহরই দেওয়া সেফাতের ধারাবাহিকতা মনে না করে এগুলোকেই সৈন্যরূপে সহায়করূপে আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে চায়। তথা খান্নাসের কুমন্ত্রণার মোহ-মায়ায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে চায়। এই সমস্ত আলিহাতান আঁকড়িয়ে ধরে সুখের জীবনটি অতিবাহিত করতে চায়। সুতরাং, ওইগুলোই হয়ে যায় তাহার জন্য খান্নাসের দেওয়া মোহ-মায়ার সাময়িক ইলাহ তথা কর্তা তথা প্রভু। খান্নাসের মোহ-মায়ায় আল্লাহর কর্তৃত্বের সঙ্গে ইহাদেরকেও কর্তারূপে, প্রভুরূপে, নেতারূপে গ্রহণ করে নিয়ে ভুল করে ফেলে। এই জাতীয় মানুষদেরকে আঁকড়িয়ে বিশ্বাসী নয় বলা হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার জীবনে এই ইলাহসমূহের মোহ-মায়ার বন্ধনে তখন বিশ্বাসী হয়ে যায়। বিস্ত-বৈভব, বিষয়-সম্পত্তির এই দুনিয়ার জীবনে সব রকম উপকরণগুলোকে তার দেহরক্ষার সৈন্যবাহিনীর মতো মনে করে ফেলে। কারণ, সে বুঝতেই পারে না যে, খান্নাসের মোহ-মায়ার ফাঁদে পড়ে এই অপকর্মের মাঝে এগিয়ে চলেছে। তাই

বলা হয়েছে, এই সেনাবাহিনীসহ তাকে জাহান্নামের দিকে আনা হবে। মনের মাঝে সাময়িক মোহ-মায়ার যে-আকর্ষণ তাহা খান্নাস কর্তৃক দেওয়া হয়েছে। সেই মোহ-মায়ার সঙ্গেই তার হাশর হবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তখন কেহ কাহাকেও চিনে নিতে পারবে না। সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে মানুষের সেবাদাস-দাসী করেই বানানো হয়েছে। কিন্তু আক্ষেপ! বেশিরভাগ মানুষই আল্লাহকে একমাত্র ইলাহরূপে মেনে না নিয়ে এবং নির্ভরের সন্তুষ্টি প্রকাশ না করে ইহাদেরকেই ইলাহরূপে গ্রহণ করে থাকে। মুখে-মুখে আল্লাহকে সর্বময় ক্রমতাবান বলে মেনে নেবার পরও তাদের মন ও মানসিকতায় এ-ধরনের আচার-আচরণগুলো ফুটে ওঠে। তাদের এই অনুষ্ঠানধর্ম পালনের নানা রকম অনুষ্ঠানের বিষয়গুলো একদিন আক্ষেপের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, এরা আপন-আপন নফস হতে খান্নাসের মোহ-মায়ার কুমন্ত্রণা হতে একটুকুও সজাগ ও সাবধানতা অবলম্বন করে নাই। বাহিরের উপাসনাগুলোর মধ্যে খান্নাসের মোহ-মায়ার জড়িয়ে রেখে ধর্ম পালন করাটাও একটি বিভ্রান্তি বৈ আর কী বলা যায়? অবশ্য, বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, এই সংসারে খান্নাসের মোহ-মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে আমরা অধিকাংশই এই জাতীয় ধার্মিক। মুখে-মুখে তারা বারবার বলবে যে আমরা তো এক আল্লাহরই পূজা করছি : অথচ মনের চাওয়া-পাওয়াগুলো তো খান্নাসের দেওয়া কুমন্ত্রণার মোহ-মায়ায় ভরপুর করে রেখেছে। এই জাতীয় সামাজিক অবস্থার হালচাল দেখে নবি-রসুলেরা অবাক বিস্ময়ে আক্ষেপ করতে থাকেন, কিন্তু আফসোস করেই বা কী লাভ হবে? কারণ, সংসার-জীবনে প্রায় সবাই তো একই পথের পথিক। এই সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিটি এবং সঙ্গে খান্নাসের দেওয়া মোহ-মায়ার কুমন্ত্রণাটি আছে বলেই তো কত রকম যে নির্ভর ভয়াবহ মারামারির খেলাটি চলে আসছে, আবার ইহা হতে সাবধান করে দেবার তরে নবি-রসুল মহামানব হতে শুরু করে মুনি-ঋষি-সাদু-সন্ত-ওলি-গাউস-কুতুব-আবদালদের কত ধরনের, কত রকমের সাবধানবাণীগুলোও দেখতে পাই। একদিকে দুনিয়ার ছন্নছাড়া জীবনের উচু-নিচু অনেক রকম ধাপগুলো দেখা যায়, অপর দিকে মহামানবদের আদর্শের বাণীগুলোও দেখা যায়। তবে ইহাই কি দৃষ্টিক দর্শনের অবধারিত ফলশ্রুতি, নাকি সৃষ্টির দেওয়া স্বাধীন সীমিত ইচ্ছাশক্তিটির বিষময় যন্ত্রণাদায়ক ফল তা অধম লিখকের জানা নাই।

৭৭. আও (অথবা, ইচ্ছামাফিক, বা, কিংবা, নতুবা, যদি না, যদিও কি, যতক্ষণ না, অর, আনলেস, হোয়েদার) লাম্ (নহে, নাই, নি, নট) ইয়ারাল্ (দেখা, দর্শন করা) ইন্সান্ (মানুষ) আননা (অবশ্যই আমরা, নিশ্চয়ই আমরা, নিঃসন্দেহে আমরা, কীভাবে আমরা, যেখানে আমরা, যখন আমরা) খালাক্নাহ্ (আমরা তাকে সৃষ্টি করিয়াছি) মিন্ (হইতে) নুৎফাতিন্ (শুরুবিদ্ধ, বীর্যের ফোঁটা) ফা (সুতরাং, কাজেই, অগত্যা, অতএব) ইজা (যখন, যে-সময়, যেহেতু, কারণ, অতঃপর, হঠাৎ, অকস্মাৎ) হওয়া (সে, তিনি, ইহা, উহা, তাহা) খাসিমুন্ (বেশি ঝগড়াকারী, প্রতিবাদকারী, বিতণ্ডাকারী, প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ, অ্যাডভারসারি, অ্যানটাগনিষ্ট, অপোনেন্ট) মুবিন্ (স্পষ্ট, সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য, খোলাখুলি, প্রকাশিত, কিছু গোপন নাই এমন)।

স্পষ্ট মানুষ কি দেখে না নিশ্চয়ই আমরা [বহুবচনে বলা হয়েছে] তাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুরুবিদ্ধ হইতে সুতরাং অতঃপর সে প্রকাশ্য ঝগড়াকারী।

৭৮. ওয়া (এবং, আর, ও) দ্বারা বা (বয়ান করে, প্রকাশ করে, বিবরণ দেয়) লানা (আমাদের জন্য) মাসালান (উদাহরণ, প্রমাণস্বরূপ নিদর্শন, দৃষ্টান্ত, উপমা, নজির, তুলনা, সাদৃশ্য [মানুষ নিজের সৃষ্টির কথাটি ভুলে গিয়ে নিজেকে সদৃশ-রূপে মনে করে। উহার অর্থটি হলো, নবি এবং রসুলগণকেও নিজেকে মতো সাধারণ মানুষ মনে করে। কিন্তু নবি-রসুলেরা কখনোই মানবীয় পর্যায়ে থাকেন না]) ওয়া (এবং, আর, ও,) নাসিয়া (ভুলিয়া যায়) খাল্কাহ (তাহার সৃষ্টি)।

প্ট এবং আমাদের জন্য প্রকাশ করে সাদৃশ্য এবং ভুলিয়া যায় তাহার সৃষ্টি (কে)।

+ কাল (বলে) মান (কে) ইউহই (জীবিত করে, প্রাণসঞ্চার করে, প্রাণ দেয়, জীবনদান করে) ইজাম্ম (হাড়, হাড়ি, অস্থি, কঙ্কাল) ওয়া (এবং, আর, ও) হিয়া (তাহা, সে, তিনি, ইহা, এইগুলি, সেইগুলি) রামিম (পচাগলা হাড়ি, ভাস্ক্যচোরা হাড়, পচাগলা জরাজীর্ণ, মূল উপাদানগুলির পরস্পর আলাদা হওয়া)।

(সে) বলে, কে জীবিত করে অস্থিসমূহকে এবং তাহা পচাগলা।

৭৯. কুল (বলুন) ইউহইহাল (তিনি তাহাকে জীবিত করিবেন) লাজি (যিনি) অনিশায়াহা (তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন) আউয়ালা (প্রথম) মাররাতিন (বার)।

বলুন, তিনি তাহাকে জীবিত করিবেন যিনি তাহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন।

+ ওয়া (এবং, আর, ও) হওয়া (তিনি) বিকুললি (প্রত্যেকের সহিত, সব কিছুর সহিত, সমস্ত বস্তুর সহিত, প্রত্যেকটির সহিত) খালকিন (সৃষ্টি) আলিমুন (জ্ঞাত, বিদিত, বিশারদ, সুদক্ষ, পারদর্শী, ওম্ননিসিয়েন্ট, ইনফর্মড, নোইং)।

এবং তিনি সকল সৃষ্টির সহিত জ্ঞাত (আছেন)।

৮০. আললাজি (যে, যিনি, যা, যাহা, যার, যাহার, যাকে, যাহাকে) জাআলা (সৃষ্টি করা, তৈরি করা, করা, উৎপাদন করা, পরিণত করা, নির্দিষ্ট করা, নিধারণ করা, প্রদান করা, সরবরাহ করা, গঠন করা, রাখা, মনে করা, ধারণা করা, আরম্ভ করা) লাকুম (তোমাদের জন্য) মিন (হইতে, থেকে, চেয়ে) শাজারি (গাছ, বৃক্ষ, তরু, উদ্ভিদ) আখদারি (সবুজ, সতেজ, তাজা) নারান (আপ্তন, অগ্নি) ফাইজা (সুতরাং ওই সময়, অতএব যখন, তাই তো) আনতুম (তোমরা) মিনহ (উহার মধ্যে, উহা হইতে, উহার থেকে) তুکیدুন (জ্বালন্ত, প্রজ্বলিত করো, আলোকিত করো)।

যিনি তোমাদের জন্য সবুজ গাছ হইতে সৃষ্টি করেন আপ্তন, সুতরাং তোমরা উহা হইতে প্রজ্বলিত করো।

১ ব্যাখ্যা : এই আয়াত কয়টির ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে প্রথমেই বলছি যে, খোলা চোখে যাহা দেখা যায় না এবং এতই ক্ষুদ্র গুহকীট যাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় সেই গুহকীট হতে প্রতিটি মানুষ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সেই সূক্ষ্ম গুহকীট হতে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি যখন যুবকে পরিণত হয় তখন অনেকেই নবি-রসুলদের বাণী তথা উপদেশগুলোকে না মেনে খোলাখুলিভাবে তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দেয়। অনেকের গুহকীটে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করার মাঝেও নবি-রসুলদের বাণীর উপর বিদ্রোহ করার ভাবটি সুপ্ত অবস্থায় থেকে যায় এবং যখন বড় হয়ে যোবনের মাঝে অবস্থান করে তখন পরিষ্কারভাবে সেই বিদ্রোহটি ফুটে ওঠে। এই নিরেট সত্য কথাটি সে তখন ভুলে যায়, পিতা-মাতার মাঝে যে লুক্কায়িত বিদ্রোহী ভাবটি অবস্থান করছিল উহাই

তার গুহকীর্টের মাঝে পূর্ণভাবে বিরাজ করে। মানুষ তার আগের অস্তিত্ব ও স্বভাব চরিত্রের কথাগুলো গুহকীর্টের মাঝে আসবার পর সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। যে পিতা-মাতার আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র গুহকীর্ট অবস্থায় অবস্থান করার সময় ছিল ঘুমন্ত অবস্থায়, যোবনে আসবার পর উহা প্রকাশ পায় তথা ধরা পড়ে। সুতরাং, যোবনে আসবার পর আপন নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসটি যখন পরিপূর্ণরূপে অবস্থান করে তখন মনে করে যে, নবি-রসুলেরাও তো আমাদের মতোই মানুষ। প্রকৃতপক্ষে নবি-রসুলদের আমাদের মতো মানুষ হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, নবি-রসুলেরা মাসুম হয়েই জন্মগ্রহণ করেন। কারণ, গুহকীর্টে অবস্থান করার আগেই নবি-রসুলেরা মাসুমরূপে অন্য কোথাও অবস্থান করছিলেন, যাহা অধম লিখকের জানা নাই। পৃথিবীতে যতগুলো ধোঁকা আছে তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধোঁকাটি হলো, রক্ত-মাংসের দেহের সঙ্গে নবি-রসুলদের দেহের মিল পাওয়াতে স্থূল দৃষ্টিতে একই রকম মনে করার বিভ্রান্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা। কারণ, নবি-রসুলদের কথা তো বাদই দিলাম, বরং পৃথিবীর অনেক খ্যাতিমান মহামানবদেরকেও এই দেহের আকার-প্রকার দিয়ে বিচার করে নিজেদেরকে সমতুল্য মনে করে থাকে। যেমন আইনস্টাইন আর একটি নিরেট হাবাগোবা প্রকৃতি মানুষ – উভয়ের দেহের আকার-প্রকারের সমতুল্যতা দেখে সেই হাবাগোবা প্রকৃতির মানুষটিও নিজেকে আইনস্টাইনের মতো মানুষ মনে করতে পারে। আসলেই কি তাই? প্রকৃতপক্ষে ওই হাবাগোবা মানুষটি আর আইনস্টাইনের মতো মহাপুরুষটিকে দেহের আকার-প্রকার একই রকম হওয়াতে আমরা সবাই ওই হাবাগোবা মানুষের মতো একই রকম ভেবে ধোঁকার খপ্পরে পড়ে যাই। এর চেয়ে বড় ধোঁকা এই দুনিয়াতে আর কয়টি আছে, এই অধম লিখকের জানা নাই। মানুষ মরে পচে গেলেই তার মূল অস্তিত্বটি শেষ হয়ে যাবার প্রশ্নটিই ওঠে না। কারণ, জীবাশ্মটি তখন সমগ্র দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই বিচ্ছিন্নতাকেই মরণ বলা হয়। দেহটি মরে গেলে-পচে গেলেও জীবাশ্মের কিছুই আসে যায় না, কারণ দেহটি একটি বিষয় আর জীবাশ্মটি সম্পূর্ণ অন্য বিষয়। মানুষ ভুল করে মনে করে নফস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া লাশটাই বোধ হয় একটি মানুষ। আসলে সমগ্র দেহটি তখন একটি নফসবিহীন লাশে পরিণত হয়। সেই লাশ গেলে-পচে গেলেও যেতে পারে, আবার কবরও দেওয়া যেতে পারে, আবার শ্মশানেও দাহ করতে পারে – ইত্যাদি প্রকারভেদে যাহা করা হয় উহা দেহের উপরে বর্তায়, কিন্তু জীবাশ্মের উপর বর্তাবার প্রশ্নই আসে না। কারণ, জীবাশ্মটি তখন দেহ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অবস্থান করে। সুতরাং, প্রতিটি মানুষের জীবন্ত দেহটি একে একটি জীবাশ্মের জীবন্ত কবর এই জীবন্ত দেহ-কবরেই একটি নফস অনেক রকম আজাব আর শাস্তি ভোগ করে ইহাই হাকিকতে কবরের আজাব। আবার, মাটির দেহে যে কবরের আজাব হয় উহা মেজাজি আজাব। অনেকটা মক্ষার মিনাতে অবস্থান করা তিনটি শয়তানের মতো। মৃত্যু-নামক কেয়ামতে সগিরা ঘটে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে একটি মানুষকে তার আপন পরিচয় এবং স্বরূপটি দেখিয়ে দেওয়া হয় তথা পূর্বজন্মের কর্মফলটি ভোগ করতে হবে এই সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দেওয়া হয়। কারণ, এই জন্মে আসবার পর আগের জন্মের কথাগুলো ভুলে যায়। কেয়ামতে সগিরা তথা একটি ব্যক্তির মৃত্যুই যে ছোট কেয়ামত এবং এই ছোট কেয়ামতটি ঘটার সঙ্গে-সঙ্গে পুনরায় জীবন দান করা হবে ইহা কোরান-এরই কথা। কিন্তু অনেকেই কেয়ামতে সগিরা তথা ছোট কেয়ামত যে একটি ব্যক্তির মৃত্যুটিকে বলা হয়েছে, ইহা জানবার পরেও না জানার ভান করে

এটা-সেটা বলতে থাকে এবং নানা রকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে বিভ্রান্তিটিকে আরও ঘোলাটে করে তোলে।

তারপর বলা হয়েছে, সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন তৈরি করবার কথাটি। আগুন ঘুমন্ত অবস্থায় প্রতিটি সবুজ বৃক্ষের মাঝেই লুকিয়ে থাকে। কাঠের কয়লা ও পাথর কয়লা, যাহা আমরা দেখতে পাই উহাও এই সবুজ বৃক্ষ হতেই আগত। সুতরাং, সবুজ বৃক্ষ, কাঠের কয়লা, পাথরের কয়লা এমনকি পাথরের ঘর্ষণের মাঝেও আগুনের অস্তিত্বটি ঘুমিয়ে থাকে। এই বিষয়টি বিস্তারিত জানবার যদি কারও আগ্রহ থেকে থাকে তা হলে তাকে অনুরোধ করব মণ্ডলাউল আলা শাহ সুফি মালানা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর-রচিত উর্দু ভাষায় লিখিত কেতাব সিররে হক জাম্মে নুর-এর বঙ্গানুবাদটি পড়তে। অনুবাদটি খুবই চমৎকার এবং নিরপেক্ষ হাতে যিনি করে গেছেন তার নাম হলো আলীম সাদেক নুরী।

৮১. আগুয়া (কি, অথবা, ইচ্ছামাফিক, বা, কিংবা, নতুবা, যদি, না যদিও, যতক্ষণ না, অর, আনলেস, হোয়েদার) লাইসা (নয়, নহে, না, নাই, নেই) আল্লাজি (যিনি, যে, যাহা, যা, যার, যাহার, যাকে, যাহাকে) খালাকা (সৃষ্টি করিয়াছেন, বানাইয়াছেন, তৈরি করিয়াছেন, নির্মাণ করিয়াছেন, রচনা করিয়াছেন, গঠন করিয়াছেন, গড়িয়াছেন) সাম্মাওয়াতি (আকাশসমূহ, আকাশগুলি, মনগুলি) ওয়া (এবং, আর, ও) আরদা (পৃথিবী, জমিন, মাটি, দেহ) বিকাদিরিন (ক্লমতাবান, শক্তিমান, সামর্থ্যবান) আলা (উপরে, উর্ধ্বে, দিকে, অভিমুখে, বিষয়ে, সম্পর্কে, যুক্ত হইয়া, ভিত্তি করিয়া, অগ্রসর হইবার ভাবসূচক, ততোধিক, অধিকন্তু, উচ্চে, অধিকতর উচ্চে, উর্ধ্বদিকে, অন, আপঅন, ওভার, এবাভ) আন (যে, এই যে, হইতে, বিষয়ে, সম্পর্কে) আইয়াখলুকা (সৃষ্টি করিবেন, বানাইবেন, তৈরি করিবেন, নির্মাণ করিবেন, রচনা করিবেন, গঠন করিবেন, গড়িবেন) মিস্লাহম (তাহাদের অনুরূপ, তাহাদের সদৃশ, তাহাদের মতো)।

তিনি কি সৃষ্টি করেন নাই আকাশসমূহ এবং পৃথিবী, (যিনি) ক্লমতাবান (ইহার) উপরে যে তাহাদের অনুরূপ সৃষ্টি করিবেন?

+ বালা (হ্যাঁ, অবশ্যই, নিশ্চয়ই সত্যই) ওয়া (এবং, ও, আর) হওয়াল (তিনি, সে) খাল্লাক (সৃষ্টা, সৃষ্টিকর্তা) আলিম (জ্ঞানী, বিজ্ঞ, জ্ঞানবান)।

হ্যাঁ - এবং তিনি সৃষ্টা, জ্ঞানী।

৮২. ইননাম্মা (নিশ্চয়ই, বস্তুত, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে, প্রকৃতপক্ষে, আসলে, ইহা ব্যতীত নহে) আম্মুহ (তাঁহার আদেশ, তাঁহার কাজ তাঁহার হুকুম, তাঁহার নির্দেশ, তাঁহার নিয়ন্ত্রণ, তাঁহার শাসন, তাঁহার কর্তৃত্ব, অর্ডার, কমান্ড, ইন্ট্রাকশন) ইজ্জা (যখন, ওই সময়, হঠাৎ) আরাদা (ইচ্ছা করা, চাওয়া, অভিপ্রায়) শাইয়ান (কিছু) আন (যে, এই যে, হইতে, বিষয়ে, সম্পর্কে) ইয়াকুলা (বলেন) লাহ (তাঁহার জন্য) কুন (হও, হইয়া যাও) ফাইয়াকুন (সুতরাং হইয়া যায়)।

নিশ্চয়ই তাঁহার নির্দেশে (তিনি) যখন কিছু ইচ্ছা করেন, তাহার জন্য বলেন যে, 'হও', সুতরাং হইয়া যায়।

৮৩. ফাসবহানা (সুতরাং পবিত্র) আল্লাজি (যে, যাহার, যাহাকে, যা, যাহা, যার) বিয়াদিহি (যাহার হাতে) মালাকুতু (কর্তৃত্ব, রাজত্ব, ক্লমতা) কুল্লি (সব, সমস্ত, সকল) শাইয়িন (কিছু, বস্তু, জিনিস) ওয়া (এবং, আর, ও) ইলাইহি (তাঁহার দিকে) তুরজাউন (প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া আসা, প্রত্যাগমন)।

সুতরাং পবিত্র যিনি, যাহার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব এবং তাঁহার দিকে প্রত্যাগমন।

১ ব্যাখ্যা : প্রথমেই আকাশসমূহ তৈরি করার কথাটি এ-জন্যই বলা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টি করার তুলনায়, বিশেষ করে কৌশলের দিক দিয়ে, আকাশসমূহ সৃষ্টি করা অনেক বেশি জটিল এবং শক্ত বিষয় বলে কোরান-এর উনআশি নম্বর সূরা নাজিআত-এর সাতাশ নম্বর আয়াতেও বলা হয়েছে, 'আনতুম আশাদ্দু খালকান আম্মিস সাম্মাউ বানাহা - অর্থাৎ, 'তোমাদিগকে সৃষ্টি করা কঠিনতর না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করিয়াছেন।' সুতরাং, তাদেরকে আবার তাদের মতো করে তৈরি করাটা মোটেও কোনো কঠিন বিষয় নহে। সর্বময় ক্ষমতার এবং একমাত্র প্রশংসার মালিক আল্লাহর সৃজনীশক্তি অনেক-অনেক বেশি। তিনি যেটাই সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন সেটাই 'ইও' বলার সঙ্গে-সঙ্গে হয়ে যায়। এখানে কেন সর্বময় ক্ষমতার কথা বললাম এবং কেনই একমাত্র প্রশংসার কথা বললাম? বললাম এই জন্য যে, আল্লাহ ছাড়া একটি ধূলিকণারও অস্তিত্ব সৃষ্টিজগতের কোথাও নাই। কোনো কিছুই অস্তিত্ব থাকলে তো প্রশংসার কর্তৃত্বের কথা বলা যায়। সুতরাং, যাহা শূন্য উহার কর্তৃত্ব এবং প্রশংসাটিও শূন্য। অতএব শূন্য যোগ শূন্য সম্মান সম্মান মহাশূন্য।

খান্নাসমিশ্রিত নফসের দৃষ্টিভঙ্গিটি বহু দেখে এবং বহু দেখার কুমন্ত্রণাদাতাই হলো খান্নাস। এই বহু দেখার মাঝেই শেরেকটি লুকিয়ে থাকে এবং লুকিয়ে থাকে অনেক রকম ভুল সিদ্ধান্তগুলোতে উপনীত হওয়া। পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের আপন নফসের সঙ্গে খান্নাসটিকে রেখেই গবেষণার আন্তরিকতায়ও যে নিখুঁত কুমন্ত্রণাটি অনেক সময় থেকে যায় তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো পাশ্চাত্যের দার্শনিকদের রচনাসমগ্র।

তাই কোরান তাদেরকে বলছে, মৃত্যু-ঘটনাটি একটি মানবজীবনে শেষ পরিণতি নয়, বরং আল্লাহর নৈকট্য পাওয়াটাই মানবজীবনের শেষ পরিণতি এবং ইহাই চরম সার্থকতা। ইহাই চরম পাওয়া। মানুষকে একটি মৃত্যু-ঘটনার মধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হবে না, বরং পুনরায় সৃষ্টি করার কথাটি বলা হয়েছে। তাই জন্মচক্র হতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমানের পবিত্রতা প্রকাশ করার কথাটি আল্লাহ বলেছেন। আপনার মাঝে আপন রবের তথা আপন প্রতিপালকের পবিত্রতাটি জাগিয়ে তুলে নফসকে সকল প্রকার কলুষ হতে মুক্ত করতে হবে এবং উহা কেবল একটি কাজের দ্বারাই করা সম্ভবপর আর সেই কাজটির নাম হলো নিজের নফসের সঙ্গে মিশে থাকা খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া নতুবা মুসলমান বানিয়ে ফেলা। একটি খান্নাসমুক্ত নফস সৃষ্টির উপর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কারণ, খান্নাসমুক্ত নফসটির জিহ্বা রব নামক প্রতিপালকের জিহ্বা হয়ে যায়, খান্নাসমুক্ত নফসটির কান দুটো রব নামক প্রতিপালকের কান হয়ে যায়, খান্নাসমুক্ত নফসটির চোখ দুটো রব নামক প্রতিপালকের চোখ হয়ে যায়, খান্নাসমুক্ত নফসটির হাত দুটো রব নামক প্রতিপালকের হাত হয়ে যায়, খান্নাসমুক্ত নফসটির পা দুটো রব নামক প্রতিপালকের পা হয়ে যায়। এই পৃথিবীতে অনেক রকম শিক্ষার বিষয় আছে, দর্শনের বিষয় আছে, ঘাত-প্রতিঘাতের বিষয় আছে, আনন্দ-উল্লাসের বিষয়টি আছে এবং আরও অনেক-অনেক নাম না জানা বিষয় আছে, কিন্তু সব বিষয়ের শেষ বিষয়, সব ভাষার শেষ কথাটি, সব দর্শনের শেষ দর্শনটি, সব উপদেশের শেষ উপদেশটি, সব কর্মের শেষ কর্মটি হলো আপন-আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে শয়তানকে যে খান্নাসরূপে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া হয়েছে সেই খান্নাস হতে মুক্তি পাওয়া এবং ব্রাণ পাবার তরে বিরাট ধৈর্যধারণ করে ধ্যানসাধনার মোরাকাবা-মোশাহেদার দায়েমি সালাতের মাধ্যমে আপন প্রতিপালক নামক রবের পরিচয়টি লাভ করা। ইহাই প্রথম সিদ্ধান্ত, ইহাই

ম্বাঝখানের সিদ্ধান্ত, ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত এবং সর্বকালের সর্বযুগের ইহাই একমাত্র সিদ্ধান্ত আর সেই সিদ্ধান্তটির আরেক নাম হলো : ম্বানি আরাফা নাফসাহ ফাকাদ আরাফা রাববাহ – তথা, যে তার নফসকে চিনতে পেরেছে, কোনো সন্দেহ নাই, সে তার রবকে চিনে ফেলতে পেরেছে। সুতরাং, অধম লিখকের পক্ষে আর কিছু লিখবার মতো তথা প্রকাশ করার মতো বিষয় জানা নাই।